শিকড়ের সন্ধানে

WRITER:

Hamida Mubasshera

Lecturer

Department of Islamic Banking & Economics

Islamic Online University

Contents

শিকড়ের সন্ধানে (সূচনা).....৫

শিকড়ের সন্ধানে-১.....৯

শিকড়ের সন্ধানে-২.....১৩

শিকড়ের সন্ধানে-৩.....১৭

শিকড়ের সন্ধানে-৪.....২০

শিকড়ের সন্ধানে-৫.....২৪

শিকড়ের সন্ধানে-৬.....২৮

শিকড়ের সন্ধানে-৭.....৩২

শিকড়ের সন্ধানে-৮.....৩৫

শিকড়ের সন্ধানে-৯.....৩৯

শিকড়ের সন্ধানে-১০.....৪৩

শিকড়ের সন্ধানে-১১.....৪৮

শিকড়ের সন্ধানে-১২.....৫২

শিকড়ের সন্ধানে-১৩.....৫৮

শিকড়ের সন্ধানে-১৪.....৬২

শিকড়ের সন্ধানে-১৫.....৬৭

শিকড়ের সন্ধানে-১৬.....৭২

শিকড়ের সন্ধানে-১৭.....৭৭

শিকড়ের সন্ধানে-১৮.....৮২

শিকড়ের সন্ধানে-১৯.....৮৬

শিকড়ের সন্ধানে-২০.....৯০

শিকড়ের সন্ধানে-২১.....৯৪

শিকড়ের সন্ধানে-২২.....৯৮

শিকড়ের সন্ধানে-২৩.....১০২
শিকড়ের সন্ধানে-২৪.....১০৭
শিকড়ের সন্ধানে-২৫.....১১২
শিকড়ের সন্ধানে-২৬.....১১৭
শিকড়ের সন্ধানে-২৭.....১২৩
শিকড়ের সন্ধানে-২৮.....১২৭
শিকড়ের সন্ধানে-২৯.....১৩১
শিকড়ের সন্ধানে-৩০.....১৩৬
শিকড়ের সন্ধানে-৩১.....১৪০
শিকড়ের সন্ধানে-৩২.....১৪৫
শিকড়ের সন্ধানে-৩৩.....১৪৯
শিকড়ের সন্ধানে-৩৪.....১৫৩
শিকড়ের সন্ধানে-৩৫.....১৫৮
শিকড়ের সন্ধানে-৩৬.....১৬২
শিকড়ের সন্ধানে-৩৭.....১৬৬
শিকড়ের সন্ধানে-৩৮.....১৭১
শিকড়ের সন্ধানে-৩৯.....১৭৬
শিকড়ের সন্ধানে-৪০.....১৮০
শিকড়ের সন্ধানে-৪১.....১৮৫
শিকড়ের সন্ধানে-৪২.....১৮৯
শিকড়ের সন্ধানে-৪৩.....১৯২
শিকড়ের সন্ধানে-৪৪.....১৯৬
শিকড়ের সন্ধানে-৪৫.....২০০
শিকড়ের সন্ধানে-৪৬.....২০৪
শিকড়ের সন্ধানে-৪৭.....২০৯
শিকড়ের সন্ধানে-৪৮.....২১৩

শিকড়ের সন্ধানে-৪৯.....২১৭
শিকড়ের সন্ধানে-৫০.....২২১
শিকড়ের সন্ধানে-৫১.....২২৫
শিকড়ের সন্ধানে-৫২.....২২৯
শিকড়ের সন্ধানে-৫৩.....২৩৩
শিকড়ের সন্ধানে-৫৪.....২৩৭
শিকড়ের সন্ধানে-৫৫.....২৪১
শিকড়ের সন্ধানে-৫৬.....২৪৪
শিকড়ের সন্ধানে-৫৭.....২৪৭
শিকড়ের সন্ধানে-৫৮.....২৫০
শিকড়ের সন্ধানে-৫৯.....২৫৪
শিকড়ের সন্ধানে-৬০.....২৫৭
শিকড়ের সন্ধানে-৬১.....২৬১
শিকড়ের সন্ধানে-৬২.....২৬৫
শিকড়ের সন্ধানে-৬৩.....২৬৯
শিকড়ের সন্ধানে-৬৪.....২৭২
শিকড়ের সন্ধানে-৬৫.....২৭৫
শিকড়ের সন্ধানে-৬৬.....২৭৯
শিকড়ের সন্ধানে-৬৭.....২৮৩
শিকড়ের সন্ধানে: শেষকথা...।.....২৮৭

শিকড়ের সন্ধানে (সূচনা)

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হল-ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা নেয় না। এই কথাটা শুনে আসছি এবং সাম্প্রতিক সময়ে উপলব্ধিও করে আসছি। ছোটবেলায় যখন ইতিহাস বলতে বুঝাত মুঘল আমলের শাসনের বিস্তারিত পড়া, (কে কার বাবা আর কে কার ছেলে তা মুখস্থ করা) তখন তা পড়তে খুবই বিরক্ত লাগতো। অন্যদিকে আব্বু যখন রাতের বেলা ঘুমানোর আগে মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কারবালা ইত্যাদির গল্প শুনাতেন, তখন সেগুলো শুনতে যদিও ভালোই লাগত, কিন্তু 'গল্প' ছাড়া আর কিছু মনে হত না।

ছোটবেলা থেকেই আমি একটু যুক্তিবাদী টাইপ। যে কোনো কিছুই আমাকে করতে নিষেধ করা হলে বা করতে বলা হলে আমার সবার আগে মনে হত 'কেনো'! তাই খুব অনিয়মিতভাবে হলেও যখনই কুরআন পড়তাম, যেটুকুই পড়তাম অর্থসহ পড়তাম। একটা ভাষা না বুঝে শুধুই তিলাওয়াত করাটা আমার কাছে খুবই অযৌক্তিক লাগত। বহুবারই ভেবেছি যে কুরআন পুরাটা অর্থসহ একবার পড়ে ফেলব। কিন্তু প্রতিবারই সূরা বাক্বারাতে গিয়েই আটকে গেছি, আর আগাতে পারি নি। এর একটা মূল কারণ ছিল সূরা বাক্বারা জুড়ে রয়েছে মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ের নানা কাহিনী। সেগুলোর কোনটা কোথা থেকে শুরু হয়েছে বা আগে পরে কী আছে, কিছুই আমি বুঝতাম না, এক আয়াতের সাথে আরেক আয়াতের কোনো সংশ্লিষ্টতাও খুঁজে পেতাম না। তাই সত্যি বলতে কী, আমি bored হয়ে যেতাম। উৎসাহ ধরে রাখতে পারতাম না :(

খুব সম্ভবত এই ব্যাপারটা আমাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই ঘটে। কারণ কুরআনের একটা বিশাল অংশ এভাবে ইহুদী ও ক্রিস্টানদের কাহিনী দিয়ে ভর্তি। একটা লেকচারে একবার শুনেছিলাম- The Quran was about to be the story of Musa (A)। তাই আজকাল আমরা সবাইকে অর্থসহ কুরআন পড়তে উৎসাহিত করি বটে, কিন্তু পড়তে গিয়ে তারা আমার মত কোনো বিরক্তি বা বিড়ম্বনার স্বীকার হচ্ছে নাকি সেটার খোঁজ রাখি না! আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে কুরআন কোন ইতিহাস গ্রন্থ না যে সব কাহিনী আমাদের ধারাবাহিকভাবে বলবে। এটা হল আল্লাহর সাথে আমাদের ব্যক্তিগত কথোপকথন। তাই একটা কাহিনীর যে বিষয়টা যখন প্রাসংগিক, তখন সে অংশটা উল্লেখিত হয়েছে। পুরা কুরআনে বনী ইসরাঈলের কাহিনীটা এসেছে এই স্টাইলে। এইজন্য আপনি যদি অন্য কোথাও থেকে এই কাহিনী পুরাটা না জানেন, তাহলে কুরআন অর্থসহ পড়তে গিয়ে আমার মত প্রতিক্রিয়া হবার সমূহ সম্ভাবনা আছে।

এবার একটা কাহিনী বলি। একবার আমার এক পরিচিত আমাকে বলছিলেন আশুরার একটা রোযা রেখেই আমি কাহিল, আরেকটা রাখতে পারব না। আল্লাহ জানেন যে আমি ইহুদী না! অথচ আমরা অনেকেই হয়ত জানি যে ইহুদীদের সাথে আচার অনুষ্ঠানে পার্থক্য বজায় রাখার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের আশুরার সময় ওদের মত একদিন না রেখে দুই দিন রোযা রাখতে বলেছেন। অর্থ্যাৎ ইহুদীদের সাথে পার্থক্য বজায় রাখার নির্দেশটার তাৎপর্যই উনি বুঝে উঠতে পারেননি!

শুধু এটাই না, এই তো সেদিনও মালয়েশিয়াতে ছোট বোনদের কয়েকজনকে নিয়ে বসেছি সূরা ফাতিহা নিয়ে আলোচনা করতে। শেষ আয়াতের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত হাদীসটা বললাম যে যাদেরকে আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন, তাদের মাঝে রয়েছে ইহুদীরা, আর পথভ্রষ্টদের উদাহরণ হল ক্রিষ্টানরা... তখন এক বোন খুব সরলভাবে জিজ্ঞেস করল, আপু ইহুদী কারা? আমি একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম। সত্যি! কী বলব? আমরা দিনের মধ্যে ১৭বার যাদের মত হওয়া থেকে আশ্রয় চাইছি, তারা কে এটাই আমরা জানি না! আমরা যদি একজন সাধারণ মুসলিমকে জিজ্ঞেস করি তাহলে তারা কিন্তু আসলেই বলতে পারবে না যে ইহুদী বা ক্রিষ্টান কারা, কী ই বা তাদের ধর্মবিশ্বাস। অথচ এদের সম্পর্কে না জানার অর্থ হল ইসলামের অনেকগুলো মৌলিক বিষসমূহ অজানা রয়ে যাওয়া।

ইতিহাস জানার এটা একটা দারুণ উপকারিতা যে এর ফলে আমরা কুরআনটা ভালো করে বুঝব। এর ফলে আরো যেটা উপকার হবে তা হল আমরা মুসলিমরা এখন 'রোল মডেলের' যে চরম সংকটে ভুগছি তা থেকে বের হয়ে আসতে পারব। কুরআন আমাদের সামনে অসংখ্য শিক্ষণীয় কাহিনী উপস্থাপন করেছে। এগুলাকে যদি আমরা নিছক গল্প হিসেবে ভাবি বা ধরে নেই আরে উনারাতো নবী ছিলেন তাহলে উনাদের জীবন থেকে আমরা কখনো শিক্ষা নিতে পারবো না।আমাদের/ বাচ্চাদের রোল মডেল কুরআনের চরিত্র না হয়ে হবে সিনেমা/ গল্পের বইয়ের চরিত্ররা। আমরা যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং উনার সাহাবীদের জীবনী পড়ি, তাহলে বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করব যে তারা কুরআনের কাহিনীগুলো জীবনের প্রতিটা মুহুর্তে ধারণ করতেন। যখন বদরের যুদ্ধের সময় আসল, আনসাররা বলেছিল আমরা আপনার সাথে তেমন করব না, যেমনটা বনী ইসরাঈলরা করেছিল মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে! আবার এক ব্যক্তি যখন গনীমাতের মাল বণ্টন করার সময় চরম ধৃষ্টতা সহকারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিল Be just, তখন উনি প্রচণ্ড রেগে গেলেও নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার লোকজনদের দ্বারা এর চেয়েও বেশী বিড়ম্বিত হয়েছিলেন!

সাম্প্রতিক সময়ে ইজিপ্টের ঘটনায় একজন বলছিলেন নব্য ফেরাউন (সিসি) যত মুসলিমকেই হত্যা করুক না কেন, একজন মুসা ঠিকই বেঁচে থাকবে যে ত্রাণকর্তা হিসেবে কাজ করবে। কুরআন যখন আমাদের জীবনে জীবন্ত, তখন তা কি অপূর্ব Reminder, হিসেবে কাজ করে, তাই না?

আমাদের দেশে কুরআনকে কখনো এভাবে প্রাঞ্জলভাবে পড়ানো হয়না বলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী ইতিহাস বিভাগ থেকে পাস করেও মানুষ নাস্তিক হয়ে বের হয়।

আমি Islamization of Education এর একজন strong advocate। আমার ইসলামী পড়াশোনার প্রাথমিক যুগে আমি যখন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা করেছিলাম, তখন লক্ষ্য করেছিলাম যে'ইতিহাস' বিষয়টার ইসলামীকরণের দারুণ সুযোগ রয়েছে! যেমন ধরুন, আল্লাহ কুরআনে বলেছেন যে উনি দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রহমত স্বরূপ 'লোহা' দিয়েছেন । এখন আপনি যদি সাধারণ ইতিহাসের লৌহ যুগ নিয়ে পড়েন আর দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়টা মিলান, দেখবেন যে তা মিলে যাচ্ছে। যখন আপনি ইসলামই যে সত্য ধর্ম এ ব্যাপারে নিশ্চিত এবং ইসলাম আপনার জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে, তখন এই ছোট্ট তথ্যটা আপনার কাছে উল্লেখযোগ্য কিছুই মনে হবে না। কিন্তু যদি আমার মত অনেক ঘাটের জল খেয়ে ইসলামে প্রবেশ করেন তবে প্রাথমিক ভাবে এই বিষয়গুলো দারুণ Emaan booster হিসেবে কাজ করে।

ইতিহাসের জ্ঞানকে সামনে রেখে কুরআন পড়তে গিয়ে যে অপার্থিব আনন্দ আমি পেয়েছি তা অন্যদের সাথে কিছুটা শেয়ার করার আকাঙ্ক্ষা থেকেই এই নোট লেখা। আমার ইসলামী পড়াশোনার প্রাথমিক যুগে এমন একটা হিস্ট্রি প্রোজেক্ট আমি সবসময় হাতে নিতে চেয়েছিলাম, কিন্তু নানা কারণে তা হয়ে উঠেনি। আমরা এখন এক কঠিন সময় পার করছি। মুসলিম দেশগুলার অবস্থা চোখের পলকে অস্থিতিশীল হয়ে যাচ্ছ, জান মালের কোনো নিরাপত্তা নাই। সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, আফগানিস্তান, ইরাক, মিশর সর্বত্র এক অস্থির সময়। আমরা ক্রমাগত দুআ করে যাচ্ছি আল্লাহর সাহায্যের জন্য, কিন্তু ভুলে যাচ্ছি যে যতদিন না কুরআনকে জীবন্ত হিদায়াতগ্রন্থ হিসেবে আমাদের জীবনের সাথে একীভূত করে ফেলতে পারব, আল্লাহর সাহায্য আসবে না, এই সময়টাও ঈমানের সাথে পার করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

তাই আমার এই লেখাটাকে আমি চেষ্টা করব একটা সহায়ক ম্যাটেরিয়াল হিসেবে উপস্থাপন করতে, যাতে আমরা অর্থসহ কুরআন পড়তে গেলে সেটার consistency টা ধরতে পারি এবং

সন্তানদের এই কাহিনীগুলো প্রাণবন্ত করে শুনাতে পারি। এখানে আমরা কুরআনে উল্লেখিত সবগুলো নবীদের কাহিনী সিরিয়ালি পড়ব এবং সেখান থেকে নেয়া শিক্ষা কিভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করা যায়, সেটা বোঝার চেষ্টা করব। এটা আমার একটা ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা- **'শিকড়ের সন্ধানে'** লিপ্ত হবার। সবার দুআ প্রার্থী, যেন বহুবার উদ্যোগ নিয়েও না করা কাজটা এবার শেষ করতে পারি।

শিকড়ের সন্ধানে-১

আমাদের প্রথম পর্ব আমরা শুরু করব বনী ইসরাঈল কারা এবং তাদের সম্বন্ধে জানার প্রয়োজনীয়তা দিয়ে। এই সিরিজটা সবচেয়ে ভালো হত যদি আমরা আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়ে শুরু করতাম। কিন্তু তা না করে আমরা বনী ইসরাঈল দিয়ে করছি তার কারণ দুইটা-
১) বনী ইসরাঈল এর কাহিনী জানলে অল্প সময়ে কুরআনের বিশাল একটা অংশ বোঝা হয়ে যায়।
২) অন্য কাহিনীগুলো পরে বিচ্ছিন্নভাবে জানলেও পুরা ব্যাপারটা বুঝতে তেমন একটা সমস্যা হয় না। আর অন্য কাহিনীগুলো এত বড় না যে পর্ব করে জানতে হবে।

তবুও বোঝার সুবিধার্থে একবার উল্লেখ করে নিচ্ছি যে বনী ইসরাঈল ছাড়া অন্য যাদের কাহিনী কুরআনে এসেছে, তাদের ক্রমটা হল এরকম

আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম ⟶ ইদ্রিস আলাইহি ওয়াসাল্লাম⟶ নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম⟶হুদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আ'দ জাতি)⟶সালিহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সামূদ জাতি)

আরো আছে শুইয়াইব আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইউনুস আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আইয়ূব আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যাদের ক্রম সম্পর্কে সম্ভবত সুনির্দিষ্ট কিছু জানা যায় না (আমি জানি না)

বনী ইসরাঈল কারাঃ

আমরা হয়তবা অনেকেই জানি যে ইব্রাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লামকে Father of faith বলা হয়। তিনটি প্রধান একেশ্বরবাদী হিসেবে দাবী করা ধর্ম- Judaism, Chiristiany and Islam তেই উনি স্বীকৃত এবং সম্মানিত। উনাকে নিয়ে যে টানাহেঁচড়া আছে, সেটাকে খণ্ডন করে দিয়ে আল্লাহ কুরআনে উনাকে আখ্যায়িত করছেন 'হানিফ' হিসেবে। [1]

এখন আমরা দেখব কিভাবে উনি সকল ধর্মের গোঁড়াতে আছেন। মাঝখানে অনেকে থাকলেও মূলত ক্রমটা এরকম------

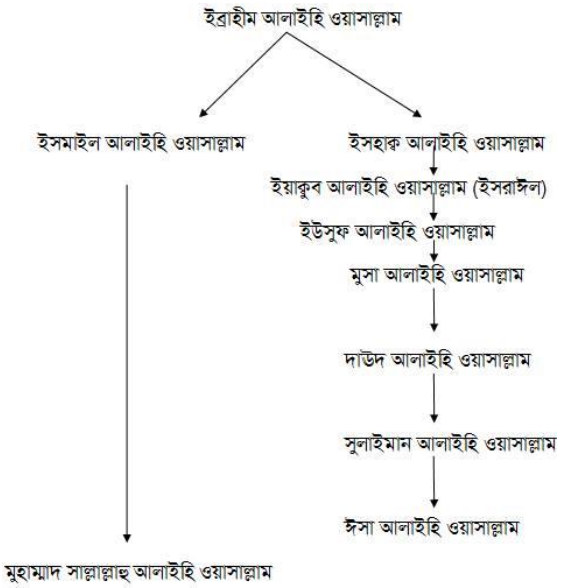

উপরের চার্ট থেকে আমরা দেখতে পারছি যে এদেরকে বনী ইসরাঈল বলার কারণ হচ্ছে ইয়াকূব আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আরেক নাম ছিল ইসরাঈল। আর একবারে ইসমাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বংশ থেকে আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছেন, মাঝখানে আর কেউ নেই।

বনী ইসরাঈলদের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্যঃ

নিশ্চয়ই আল্লাহই ভালো জানেন যে কেন তিনি তাঁর শেষ আসমানী গ্রন্থ, যা কিনা কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির জন্য পথ প্রদর্শনের জন্য যথেষ্ট হবে, তার এত বিশাল একটা অংশ জুড়ে বনী ইসরাঈলদের কাহিনী উল্লেখ করার সিদ্ধান্ত নিলেন, কিন্তু আলিমরা বনী ইসরাঈলদের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যকে এর পেছনে সম্ভাব্য কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন-

সময়ের দিক থেকে আমরা ও তারা সবচেয়ে কাছাকাছি। ঈসা আলাইহিওয়াসাল্লাম ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিক আগের নবী এবং উনার জাতিরাও বনী ইসরাঈলদের অন্তর্ভুক্ত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মাতের পর এটাই সবচেয়ে বড় উম্মাত (সংখ্যার দিক থেকে)

এরাই প্রথম উম্মাত যাদেরকে আল্লাহ জিহাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর আগে আল্লাহ অবাধ্য জাতিদের আযাব দ্বারা সমূলে ধ্বংস করে দিতেন।

আল্লাহ এদেরকে অসংখ্য নিয়ামত দিয়েছিলেন। পরে তাদের অবাধ্যতার জন্য তা কেড়ে নিয়েছেন। এই শেষের বৈশিষ্ট্যটা আমাদের একটু ভালো করে খেয়াল করা দরকার। আমরা যদি নিজেদের অতীত ইতিহাস জানতাম, তাহলে বুঝতাম যে মুসলিমরা একসময় কী দোর্দণ্ড প্রতাপের সাথে দাপটের সাথে এই বিশ্ব শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শাসন করেছে। ইসলামের একটা বৈশ্বিক এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামো বিদ্যমান এবং এ সংক্রান্ত বিস্তারিত দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মৌলিকভাবে এটা আসলে একটা রাষ্ট্রীয় জীবন ব্যবস্থা অথচ এই ব্যাপারটা আজকাল আমাদের কল্পনাতেই আসে না। এর অনেক বিধানকে এই জন্যই আমরা ভুল বুঝি। সবখানে মুসলিমরা কুকুর বিড়ালের মত মরবে এটা দেখতে দেখতেই আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। ৯/১১ এর পরে মুসলিমরা নিজেদের নাম পরিবর্তনের জন্য যেভাবে উঠে পড়ে লেগেছিল সেটা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে জাতি হিসেবে আমরা কতটা হীনমণ্যতায় ভুগছি।

এই যে একটা চরম সম্মানজনক অবস্থা থেকে লাঞ্ছনার চূড়ান্ত পর্যায়ে নেমে আসা, এটা বনী ইসরাঈল ও মুসলিম উভয়দের সাথেই ঘটেছে। বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে ইতিহাসের ঘটনা পরিক্রমাগুলো যদি আমরা একটা গ্রাফে উপস্থাপন করি তাহলে দুটো জাতি যারা কী না একসময় সম্মান ও প্রতিপত্তির দিক থেকে শীর্ষে অবস্থান করছিল, অধঃপতন হতে হতে অপদস্থতার চরম সীমায় পৌঁছে যাওয়া----বনী ইসরাঈল ও মুসলিম উভয়দের অবস্থা পরিবর্তনের ক্রম যেন একদম হুবহু! কোনটা উপস্থাপন বনী ইসরাঈলদের আর কোনটা মুসলিমদের তা আলাদা করাটাই বুঝি দুষ্কর হয়ে যাবে!

বনী ইসরাঈলদের সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তাঃ

তাই বনী ইসরাঈলদের সম্পর্কে জানার সবচেয়ে বড় প্রয়োজনীয়তা বোধ করি তাদের থেকে শিক্ষা নেয়া। আমাদের মাঝে ওদের কাণ্ড কীর্তি নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করার একটা প্রবণতা আছে যে দেখো ওরা কেমন করত। আমরা একবারো ভেবে দেখিনা যে অনুরূপ স্বভাব আমাদের মাঝে আছে কিনা বা আমরাও তেমনটা করছি কিনা। তাই ঘুরে ফিরে এই পুরো সিরিজ জুড়ে আমরা নিজেদের কে প্রশ্ন করব------আমরা কি ধারণ করছি সেসব স্বভাব, যার কারণে আল্লাহ বনী ইসরাঈলদের উপর থেকে তাঁরই দেয়া নিয়ামতসমূহ উঠিয়ে নিয়েছিলেন ??????

এছাড়াও ইনশাল্লাহ এই সিরিজের আরো যে সব উপকারিতা আছে তার মাঝে রয়েছে-

১) কুরআন অর্থসহ বোঝা সুবিধা হবে কারণ কুরআনের একটা বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে বনী ইসরাঈল সম্পর্কিত বর্ণনা।

২) সীরাহর একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ বনী ইসরাঈলদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়সাল্লামকে অমান্য করার কারণ ও পরিণতি। আমরা সীরাহ আরো ভালোভাবে বুঝতে পারব, জানব কেন বনী ইসরাঈলরা এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছিল

৩) আজকে প্যালেস্টাইনে এই যে গণহত্যা চলছে সেটার পেছনে রাজনৈতিক ছাড়াও একটা ধর্মীয় justification দেখায় ইহুদীরা। সেটার স্বরুপ এবং ইসলামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্যতা পরিষ্কার হবে।

৪) আমরা বিস্ময়ের সাথে আবিষ্কার করব যে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনটা এমনভাবে ডিজাইন করেছেন এবং ইহুদীদের চরিত্র কুরআন ও সীরাহ দ্বারা উন্মোচিত করেছেন যে আজও তা দিয়ে ইসরাইলের পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে ধারণা করা যাবে।

৫) এখনকার যায়োনিস্ট কারা, ইহুদী মাত্রই যায়ন কী না, কী তাদের দাবী ইত্যাদি বিষয়সমূহ স্পষ্ট হবে।

[1] ইব্রাহীম ইহুদী ছিলেন না এবং নাসারাও ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন 'হানীফ' অর্থাৎ, সব মিথ্যা ধর্মের প্রতি বিমুখ এবং আত্মসমর্পণকারী, এবং তিনি মুশরিক ছিলেন না। (৩: ৬৭)

শিকড়ের সন্ধানে-২

আমরা যখন বনী ইসরাঈলদের সম্পর্কে জানার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছিলাম তখন বলেছিলাম যে ওদেরকে আল্লাহ অনেক নিয়ামত দিয়েছিলেন, অবাধ্যতার জন্য যা কেড়ে নিয়েছেন। আমরা যখন ওদের কাহিনী বিস্তারিত পড়ব, তখন এই কথাটা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারব এবং তাদের অবস্থার এই বিশাল পরিবর্তন দেখে বিস্ময়াহত হয়ে যাবো! আপাত দৃষ্টিতে ধারাবাহিকতা বিবর্জিত ও র‍্যানডম মনে হলেও ইতিহাসের কোনো ঘটনাই আসলে তুচ্ছ নয়, বরং আল্লাহ্‌র সুনিপুণ পরিকল্পনার অংশ।

আর আগেই যেহেতু বলেছি মুসলিম জাতির অবস্থা পরিবর্তনের ধারাবাহিক ক্রমটাও অনুরূপ,তাই আজ থেকে যখন আমরা বনী ইসরাঈলদের কাহিনী ধারাবাহিকভাবে জানা শুরু করব, তখন থেকে আমাদের মন ও মগজে একটা বিষয় স্থায়ীভাবে গেঁথে যাওয়া দরকার---অন্যান্য জাতিদের উত্থান ও পতনের কারণ আর আমাদেরটা এক নয়।

একটা ছোট্ট উদাহরণ থেকে বিষয়টা আরো পরিষ্কার হতে পারে। আমরা যদি মনে করতে থাকি যে পশ্চিমাদের মত অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করার জন্য আমাদের ওদের মত সুদভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যস্থা গ্রহণ করতে হবে, তাহলে আমাদের খেয়াল করা উচিৎ যে এখন বিশ্বের সবচেয়ে দামী প্রাকৃতিক সম্পদ কিন্তু আল্লাহ রেখেছেন মুসলিম ভূমির নিচে। অথচ সেই সম্পদের নিয়ন্ত্রণ আদতে পশ্চিমা দেশগুলোর হাতে। অর্থ্যাৎ সম্পদ থাকাটা আমাদের উন্নতির নিয়ামক নয়।

আমাদের আরো বুঝতে হবে যে আল্লাহ্‌র সাহায্য কোনো জাতির কেনা স্থায়ী সম্পত্তি নয় যে চাইলেই আকাশ থেকে নেমে আসবে। এটা শর্তসাপেক্ষ, বনী ইসরাঈলদের কাহিনী তার প্রমাণ। সিরিয়াতে, ফিলিস্তিনে কচুকাটা হওয়া নিষ্পাপ শিশুদের মুখ দেখে আল্লাহ কই, আল্লাহ কেন এগুলা allow করছেন এসব প্রশ্ন করা থেকে বিরত থেকে এরপর থেকে আমরা অনুধাবন করব যে এটা আমাদেরই কর্মফল, আমাদেরই উদ্যোগ নিতে হবে অবস্থার পরিবর্তনে।

আর অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হলে প্রথমেই আমাদের জানতে হবে কেন আমাদের থেকে ক্ষমতা ও সম্মান কেড়ে নেয়া হয়েছে। সেই কারণের অনুপস্থিতিই শুধু আমাদের অবস্থার উত্তরণ ঘটাতে পারে। এই মৌলিক বিষয়টা না বুঝলে আমরা আমাদের করণীয় নিয়ে বেদিশা হয়ে ভুলভুলাইয়ার মাঝে ঘুরতে থাকব। মানুষকে ইসলামের দিকে ডাকার কৌশল হিসেবে আয়োজন করব বিশ্ব

মুসলিম সুন্দরী প্রতিযোগিতা! ভুলেই যাবো এটা নিশ্চিত করতে যে এত ঢাকঢোল পিটিয়ে যেটার দিকে ডাকছি, সেটা আদৌ ইসলাম কিনা!

যাই হোক, বনী ইসরাঈলদের কাহিনীর যাত্রা আমরা শুরু করব ইব্রাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিয়ে, যার কথা আগেই উল্লেখ করেছি যে উনাকে সবাই নিজেদের ধর্মের লোক বলে দাবী করতে চায়।

আমরা জানি যে উনার বাবা নিজে মূর্তিপূজক ছিলেন এবং নমরুদ তাকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তার নিজের লোকেরা যখন তার তাওহীদের বাণীর প্রতি মুখ ফিরিয়ে নিল তখন তিনি আল্লাহ্‌র নির্দেশে হিজরত করলেন। সাথে ছিল তার স্ত্রী সারাহ এবং ভাইয়ের ছেলে লূত আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পথিমধ্যে পড়ল মিশর, যেখানে ছিল একজন অত্যন্ত অত্যাচারী শাসক। সে সুন্দরী নারী দেখলেই তাদের স্বামীদের হত্যা করে তাদের নিজের কুক্ষিগত করত। যেহেতু ইব্রাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দাওয়াত গ্রহণকারীদের মাঝে সারাহই ছিলেন একমাত্র নারী, তাই তিনি জীবন বাঁচানোর জন্য তাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন নিজের বোন হিসেবে (দ্বীনী অর্থে)।

তারপরও সেই শাসক সারাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অসম্মানিত করার চেষ্টা করে। তিনি আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করেন, ফলে শাসকের হাত অচল হয়ে যায়। শাসক আকুতি জানান যে সারাহ যেনো তার সুস্থতার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করেন। সারাহ দয়াবশত তা করেন এবং সে সুস্থ হয়ে যায়। কিন্তু সুস্থ হয়ে গিয়ে সে আবার অনুরূপ প্রচেষ্টা চালায়। এভাবে তিনবারেরবার তার শিক্ষা হয়, সে সারাহকে ছেড়ে দেয় ও উপহার হিসেবে দান করে হাজেরাকে, যাকে ইব্রাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ে করেন।

এই দুই স্ত্রী, হাজেরা ও সারাহ...এদের গর্ভ থেকেই দুই বংশধারার সৃষ্টি হয়। একটি ধারা তৈরি হয় ইসমাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দ্বারা, আরেকটি ইসহাক্ব আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দ্বারা।

আল্লাহ্‌র নির্দেশে ইব্রাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দুধের শিশু ইসমাইল ও স্ত্রী হাজেরাকে আরবের মরুভূমিতে নির্বাসনে রেখে আসেন। পানির সন্ধানে হাজেরার সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মাঝে উদ্বিগ্ন হয়ে ছোটাছুটি করতে থাকেন। একে হাজ্জের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবে পালন করার মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ আজও তাঁকে স্মরণ করে সশ্রদ্ধ নম্রতায়। আল্লাহ্‌র অলৌকিক নিদর্শন হিসেবে ছোট্ট ইসমাইলের পায়ের কাছে সৃষ্টি হয় জমজম কূপ, যাকে কেন্দ্র করেই জনহীণ

মরুভূমি পরিণত হয় জনবহুল শহরে। ইসমাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বংশধররাও সেখানেই বেড়ে উঠতে থাকে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মাতরে। ইব্রাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনাকে সাথে নিয়েই নির্মাণ করেন কাবা শরীফ, যা কিনা মুসলিম উম্মাহর কিবলা।

ইব্রাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রথম স্ত্রীসহ বাস করতেন শামে-যা তখন এখনকার সিরিয়া, জেরুজালেমসহ বিশাল একটা জায়গা নিয়ে গঠিত ছিল। ফেরেশতারা যখন লুত আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জাতিকে ধ্বংস করার জন্য প্রেরিত হল, সেই একই সময়ে তারা ইব্রাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সারাহর গর্ভে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র ইসহাক্ব এর জন্মের সুসংবাদ দেয় । [1]

আমরা আগেই বলেছি যে ইয়াক্বুব আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেক নাম ছিল ইসরাঈল এবং উনার নামেই এই বংশধারা বনী ইসরাঈল নামে পরিচিত। আমরা জানি যে মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিরোধ ছিল মিশরের অধিপতির সাথে। তাহলে বংশানুক্রমে ইয়াক্বুব আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বসবাস যদি শাম দেশে হয় এবং সেটাই বনী ইসরাঈলদের দাবীকৃত আবাসভূমি হয়, তবে মিশরে তারা কিভাবে গেল? কুরআনে উল্লেখিত ঘটনাবলী আমরা বিচ্ছিনভাবে জানি, কিন্তু যোগসূত্রটা স্থাপন করতে ব্যর্থ হই বলে সামগ্রিক ছবিটা ফুটে ওঠে না। এই দুই জায়গার মাঝে সংযোগ স্থাপন করেছে সূরা ইউসুফ এর কাহিনী।

ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন ইয়াক্বুব আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ছেলে। উনার ভাইরা হিংসার বশবর্তী হয়ে উনাকে কূপে ফেলে দিয়েছিল। সেই কূপ থেকে উদ্ধারকারীরা তাকে ক্রীতদাস হিসেবে বেঁচে দিয়েছিল মিশরে। উনার ক্রেতা ছিল সেখানকার একজন কর্তা স্থানীয় ব্যক্তি। আল্লাহ্‌র সুনিপুণ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে একসময় ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিশরের মন্ত্রী হন। [2] উনার ভাইদের চক্রান্তও ফাঁস হয়ে যায়। ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষমার অসামান্য নিদর্শন স্থাপন করে তাদের মাফ করে দেন এবং তাঁর পরিবারের সকল সদস্যদের মিশরে নিয়ে আসেন। এই হল শাম ও মিশরের মাঝে সম্পর্ক।
মিশরে অবস্থানকৃত বনী ইসরাঈলদের মাঝেই আল্লাহ মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করেছিলেন।

এরপরের পর্বে আমরা মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাহিনী ধারাবাহিকভাবে জানা শুরু করব ইনশাল্লাহ।

---

[1] ১১:৭০-৭১

[2] বিস্তারিত যে সূরা ইউসুফ এর তাফসীর থেকে জানা যাবে। ইয়াসীর ক্বাদীর এই ভিডিও সিরিজটাও দেখতে পারেন http://www.youtube.com/watch?v=IlFPWpR8F50

শিকড়ের সন্ধানে-৩

আগের পর্বে আমরা ইউসুফ আলাইহিওয়াসাল্লামের মাধ্যমে বনী ইসরাঈলরা কিভাবে প্যালেস্টাইন থেকে মিশরে আসল। এখানে একটা ব্যাপার খেয়াল করার মত যে ইউসুফ আলাইহিওয়াসাল্লামের মত একজন ভিনদেশী কিভাবে হঠাৎ করে এত কর্তৃত্বশীল পদ পেলেন। ব্যাপারটা কিছুটা অস্বাভাবিক বৈকি। ইতিহাসের আলোকে দেখলে ব্যাপারটা আর খাপছাড়া লাগে না। কারণ ইউসুফ আলাইহিওয়াসাল্লাম যখন উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হলেন তখন মিশরের শাসনক্ষমতায় যারা ছিল, তারা নিজেরাই ছিল ভিনদেশী, অমিশরীয়। ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি এই জাতির নাম ছিল হিক্সস (Hyksos)। তারা ১৭২০ খ্রি.পূর্বে মিশরের শাসন ক্ষমতা দখল করে। যতদিন তারা ক্ষমতায় ছিল, ততদিন বনী ইসরাঈলরা মিশরে মোটামুটি সম্মানের সাথেই অবস্থান করেছে। কিন্তু ১৫৬০ খ্রি.পূর্বের দিকে মিশরীয়রা ভিনদেশী হিক্সস জাতিকে দূর করে দিয়ে নিজেরা শাসনক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে। এই সময়টা প্রাচীন মিশরের ইতিহাসে New Kingdom এর সূচনাকাল হিসেবে পরিচিত।

এখানে কুরআনের একটা দারুণ linguistic miracle রয়েছে যা আমরা অনেকেই জানি না। কুরআন যতবার ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়কালে মিশরের রাজার কথা উল্লেখ করছে (১২:৪৩, ১২:৭২), ততবার তাকে উল্লেখ করছে 'মালিক' (Malik বা king) হিসেবে, ফারাও বা ফেরাউন না। ফেরাউন হিসেবে উল্লেখ করছে মুসা আলাইহিওয়াসাল্লামের সময়কালে মিশরের যে প্রধান ছিল, তাকে (৭: ১০৪, ১০:৭৫)। এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটার বিশাল ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। আমাদের অনেকেরই ধারণা হচ্ছে মিশরের রাজামাত্রই বুঝি তাকে ফেরাউন বলে ডাকা হত। কিন্তু ইতিহাস আমাদের জানায় যে ১৫৬০ খ্রি.পূর্বে New Kingdom এর সূচনা হওয়ার পর থেকে মিশরের রাজারা ফেরাউন উপাধি গ্রহণ করে, তার আগে না। অথচ বাইবেল এই দুই সময়ের মাঝে কোনো পার্থক্য করেনি, সেখানে সবসময়ই মিশরের রাজাদের ফেরাউন নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে.....

যাই হোক, ফেরাউন তথা মিশরীয়রা যখন ক্ষমতায় আসে তখন এক অন্ধ জাতীয়তাবাদ সমস্ত বিদেশীদের প্রতি তাদের ক্রোধে উন্মুক্ত করে তোলে। যেহেতু হিক্সসদের সময়ে বনী ইসরাঈলরা মিশরে এসেছিল তাই তাদের প্রতিও শাসকগোষ্ঠীর ছিল প্রচণ্ড বিরাগ। এসময় বনী ইসরাঈলদের সাথে দাস দাসীর মত আচরণ করা হত (২৬:২২), তারা ছিল চরম নির্যাতিত ও অত্যাচারিত।

মুসা আলাইহিওয়াসাল্লামের জন্ম ও বেড়ে ওঠাঃ

বনী ইসরাঈলরা যখন ফেরাউনের শাসনামলে চরম অসহায়, এই সময়ে ফেরাউন একটা স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারকগণ যার ব্যাখ্যা এভাবে করে যে এর অর্থ হচ্ছে বনী ইসরাঈলদের মাঝ থেকে একজন শিশু সন্তান তার সাম্রাজ্য দখল করে নেবে। এটা ঠেকানোর জন্য ফেরাউন সিদ্ধান্ত নেয় যে বনী ইসরাঈলদের ঘরের প্রতিটা ছেলে সন্তানকে হত্যা করা হবে, এবং সে তা করতেও থাকে (২৮:৪, ২:৪৯) । [1]

কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা সুনিপুণ। সর্বোচ্চ চেষ্টার পরও মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয় ফেরাউনের বাহিনী, তিনি দুনিয়াতে আবির্ভুত হন। আল্লাহ্ তার মাকে নির্দেশ দেন যেন তিনি মুসাকে নীল নদে ভাসিয়ে দেন এবং প্রতিজ্ঞা করেন যে তা সন্তানকে তিনি তাঁর বুকে ফিরিয়ে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য.....

তাই মুসা আলাইহিওয়াসাল্লামকে বহনকারী সিন্দুকটা এসে ঠেকে স্বয়ং ফিরাউনের প্রাসাদের সামনে। সব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে দুনিয়াতে যার আগমন ঠেকানোর জন্য ফেরাউন শত শত শিশুকে হত্যা করেছিল, সে লালিত পালিত হতে থাকে তার নিজের ঘরেই। আর দুধ খাওয়ানোর জন্য তাকে পাঠানো হয় মুসা আলাইহিওয়াসাল্লামের মায়ের কাছে! [2]

মুসা আলাইহিওয়াসাল্লামের মিশর ত্যাগঃ

মোটামুটি তরুণ বয়সে পৌঁছানোর পর একদিন মুসা আলাইহিওয়াসাল্লাম দেখলেন একজন মিশরীয়র সাথে একজন বনী ইসরাঈলীয়র বাক বিতণ্ডা হচ্ছে। তখন উনি ইসরাঈলীয়র পক্ষ নিয়ে মিশরীয়কে একটি ঘুষি দিতেই ঐ ব্যক্তিটি মারা যায়। এটা ছিল একেবারেই অনিচ্ছাকৃত এবং উনি সাথে সাথেই খুব অনুতপ্ত হলেন। তখনকার সময় এবং পরিস্থিতি এমন ছিল যে একজন মিশরীয় নিহত হয়েছে এটা ছিল বিশাল একটা ব্যাপার। সবার মাঝে সাড়া পড়ে গেল কে এই হত্যাকারী এটা নিয়ে। পরেরদিন দেখা গেল ঐ বনী ইসরাঈলীয় আবার আরেকটি ঝামেলা পাকিয়ে বসেছে এবং সে পুনরায় মুসা আলাইহিওয়াসাল্লামের সাহায্য চাইতে থাকল। তখন মুসা আলাইহিওয়াসাল্লাম বুঝলেন যে দোষ ঐ বনী ইসরাঈলীয়রই। উনি যখন ওকে শায়েস্তা করতে চাইলেন তখন সে বলে উঠল তুমি কি আজ আমাকে সেভাবে হত্যা করবে যেভাবে গতকাল একজন মিশরীয়কে হত্যা করেছ?

ব্যাস এইভাবে নিজের স্বজাতির মুখ দিয়েই বের হয়ে গেল যে আগের দিনে মিশরীয়র হত্যাকারী কে ছিল.....

বলাই বাহুল্য যে ফেরাউন ও তার সভাষদগণ মুসা আলাইহিওয়াসাল্লামকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিল। তখন মুসা আলাইহিওয়াসাল্লাম শহর থেকে বেরিয়ে পালিয়ে গেলেন, রওনা হলেন মাদইয়ান অভিমুখে। [3]

[1] এই জায়গায় আমাদের একটা বিশাল শিক্ষণীয় আছে। প্যালেস্টাইনের নিরীহ শিশুগুলোর নিষ্পাপ মুখ যখন আমাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ সৃষ্টি করছে তখন আমাদের মনে রাখতে হবে ক্ষমতাসীনদের দ্বারা এমন পাশবিক কাজ যুগে যুগেই হয়ে এসেছে, এটা নতুন কিছু না।

[2] এই পুরো ঘটনাটা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, তবে আগে যেমনটা বলেছি, সেভাবে.....তিনটা সূরাতে বিচ্ছিন্নভাবে। জায়গাগুলো হল- ২০:৩৮, ৩৯, ৪০ + ২৬:১৮ + ২৮:৭-১৩। আগ্রহী পাঠকরা পড়ে দেখতে পারেন।

[3] এই পুরো ঘটনাটা বর্ণিত হয়েছে সূরা ক্বাসাসে-১৫ থেকে ২২ আয়াত পর্যন্ত।

শিকড়ের সন্ধানে-৪

মুসা আলাইহিওয়াসাল্লামের বিয়ে ও মাদইয়ানে অবস্থানঃ

মুসা আলাইহিওয়াসাল্লাম মাদইয়ান পৌঁছালেন ক্লান্ত শ্রান্ত অবস্থায়। এই অবস্থাতেই এক কূপের ধারে পানি নিতে গিয়ে দুজন মেয়েকে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তিনি তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে গেলেন.....তাদের পানি তুলে দিতে সাহায্য করলেন। এখানে উল্লেখ্য যে আমাদের বক্ষমান নোটের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরআনে বর্ণিত বনী ইসরাঈলদের কাহিনী ক্রমানুসারে বর্ণনা করা এবং সেখান থেকে আমাদের উম্মাহর জন্য প্রাসঙ্গিক শিক্ষাগুলোর দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। সেজন্য আমরা সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যাবো না। তা না হলে এই ঘটনাটা ব্যক্তিগতভাবে আমার খুব প্রিয় এবং এখানে একজন মুসলিম মেয়ের sense of modesty এবং ছেলেদের সাথে interaction এর ধরণ কেমন হওয়া উচিৎ সেটা খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

যাই হোক, এরপর এই মেয়ে দুজনের একজনের সাথে মুসা আলাইহিওয়াসাল্লামের বিয়ে হয় এবং মেয়েদের বাবার সাথে করা চুক্তি অনুযায়ী তিনি মাদইয়ানে ১০ বছর অবস্থান করেন। [1] এর পর তিনি মিশরের উদ্দেশ্যে রওনা হন।

মুসা আলাইহিওয়াসাল্লামের সাথে আল্লাহর কথোপকথন এবং নবুয়্যত লাভঃ

পথিমধ্যে তিনি আল্লাহর কাছ থেকে নবুয়্যতপ্রাপ্ত হন। আল্লাহ্ তাকে দুটি মুযিজা দান করেন এবং ফিরাউনের কাছে গিয়ে তাকে আলাহর পথে দাওয়াত দিতে বলেন। মুসা আলাইহিওয়াসাল্লাম আশংকা প্রকাশ করেন যে ফিরাউন হয়ত তাকে হত্যা করে ফেলবে। আল্লাহ্ সুবহানুওয়াতা'লা তাকে অভয় দেন। মুসা আলাইহিওয়াসাল্লাম পুনরায় নিজের অসহায়তা প্রকাশ করে আল্লাহর কাছে কিছু দুআ করেন, সাথে তাঁর বড় ভাই হারুন আলাইহিওয়াসাল্লাম নিজের সঙ্গী হিসেবে প্রার্থনা করেন। আল্লাহ্ তাঁর সবগুলো দুআই কবুল করেন।

আগেই বলেছি কুরআনে এই কাহিনীগুলো এসেছে বিচ্ছিন্নভাবে। যেমন এই কথোপকথনের পূর্ণাংগ চিত্রটা যদি আমরা পেতে চাই তাহলে আমাদের সূরা ত্বোহার ৯-৪৬ আয়াত এবং ক্বাসাসের ২৯-৩৫ আয়াতগুলো একসাথে জড়ো করে পড়তে হবে।

এখানে একটা ব্যাপার বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে আল্লাহ্ যখন ফিরাউনকে দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ দিলেন তখন তাঁকে বললেন তিনি যেন ফিরাউনের সাথে নম্রভাবে কথা বলেন! (২০:৪৪) আল্লাহ্

তো জানতেন যে ফিরাউনকে দাওয়াত দিয়ে কোনো লাভ হবে না.....তবু মুসা আলাইহিওয়াসাল্লাম যেন আশা না হারান সেজন্য তাকে বললেন "হয়তো সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে।" [2]

মুসা আলাইহিওয়াসাল্লাম কর্তৃক ফিরাউনকে দাওয়াহ প্রদানঃ

মুসা আলাইহিওয়াসাল্লাম প্রথম যখন গিয়ে ফিরাউনের সাথে কথোপকথনে লিপ্ত হলেন, সেটা মোটামুটি ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে সূরা ত্বোহাতে (৪৭ থেকে ৫২) এবং সূরা আশ-শুআরাতে (১৬-৩৩)। ফিরাউনকে মুসা আলাইহিওয়াসাল্লাম মূলত দুটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন-

১) সে যেন ইসলাম গ্রহণ করে
২) অথবা বনী ইসরাঈলদের মুক্ত করে দিয়ে তাঁর সাথে প্যালেস্টাইনে ফেরৎ যেতে দেয়।

ফিরাউনের প্রতিক্রিয়াঃ

সত্যি কথা হচ্ছে ফিরাউনের প্রতিক্রিয়ার ধারাবাহিকতাটা ছিল খুবই Interesting। আমরা IOU (Islamic online university- www.islamiconlineuniversity.com) এ দাওয়াহ কোর্সে এই কথোপকথনের বিশ্লেষণ পড়েছি। প্রথমে সে একথা সেকথা নানা প্রসঙ্গ তুলে মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যের মোড় ঘুরানোর চেষ্টা করে। কিন্তু আমরা মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখি তাঁর পয়েন্টে অবিচল থাকতে। কথার খেই না হারিয়ে তিনি আল্লাহর পরিচয় দিয়ে যেতে থাকেন। তখন ক্ষুব্ধ ফিরাউন প্রথমে মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কারাগারে নিক্ষেপ করতে চায়। পরে মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আল্লাহর দেয়া মুযিজাগুলো দেখান, তখন ফিরাউন সেগুলোকে সুস্পষ্ট যাদু হিসেবে আখ্যায়িত করে। সে প্রস্তাব করে যেন মুসা আলাইহিওয়াসাল্লাম ও তাঁর ভাইকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়। তখন তাঁর সভাসদরাই তাকে পরামর্শ দেয় যেন তাঁদের আরো কিছুদিন অবকাশ দেয়া হয় এবং যাদুকরদের সাথে একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

যাদুকরদের সাথে মুসা আলাইহিওয়াসাল্লামের প্রতিযোগিতার আয়োজনঃ

ফিরাউন ওর নিজের যাদুকরদের বিজয়ের ব্যাপারে এতটাই আত্মবিশ্বাসী ছিল যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এক উৎসবের দিনে যেদিন কী না বহু লোকের সমাগম ঘটবে। কিন্তু তাঁর এই পরিকল্পনা ব্যাকফায়ার করে.....

যাদুকররা ফিরাউনের কাছ থেকে অনেক পুরষ্কার পাবার আশায় তাদের শ্রেষ্ঠ কৌশল প্রদর্শন করে, কিন্তু মুসা আলাইহিওয়াসাল্লাম আল্লাহর ইচ্ছায় তাদেরকে হার মানানো কৌশল দেখাতে সক্ষম হন। যাদুকররা উপলব্ধি করে যে এটা মানুষের পক্ষ থেকে আগত কোনো কৌশল নয়.....

ফিরাউনকে হতভম্ব করে দিয়ে সকল যাদুকররা প্রকাশ্য দিবালোকে সবার সামনে ঈমান আনে। ক্রোধে উন্মত্ত ফিরাউন বলতে থাকে যে নিশ্চয়ই মুসা আলাইহিওয়াসাল্লামের সাথে যাদুকরদের কোনো আঁতাত হয়েছে, ফলে তারা এভাবে দল পাল্টিয়ে ফেলেছে। সে যাদুকরদের হত্যার হুমকি দেয়। কিন্তু তাদের ঈমান এতটাই মজবুত হয় যে এজন্য নিজেদের জীবন দিয়ে দিতেও দ্বিধা বোধ করে না.....ফিরাউন তৎক্ষণাৎ তাদের হত্যা করে। [3]
যাদুকরদের এই কাহিনীর বিবরণ পাওয়া যাবে ২৬: ৩৭-৫১, ২০:৫৮-৭৪, ৭: ১১০-১২৬ আয়াতে।

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ্য যে তৎকালীন মিশরে জাদুবিদ্যার খুব সম্মান ছিল। [2] কিন্তু ফিরাউন যেসব জাদুকরদের নিযুক্ত করেছিল তারা ছিল সর্বশ্রেষ্ঠদের দল, যাকে বলা যায় cream of the society। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে ঈমান আনার অর্থ প্রাণ হারানো এটা জানা স্বত্ত্বেও জাদুকররা কেন ঈমান এনেছিল? এর কারণ ছিল একটাই.....জ্ঞান। জাদু বিদ্যায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বলেই ওরা বুঝতে পেরেছিল মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কারিগরী কোনো জাদু নয়, তথা দৃষ্টির কোনো কারসাজি নয়, এটা অতিপ্রাকৃত কিছু। এটা থেকে আমরা বুঝলাম যে সত্য অনুধাবনের জন্য দুটো সহায়ক গুণাবলী হল-

১) জ্ঞান, সেটা যেই ফিল্ডেরই হোক না কেন
২) সত্য গ্রহণের ব্যাপারে নিরপেক্ষ এক হৃদয় যাতে অহংকার নেই।

দ্বিতীয় বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। যাদুকরদের হৃদয় কলুষিত ছিল না, তাই তারা সত্য গ্রহণে পিছপা হয়নি। অথচ ঠিক উল্টাটা ঘটেছিল ফিরাউনের ব্যাপারে, যে সম্পর্কে আমরা পরের পর্বে জানবো ইনশাল্লাহ।

[1] পুরো কাহিনী রয়েছে সূরা ক্বাসাসের (২৮ নং সূরা) ২৩-২৮ নাম্বার আয়াতে।

[2] এখান থেকে আমরা দাওয়াতী কাজের দুটো খুব গুরুত্বপুর্ণ মূলনীতি পাই- ১) নম্রতা ২) আশাবাদিতা বা ইতিবাচক মনোভাব

[3] যখন যে সমাজে যে skill বা Quality র মর্যাদা সবচেয়ে বেশী থাকে, আল্লাহ্ তাঁর নবীদের ওই বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা দিয়ে পাঠান যেন লোকেরা তাঁর আনুগত্য মেনে নেন। শুধু মুসা

আলাইহি ওয়াসাল্লামই নয় ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও এমন মুযিজা দেয়া হয়েছিল যা তৎকালীন চিকিৎসা বিদ্যাকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। আর আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআন দিয়ে পাঠিয়েছিলেন যার পাতায় পাতায় রয়েছে linguistic miracle, যা আরবদের ভাষাগত দক্ষতাকে পরাজিত করে দিয়েছিল।

[4] এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে এককালে যেসব যাদুকররা ছিল ফিরাউনের অতি প্রিয় পাত্র, ঈমান আনার পর তৎক্ষণাৎ তাদের হত্যা করতে ফিরাউন বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করল না...তাই আমরা যদি আশা করি যে ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে আমরা জালিম শাসকদের বদান্যতা পাবো, তবে তা দুরাশা মাত্র।

শিকড়ের সন্ধানে-৫

যাদুকরদের ঘটনার পর ফিরাউন ও মিশরীয়দের প্রতিক্রিয়াঃ

ফিরাউনের প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে আল্লাহ্ বলছেন যে সে ঠিকই সত্য চিহ্নিত করতে পেরেছিল, কিন্তু অহংকারবশত ঈমান আনেনি (২৭:১৪)। বনী ইসরাঈলদের কাহিনীর একটা খুব ইন্টারেস্টিং দিক হচ্ছে এখানে সবসময় এমন চরিত্র থাকে বা এমন ঘটনা থাকে যেটার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে। যেমন অনেকেই আবু জাহলকে তুলনা করেন ফিরাউনের সাথে। সেও কিন্তু ঠিকই বুঝতে পেরেছিল যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম সত্য নবী, তবুও নিজ গোত্রের প্রতি আনুগত্যের কারণে ইসলাম গ্রহণ করেনি।

যাদুকরদের ঈমান আনার ঘটনার পরও খুব কম সংখ্যক লোকই ঈমান এনেছিল। বাকিরা সত্যকে অনুধাবন করতে পারলেও ফিরাউনের ভয়ে সাহস করেনি। আল্লাহ্ কুরআনে এই অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বলছেন-

ফেরাউনের সম্প্রদায়ের র্সদাররা বলল, তুমি কি এমনি ছেড়ে দেবে মূসা ও তার সম্প্রদায়কে। দেশময় হৈ-চৈ করার জন্য এবং তোমাকে ও তোমার দেব-দেবীকে বাতিল করে দেবার জন্য। সে বলল, আমি এখনি হত্যা করব তাদের পুত্র সন্তানদিগকে; আর জীবিত রাখব মেয়েদেরকে। বস্তুতঃ আমরা তাদের উপর প্রবল। (৭:১২৭)

মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনে বনী ইসরাঈলদের প্রতিক্রিয়াঃ

এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে বনী ইসরাঈলদের প্রতিক্রিয়া। মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের জন্য প্রেরিত হয়েছেন, তিনি চাচ্ছেন তাদেরকে প্যালেস্টাইনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে অথচ এই পুরো ব্যাপারটাতে সামগ্রিকভাবে তারাতো খুশী ছিলই না, উল্টা আরো বিরক্ত হচ্ছিল...সেটা তারা প্রকাশও করেছিল স্পষ্ট ভাষায়-

তারা বলল, আমাদের কষ্ট ছিল তোমার আসার পূর্বে এবং তোমার আসার পরে। (৭:১২৯)

অর্থ্যাৎ তাদের আগের যে দাসত্বের জীবন, সেটাতে তারা এতটাই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল যে সেই status quo থেকে বেরিয়ে আসার জন্য তারা কোনো ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি ছিল না... [1]

ফিরাউনের অনুসারীদের উপর নানা ধরণের আযাবঃ

ঈমান আনয়নে বাধ্য করার জন্য আল্লাহ্ ফিরাউনের অনুসারীদের উপর নানা ধরনের আযাব পাঠালেন। এর মাঝে রয়েছে দুর্ভিক্ষ, তুফান, পঙ্গপাল, উকুন ব্যাঙ ইত্যাদি। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যখনই কোনো বিপদ আসত তখন তারা বনী ইসরাঈলদের অনুরোধ করত তারা যেন তাদের রবের কাছে দুআ করে এই বিপদ সরিয়ে নেয়। তাহলেই তারা ঈমান আনবে এবং বনী ইসরাঈলদের চলে যেতে দেবে (৭:১৩৪-৩৫) । অথচ আযাব সরিয়ে নেইয়া হলেই তারা তাদের করা এই ওয়াদা বেমালুম ভুলে যেত। [2]

বনী ইসরাঈলদের নিয়ে মুসা আলাইহিওয়াসাল্লামের মিশর ত্যাগ ও ফিরাউনের পতনঃ

এমনভাবে বারবার করে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পর আল্লাহ্ ঠিক করলেন যে তিনি ফিরাউনের অনুসারীদের আর সময় দেবেন না।

তিনি মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিলেন রাতের অন্ধকারে বনী ইসরাঈলদের নিয়ে বেরিয়ে পড়তে।

ফিরাউন সেটা টের পেয়ে গেল, এটা সে কোনোভাবেই সহ্য করতে পারল না যে এভাবে বনী ইসরাঈলীয়রা নির্বিঘ্নে তার নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে যাবে। তাই ভোররাত্রের দিকে সে তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে বনী ইসরাঈলদের পিছু নিল....

লোহিত সাগরের কাছাকাছি যখন, তখন ওরা তাদের প্রায় ধরে ফেলল। তখন মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গে থাকা বনী ইসরাঈলদের সামনে এক কঠিন সময়.....সামনে সাগর, পেছনে ফিরাউন তার বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে...

এমতাবস্থায় বনী ইসরাঈলরা তাদের স্বভাবসুলভ আচরণই প্রদর্শন করল! তারা মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অভিযুক্ত করতে থাকল তাদের এই পরিণতির জন্য...কিন্তু মুসা আলাইহিওয়াসাল্লাম ছিলেন আল্লাহর উপর ভরসাতে অবিচল।

এমন সময়ে ওহী আসল যে মুসা আলাইহিওয়াসাল্লাম যেন তার লাঠিটা দিয়ে সমুদ্রে আঘাত করেন, ফলে সমুদ্রের মাঝ দিয়ে শুকনা রাস্তা তৈরি হয়ে গেল, বনী ইসরাঈল নির্বিঘ্নে সমুদ্র পার হয়ে ওপারে চলে গেল (২৬:৬৩-৩৩)

ফিরাউন যখন দেখল যে সমুদ্রের মাঝখানে শুষ্ক পথ, সেও তার দলবল নিয়ে ওটার মাঝে চলা শুরু করল। বনী ইসরাঈলীয়রা যখন ঐপারে, ফিরাউন তার সঙ্গী সাথী সহ মাঝ সমুদ্রে। এই

অবস্থায় রাস্তা আবার মিলিয়ে গেল, ফিরাউন ও তার পুরো বাহিনীর সলিল সমাধি ঘটল..(২০:৭৮, ১০:৯০)

কটা মজার বিষয় হচ্ছে ফিরাউন কিন্তু এই শেষ সময়ে ঈমান এনেছিল (১০:৯০), কিন্তু তার সেই ঈমান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নাই। এ সময়ের একটা ঘটনা আমার খুব প্রিয়, মনে করলেই, মনটা ভালো হয়ে যায়।

সহীহ হাদীসে আছে যে ফিরাউন যখন পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছিল তখন জিব্রাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মুখে কিছু শুকনা মাটি ছুঁড়ে দেন, যেন সে এমন কিছু বলতে না পারে যার জন্য দয়াপরবশ হয়ে আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। চিন্তা করেন! জিব্রাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আল্লাহকে আমাদের চাইতে ভালো চিনেন, উনার মনে হয়েছিল যে আল্লাহ্ ফিরাউনকে ক্ষমা করলেও করে দিতে পারেন। আমার রাব্ব কতটা ক্ষমাশীল আলহামদুলিল্লাহ!

কিন্তু তবুও ফিরাউনের ঈমান গৃহীত হয়নি কেন? কারণ সে ঈমান এনেছিল যখন তার আত্মা তার গলার কাছে চলে এসেছিল, তার সামনে গায়েবের দরজা খুলে দেয়া হয়েছিল। সেই অবস্থায় সবাই-ই আসলে ঈমান আনবে, তাই তখন ঈমান আনা অর্থহীন। আমরা অনেকেই হয়ত জানি যে আমাদের চোখের সামনে এখন একটা পর্দা আছে যেটার জন্য আমরা এখন ইন্দ্রিয়ের সীমানার বাইরের জিনিস দেখতে পাই না, মৃত্যুর আগ মুহূর্তে সেই পর্দা তুলে নেয়া হবে, তখন আমরা সব কিছুই দেখতে পাব (জান্নাত- জাহান্নাম, ফেরেশতাদের ইত্যাদি)। সেজন্য আমরা পড়ে এসেছি যে তওবা কবুল হওয়ার দুটি শেষ সময় আছে, একটা এই যখন রুহ গলার কাছে চলে আসে এগুলোর কোন একটা সময় চলে আসলে... সূর্য পশ্চিম দিকে উঠলে...তওবা আর কবুল হবেনা। সে জন্যই ফিরাউনেরটা হয় নাই...

[1] এই জায়গায় কি এসে আমাদের সাথে কোনো মিল পাওয়া যায়? ইসলাম রাষ্টীয় ক্ষমতায় নেই বলে, ইসলামী অর্থ ও আইন ব্যবস্থা বর্তমানে অনুপস্থিত বলে আমাদের জীবনে এক্টার পর একটা সমস্যার আবির্ভাব ঘটছে যা আমাদের জীবনকে এককথায় দুর্বিষহ করে তুলছে। অথচ এগুলো প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে সামান্য ত্যাগের দরকার সেটাও আমরা করতে রাজি না। সুরভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার কথাই ধরুন, সুদের জন্য জিনিসপত্রের দাম আকাশচুম্বী, অথচ আমরা সুদ ভিত্তিক ব্যাংকের সাথে লেনদেন, সেখানে চাকরি ইত্যাদি ছাড়তে প্রস্তুত না একদমই!

[2] এই অভ্যাসটাও কি চেনা চেনা লাগে? এই কিছুদিন আগেই যখন প্রচণ্ড খরা হল তখন আমরা অনেকেই কিন্তু আল্লাহমুখী হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর যেই বৃষ্টিটা নামল, আমরা আবার ফিরে গেলাম আমাদের অবাধ্যতাপূর্ণ জীবনে, তাই নয় কি?

শিকড়ের সন্ধানে-৬

আজকের পর্বে প্রথমে আমরা গত পর্বে উল্লেখ করা ঘটনাগুলোর একটা বিশ্লেষণ করব ইনশাল্লাহ। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

গত পর্বের ঘটনাবলী থেকে **১ম** শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্ কর্তৃক মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমুদ্র লাঠি দিয়ে আঘাত করতে বলা। সমুদ্রে লাঠি দিয়ে আঘাত করলে কী হয়? কিছু কি হয়? কখনো না...এটা সবসময়ই আল্লাহর মুযিজা ছিল...যা মানুষের পক্ষে ঘটনা সম্ভব না। কিন্তু তবুও আল্লাহ্ উনাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করতে বললেন, যেটা থেকে আমরা বুঝি যে যত সামান্যই হোক না কেন, আমাদের নিজেদের সাধ্যমত চেষ্টা করে যেতে হবে। আমরা যদি আমাদের শেষ বিন্দু দিয়ে চেষ্টা না করি, তাহলে আল্লাহর সাহায্য আসবে না। আজকে আমরা যখন ইসলামী কাজ করতে চাই, এই ঘটনাটার মাঝে আমাদের জন্য বিশাল শিক্ষা লুকিয়ে আছে-----সেটা হল ফলাফলের মালিক আল্লাহ্। আমাদের কাজে আমরা সফল হতে পারলাম কী না সেটার জন্য আল্লাহ্ আমাদের ধরবেন না, আল্লাহর ধরবেন আমরা আমাদের সামর্থ্য অনুযাইয়ী চেষ্টা করছিলাম কী না সেটার জন্য.....

আরেকটা বিষয় যেটা দৃষ্টি আকর্ষণের দাবী রাখে, সেটা হল আমাদের পূর্বাপর নবীদের জন্য মুযিজাগুলোর স্বরূপ। আমরা দেখছি যে উনাদের জন্য এমন মুযিজা ছিল যেগুলো ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। যারা এই ঘটনা বাস্তবে দেখেছে, তাদের জন্য এটা ছিল মিরাক্যল। কিন্তু আস্তে আস্তে পরবর্তী প্রজন্ম (যেমন ধরুন আমরা) যখন এই কাহিনী শুনবে তখন তাদের কাছে এটা হয়ে যাবে একটা 'গল্প', যার আবেদন কখনোই তাদের মত হবে না যেমনটা প্রথম প্রজন্মের কাছে ছিল। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ব্যাপারটা ছিল পুরাই অন্যরকম। আল্লাহ্ উনাকে দিয়েছেন linguistic miracle যা কী না কিয়ামত পর্যন্ত সকল প্রজন্মের জন্য এক বিস্ময়। প্রতিটা প্রজন্ম যারা মূল আরবীতে কুরআন বুঝবে এবং এটা নিয়ে চিন্তা করবে, সেই বিস্ময়াভিভূত হয়ে যায়। কিন্তু আফসোস আমরা কুরআন আরবীতে দূরে থাক, বাংলাতেই পড়ি না, আর সেজন্যই আমাদের জীবনে এটার কোনো প্রভাব নেই.....

এখানে উল্লেখ্য যে মুসা আলাইহিওয়াসাল্লামের এই বনী ইসরাঈলদের নিয়ে বের হয়ে যাওয়ার ঘটনা Exodus নামে বহুল পরিচিত যে নামে ওল্ড টেস্টামেন্টের একটা পুস্তিকাও রয়েছে।

কুরআনের বর্ণনা ও বাইবেলের বর্ণনার মাঝে পার্থক্যঃ

এই যে কাহিনীগুলো এখন আমরা পড়ছি এগুলো কিন্তু বাইবেলেও আছে। কিন্তু বাইবেলের বর্ণনার সাথে কুরআনের বর্ণনার একটা খুব চোখে পড়ার মত পার্থক্য আছে- সেটা হল ঘটনার অপ্রয়োজনীয় বিবরণ উল্লেখ না করা।

মানুষ যখন কোনো একটা ঘটনার বর্ণনা দেয় তখন সে আশেপাশের অনেক কিছু, মানুষটার ইত্যাদি অনেক কিছু নিয়ে বলেন। ধরেন আপনাকে যদি কোনো দুর্ঘটনার বর্ণনা দিতে বলা হয়, এটাই স্বাভাবিক যে আপনি বলবেন যে লোকটা আহত হয়েছিল সে কালো রঙয়ের শার্ট পরা ছিল, ওর সাথে ওনার দুজন মেয়ে ছিল ইত্যাদি। কিন্তু আল্লাহ্ যদি এই একই ঘটনার বর্ণনা কুরআনে দেন, তাহলে দেখা যাবে উনি ঠিক ততটুকুই উল্লেখ করছেন যতটুকু আমাদের শিক্ষা নেয়ার জন্য দরকার। এর চেয়ে একটা বাক্য বেশীও না, কমও না। যেহেতু কুরআন প্রাথমিকভাবে একটা শিক্ষামূলক গ্রন্থ, তাই এক্ষেত্রে এই অ্যাপ্রোচ গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যদিকে বাইবেলে যে মানুষের হাতের ছোঁয়া পড়েছে সেটা ঘটনাগুলোর বিবরণ পড়লেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ধরুন এই অভিযানের সময় বনী ইসরাঈলরা সংখ্যায় কতজন ছিল, মুসা আলাইহিওয়াসাল্লাম কতদিন বেঁচে ছিলেন, এগুলো অপ্রয়োজনীয় তথ্য, যা আপনি বাইবেলের বর্ণনায় পাবেন, কুরআনে না। তাই বাইবেলের বর্ণনা যতটাই না গল্পের বই টাইপ, কুরআনের বর্ণনা ঠিক ততটাই divine, আলহামদুলিল্লাহ।

প্যালেস্টাইনের পথে বনী ইসরাঈলদের যাত্রাঃ

লোহিত সাগর পার হয়ে ওই পারে পৌঁছতেই বনী ইসরাঈলরা এক লোকালয়ের পাশ দিয়ে পার হচ্ছিল যার অধিবাসীরা ছিল মূর্তিপূজক। তাদেরকে দেখেই মাত্র আল্লাহর নিদর্শন নিজ চোখে দেখে আসা বনী ইসরাঈলরা এক অদ্ভুত মন্তব্য করে বসল। কী ছিল সেই মন্তব্য? আসুন কুরআনের ভাষাতেই শোনা যাক-

বস্তুতঃ আমি সাগর পার করে দিয়েছি বনী-ইসরাঈলদিগকে। তখন তারা এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে পৌছাল, যারা স্বহস্তনির্মিত মূর্তিপুজায় নিয়োজিত ছিল। তারা বলতে লাগল, হে মূসা; আমাদের উপাসনার জন্যও তাদের মূর্তির মতই একটি মূর্তি নির্মাণ করে দিন। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে বড়ই অজ্ঞতা রয়েছে। (৭:১৩৮)

ওরা মূর্তিপূজা করতে চাইল! ভাবা যায়? [1] মাত্র যারা আল্লাহর মুযিজা স্বচক্ষে দেখে সাগর পার হয়ে এসেছে, তারা কীনা নিরাপদ স্থানে এসেই আল্লাহর সাথে শিরক করতে চাইল! মুসা আলাইহিওয়াসাল্লামের প্রতিক্রিয়াটা দেখুন, উনি কিন্তু ওদেরকে কোনো শাস্তি দিতে চাইলেন না,

শুধু বললেন যে ওরা অজ্ঞ। উনার এই আশ্চর্য রকমের ঠাণ্ডা প্রতিক্রিয়ার কথা মনে রাখার জন্য অনুরোধ করছি, পরে আরেকটি পর্বে এই বিষয়টির রেফারেন্স আবার আসবে ইনশাল্লাহ।
কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে মুসা আলাইহিওয়াসাল্লাম ওদেরকে অজ্ঞ কেন বলেছিলেন? উনি তো পাপী, অবাধ্য ইত্যাদি অনেককিছুই বলতে পারতেন। কারণটা হচ্ছে বনী ইসরাঈল এমন আবদার করেছিল কারণ ওদের কোনো জ্ঞান ছিল না যা ওদের স্রোতের বিপরীতে দৃঢ়পদ রাখতে সাহায্য করবে। ওরা সেটাই করতে চেয়েছিল যা ওরা আশেপাশের মানুষকে করতে দেখছিল। অন্যরা যা করছে সেটা ঠিক না ভুল সেটার হিসাব ছিল না। আপনার যদি জ্ঞান থাকে যে কোনটা ভুল আর কোনটা ঠিক, তবে পুরো পৃথিবীর মানুষ কোনো ভুল কাজে লিপ্ত থাকলেও তাদেরকে দেখে আপনি কনফিউজড হয়ে যাবেন না। এজন্যই স্কলাররা বলেন যে কারো যদি ইসলামের ব্যাপারে গভীর জ্ঞান এবং দৃঢ় ঈমান না থাকে তাহলে আপনার ননমুসলিম দেশে আসাই উচিৎ না, আপনি আপনার ঈমান হারিয়ে ফেলবেন। মাত্র কিছুদিন আমেরিকাতে অবস্থান করে তাদের এই কথার মর্ম আমি হারে হারে উপলব্ধি করেছি! এমন মানুষ দেখেছি যারা সৌদি আরবে থাকতে মুখ ঢেকে পর্দা করত, এখন আমেরিকাতে এসে জিন্সের
সাথে স্কার্ফ পড়ে। একটু ঝামেলা হলেই মানুষকে দেখছি রোযা বাদ দিয়ে দিচ্ছে, কারণ এখানে রোযা না রাখলে সামাজিকভাবে হেয় হবার ভয় নেই...অর্থ্যাৎ জ্ঞানের অভাবে তারা আশেপাশের পরিবেশ দ্বারা অন্ধভাবে প্রভাবিত হয়ে যাচ্ছে।
বনী ইসরাঈলদের এহেন আব্দারের পেছনে আমাদের জন্য আরেকটা বিশাল শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। কী সেটা?
সুদীর্ঘ সময়কাল অমুসলিমদের শাসনাধীনে থাকলে কিভাবে মুসলিমরা তাদের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলে সেটা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠা। মিশরে বহুঈশ্বরবাদীদের মাঝে থাকতে থাকতে শিরকের ব্যাপারে তারা এতটাই গা সওয়া হয়ে গেছে যে এটা তাদের কাছে কোনো ব্যাপারই মনে হচ্ছিলনা। একে অভিহিত করা হয় Desensitization of evil হিসেবে, অর্থ্যাৎ খারাপের ব্যাপারে কিংবা যা আল্লাহর দৃষ্টিতে ভয়ংকর পাপ সেগুলোর ব্যাপারে সংবেদনশীলতা কমে যাওয়া বা নষ্ট হয়ে যাওয়া।

আমাদের দেশে এখন এই ভয়ংকর ব্যাপারটা ঘটেছে হিন্দী সিরিয়ালের মাধ্যমে। এগুলো দিয়ে সব ধরণের পূজা অনুপ্রবেশ করেছে আমার বাড়ির ড্রয়িং রুমে। আজ আমরা এগুলো ভাবলেশহীনভাবে দেখছি, আমাদের বাচ্চারা এটা করবে, কারণ এটার মাঝে সমস্যাটা কী সেটাই তারা খুঁজে পাবে না।

তাই যারা হিন্দী সিরিয়াল নিয়মিত দেখেন, তাদের অনেককেই বলতে শুনবেন যে আমিতো আর গিয়ে পরকীয়া করতে যাচ্ছি না.....তারা বুঝতে অপারগ যে এভাবে এই পাপগুলোর ব্যাপারে আমাদের এক ধরণের সহনশীলতা সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। [2] আমাদের দেশের বহু আচার অনুষ্ঠানের উৎস হচ্ছে হিন্দুদের অধীনে বছরের পর বছর ধরে অবস্থান (উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যৌতুক প্রথা)

আরেকটা যে বিষয় আমরা এখান থেকে বুঝতে পারি যে দাওয়াতী কাজের ক্ষেত্রে সময় দিতে হয়। মুসা আলাইহিওয়াসাল্লাম বুঝতে পেরেছিলেন যে বনী ইসরাঈলরা শিরকের ব্যাপারে desensitized হয়ে গেছে, তাই উনি শুধু ওদের মূর্খ বলেছেন, আর কিছু বলেননি। অনুরূপ ঘটনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। মাত্র মক্কা বিজয়ের পরের ঘটনা এটা, কুরাইশরা তখনও শিরকি আচার আচরণে অভ্যস্ততা দূর করে উঠতে পারেনি।

আমরা আজ শিরকের ব্যাপারে ওদের মতই desensitized হয়ে গেছি, তাই মাজারেও যাই, আবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহও বলি। দুটো যে কী পরিমাণ সাংঘর্ষিক, সেটা টের পর্যন্ত পাই না। এজন্যই বলা হয় যে মক্কার কুরাইশরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছিল বলে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে গিয়েছিল। তাই সত্যিকার অর্থে আমাদের লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর বুঝ ওদের চেয়েও খারাপ.....কী Ironic, তাই না?

[1] দুঃখজনক হলেও সত্যি যে এমন ঘটনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেই ঘটেছিল। মক্কা বিজয়ের পরপরই হুনাইনের যুদ্ধে যাওয়ার সময় পথে ওরা অবিশ্বাসীদের একটা গাছ দেখল, যেটাকে তারা পূজা করত এবং ওটাতে ওদের অস্ত্রগুলো ঝুলিয়ে রাখত। ওটা পার হওয়ার সময় কিছু লোক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল যেন ওদেরও অনুরূপ একটা গাছ দেয়া হয়। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন তোমরা তো মুসার জাতির মত আবদার করলে যারা তাকে বলেছিল...(এই বলে উপরেল্লেখিত আয়াতটা বললেন.....) উৎস-তাফসীর ইবনে কাসীরের এই আয়াতের তাফসীর-
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1118&Itemid=62

[2] হিন্দী সিরিয়ালের দারুণ প্রভাবের ব্যাপারে বোধোদয় হওয়ার জন্য নিজের নিউজটা পড়া যেতে পারে
http://www.banglanews24.com/beta/fullnews/bn/309286.html

শিকড়ের সন্ধানে-৭

আমরা পড়ছিলাম বনী ইসরাঈল যখন জেরুজালেমের পথে যাত্রা করছে, সেই সময়ের কথা। তারা যখন এর কাছাকাছি পৌঁছালো তখন মুসা আলাইহিওয়াসাল্লাম বনী ইসরাঈলকে বললেন-

হে আমার সম্প্রদায়, পবিত্র ভুমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ তোমাদের জন্যে নির্ধারিত করে দিয়েছেন এবং পেছন দিকে প্রত্যাবর্তন করো না। অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।

এই জায়গাটায় এসে আমাদের খুব মনোযোগ দিয়ে একটা টার্ম খেয়াল করতে হবে-*পবিত্র ভূমি, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন...* এটা কোন জায়গার কথা বলা হচ্ছে? জেরুজালেম। কাদেরকে বলা হচ্ছে? বনী ইসরাঈলদেরকে। এমন কথা ওদের যেটা স্ক্রিপচার, তথা ওল্ড টেস্টামেন্টেও আছে। আমাদের কি মনে আছে যে এই কাহিনীগুলো যে আমরা পড়া শুরু করেছিলাম তার একটা কারণ ছিল যে বর্তমান ইসরাঈল-প্যালেস্টাইন কনফ্লিক্টের স্বরূপ আরো ভালো করে বোঝা? আমরা আরো বলেছিলাম যে ইসরাঈল রাষ্ট্রটা কতগুলো Myth এর প্রতিষ্ঠিত, এর মাঝে একটা হচ্ছে The jews people consider jerujalem as holy land and God has given them right to return there.

তাহলে আমরা স্পষ্টত দেখতে পাচ্ছি যে কুরআনই বলছে যে আল্লাহ আসলেই ওদের জন্য জেরুজালেমকে নির্ধারিত করে দিয়েছেন। তাহলে কি আজকে ইহুদীদের দাবী সত্যি?

এই প্রশ্নটা আমরা মাথায় রাখব এবং পরবর্তী পর্বগুলোতে এর উত্তর খুঁজবো ইনশাল্লাহ।
ফিরে আসছি আমাদের কাহিনীতে।

আমরা এর আগের একটি পর্বে হিক্সস জাতিদের কথা বলেছিলাম। এই হিক্সস জাতিরা খুব দুর্ধর্ষ ছিল, যারা সেই সময় প্যালেস্টাইন শাসন করছিল। কিন্তু উপরে উল্লেখিত আয়াতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আল্লাহ জেরুজালেম বনী ইসরাঈলদের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন। এখানে আরবী শব্দ যেটা ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে 'কাতাবা' যার মানে হচ্ছে 'আদেশ দেয়া'। এই বিষয়টি একটু বিশ্লেষণের দাবী রাখে। আমরা অনেকেই হয়ত জানি যে আল্লাহর ইচ্ছা হচ্ছে দুই ধরণের-[1]

ক) সৃষ্টিগত ইচ্ছা

খ) শরঈ ইচ্ছা

সৃষ্টিগত ইচ্ছা হচ্ছে এই মহাবিশ্বে যা কিছু ঘটছে কোনো কিছুই তার ইচ্ছার বাইরে ঘটছে না। এটা তাঁর ক্ষমতার সাথে সংশ্লিষ্ট। কোনো কিছু তাঁর ইচ্ছার বাইরে ঘটতে পারে না, অস্তিত্বই লাভ করতে পারে না। কিন্তু তার অর্থ এটা না যে যা ঘটছে তার সব কিছু তিনি পছন্দ করেন।
যা ঘটা তিনি পছন্দ করেন বা চান যে ঘটুক, সেটাকে বলে শরঈ ইচ্ছা। যেমন তিনি চান যে সব মানুষ ইসলাম পালন করুক। কিন্তু তিনি যা পছন্দ করেন তা সবসময় ঘটে না, যদি তার সৃষ্টিগত ইচ্ছার সাথে এটা সাংঘর্ষিক হয়। আমরা যখন বলি যে আল্লাহ না চাইলে তো গাছের পাতাও নড়ে না...তখন আমরা আল্লাহর সৃষ্টিগত ইচ্ছার কথা বলি।

তাহলে এখানে আল্লাহ্ যে বনী ইসরাঈলদের জেরুজালেমে প্রবেশের আদেশ দিলেন, সেটা কোন ইচ্ছা ছিল? আমরা কি আন্দাজ করতে পারছি?

হুম, এখানে আল্লাহর শরঈ ইচ্ছার কথা বলা হয়েছে। অর্থ্যাৎ আল্লাহ চান যে জেরুজালেম বনী ইসরাঈলদের নিয়ন্ত্রণে আসুক, কিন্তু সেটা শর্তসাপেক্ষ। বনী ইসরাঈল যদি শর্তগুলো পূরণ করে, তাহলেই তারা promised land এর অধিকার পাবে, অন্যথায় নয়।
এটা জানা স্বত্বেও বনী ইসরাঈলরা কি বলেছিল?

তারা বললঃ হে মূসা, সেখানে একটি প্রবল পরাক্রান্ত জাতি রয়েছে। আমরা কখনও সেখানে যাব না, যে পর্যন্ত না তারা সেখান থেকে বের হয়ে যায়। তারা যদি সেখান থেকে বের হয়ে যায় তবে নিশ্চিতই আমরা প্রবেশ করব। খোদাভীরুদের মধ্য থেকে দু'ব্যক্তি বলল, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছিলেনঃ তোমরা তাদের উপর আক্রমণ করে দরজায় প্রবেশ কর। অতঃপর তোমরা যখন তাতে প্রবেশ করবে, তখন তোমরাই জয়ী হবে। আর আল্লাহর উপর ভরসা কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। তারা বললঃ হে মূসা, আমরা জীবনেও কখনো সেখানে যাব না, যতক্ষণ তারা সেখানে থাকবে। অতএব, আপনি ও আপনার পালনকর্তাই যান এবং উভয়ে যুদ্ধ করে নিন। আমরা তো এখানেই বসলাম। (৫:২২-২৪)

ওদের উত্তরের মধ্যে দুটো বিষয় খুব শিক্ষণীয়-
১) কথা বলার আদব- তুমি এবং তোমার রব গিয়ে যুদ্ধ করো....কি স্পর্ধাপূর্ণ কথা, আমরা কি টের পাচ্ছি? রব কি মুসা আলাইহিওয়াসাল্লামের একার, নাকি এভাবে কথা বলাটা শোভন যে আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলীয়দের জন্য যুদ্ধ করবেন.....

২) ভাগ্যের ধারণাটা ক্লিয়ার থাকা। আল্লাহ আমাদের জন্য অনেক কিছুই লিখে রেখেছেন, কিন্তু সেটা পাওয়ার জন্য কিছু শর্তও নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যা পূরণ না করা পর্যন্ত ওই সুনির্দিষ্ট বিষয়টি আমরা পাবো না.....
আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমরা বুঝি যে এখন, বর্তমানে আমরা একদম হুবহু এই পরিস্থিতির মাঝে আছি.....বনী ইসরাঈলদের যে সময়ের কথা এখানে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ আমাদের ওয়াদা করেছেন যে তিনি মুসলিমদের বিজয়ী করবেন, কিন্তু সেই বিজয় অর্জনের জন্য যে শর্তগুলো পূরণ করা দরকার আমরা সেটার ধারে কাছেও নেই। আমাদের ভাবও ঠিক এই বনী ইসরাঈলদের মতই, আমরা চাই কেউ রেডিমেড আমাদের জন্য বিজয় ছিনিয়ে আনুক, আমরা পপকর্ণ খেতে খেতে সেই বিজয় উপভোগ করবো, প্রয়োজনে আনন্দ মিছিল করবো.....যে মানুষটা আজকে প্যালেস্টাইনের জন্য হাহাকার করছে, ঠিক তাকেই সুদী ব্যাংকের সাথে লেনদেন/ চাকরি ছাড়তে বললে আমরা (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই) তাকে আর খুঁজে পাবো না।

একটা কথা আমি খুব দৃঢ়, খুব দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি- আমাদের মুসলিম যে ভাই বোনেরা এখন গাজাতে, সিরিয়াতে, আফগানিস্তানে বা ইরাকে মানবেতর জীবন যাপনের মাঝেও নিয়মিত নামায আদায় করছে তাঁরা কিয়ামতের দিন সাক্ষী হবে আমাদের বিরুদ্ধে.....আমরা যারা সব ধরণের সুযোগ সুবিধা থাকা স্বত্ত্বেও স্রেফ আলসেমী করে নামায পড়ি না বা ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করি না.....তাদের বিরুদ্ধে। আমাদের যেসব ভাইবোনেরা আজ চীনে রোজা রাখতে পারছে না, তাঁরা সাক্ষী হবে তাদের বিরুদ্ধে যারা স্রেফ সেহরীতে উঠতে পারি নাই বা সামনে পরীক্ষা বলে রামাদ্বানের রোযা মিস দিচ্ছে। আমি এই ব্যাপারটা নিয়ে খুব ভয় পাই, খুব! চিন্তা করলেই আমার বুক কেঁপে ওঠে। আল্লাহ্ আমাদের বুঝ দিন, খুব দেরী হয়ে যাওয়ার আগেই, আমীন.....

বনী ইসরাঈল এহেন উত্তর দেয়ার পর আল্লাহ্ চল্লিশ বছরের জন্য (৫:২৬) জেরুজালেমে প্রবেশ তাদের জন্য নিষিদ্ধ করে দিলেন এবং বললেন যে এই সময়টা ওরা মরুভূমিতে উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াবে, কোনো দিশা পাবে না.....

[1] বিস্তারিত জানতে পড়তে পারেন http://on.fb.me/1jxmlhq

শিকড়ের সন্ধানে-৮

ইনশাল্লাহ আজকের পর্ব থেকে আমরা জানা শুরু করব সেইসব ঘটনাপ্রবাহ যা কী না ঘটেছিল এই ৪০ বছরে, যে সময়টা বনী ইসরাঈলকে মরুভূমিতে নির্বাসিত করা হয়েছিল।

এখানে প্রসংগক্রমে একটা কথা বলে নেয়া ভালো যে আমাদের মনে হতে পারে যে বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ্ কেন ক্ষমা করে দিলেন না তথা যুদ্ধ ছাড়াই জেরুজালেমে প্রবেশের সুযোগ করে দিলেন না যেমনটা ওরা চেয়েছিল, আল্লাহ্ তো চাইলে সবই পারেন। এই ৪০ বছরের ঘটনাবলী থেকে কারণটা আমাদের সামনে দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

জেরুজালেমের নিয়ন্ত্রণ বনী ইসরাঈলকে দেয়ার অর্থ হল তারা এটার অধিপতি হবে। অর্থ্যাৎ তারা আল্লাহর chosen people হিসেবে আল্লাহ যাকে পবিত্র ভূমি হিসেবে অভিহিত করেছেন সেখানে আল্লাহর অন্য বান্দাদের শাসন করবে। এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সামনে বনী ইসরাঈলের যে স্বভাব উন্মোচিত হল তাতে কি আপনার মনে হয় যে They deserve this kingship?

যদি যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও তাদের এই ক্ষমতা দেয়া হত, তবে তা আল্লাহর justice এর সাথে সাংঘর্ষিক হত।

এই ব্যাপারটা আমাদের মন এবং মগজে ভালো করে ঢুকিয়ে ফেলা উচিত-----আল্লাহ তাঁর দ্বীনের ধ্বজাধারকদের ততদিন পর্যন্ত ক্ষমতা দেন না বা তাদেরকে আসমানী সাহায্য পাঠান না যতদিন না তারা সেটা deserve করে। আমরা মুসলিমরা এখনো ক্ষমতা deserve করি না, তাই এটা আমাদের দেয়া হচ্ছে না। আমি যখন আমাদের আশেপাশের মুসলিমদেরকে দেখি পিতা হিসেবে, স্বামী হিসেবে, অফিসের বস হিসেবে----------তখন তারা ক্ষমতার যে অপব্যবহার করে তখন আমার বুক চিঁড়ে একটা কথাই শুধু বেরিয়ে আসে------আমরা নিজেদের মধ্যে, এত ছোট্ট পরিসরেই ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারি না, আমাদের শাসনাধীনে অন্যরা আসলে তো আমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াবো নিশ্চিত.....একটা কথা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ –যাদের কাছে শেষ আসমানী কিতাব আছে, তাদের ক্ষমতা পাওয়ার শর্ত আর অন্যদেরটা এক না। কারণ নন-মুসলিমরা যখন অনাচার করে, তখন সেটা আল্লাহর দ্বীনকে কলুষিত করে না, কিন্তু মুসলিমরা যখন দুরাচার করে তখন আল্লাহর দ্বীনের বদনাম হয়, যেটা আল্লাহ্ পছন্দ করেন না।যতদিন না মুসলিমদের আচার ব্যবহার এমন হবে যে শুধু তাদেরকে দেখেই মানুষ ইসলামের সৌন্দর্য অনুধাবন করবে, ততদিন ইসলামের বিজয় আসবে না.....আসতে পারে না.....

ফিরে আসছি কাহিনীতে। আল্লাহ্ বলে দিলেন যে বনী ইসরাঈলরা মরুভূমিতে উদ্ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াবে। মরুভূমিতে এভাবে জীবন যাপন নিশঃসন্দেহে প্রচণ্ড কষ্টের, এক কোথায় অসম্ভবও বটে। তখন আল্লাহ, রাহ্মানুর রাহীম, এমন ঔদ্ধত্ব প্রদর্শনের পরও বনী ইসরাঈলদের তার রহমতের ছায়ার আশ্রয় দিলেন।

আমরা কুরআন থেকে জানতে পারি যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য মূলত তিনটি নিয়ামত আসল-

১) মরুভূমির তপ্ত রোদ থেকে ছায়াদান

২) বেহেশতী খাবার

৩) পানি

আল্লাহ্ বলছেন-

আর আমি তোমাদের উপর ছায়া দান করেছি মেঘমালার দ্বারা এবং তোমাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছি 'মান্না' ও সালওয়া'। (২:৫৭)

আর মূসা যখন নিজ জাতির জন্য পানি চাইল, তখন আমি বললাম, স্বীয় যষ্ঠির দ্বারা আঘাত কর পাথরের উপরে। অতঃপর তা থেকে প্রবাহিত হয়ে এল বারটি প্রস্রবণ। তাদের সব গোত্রই চিনে নিল নিজ নিজ ঘাট। (২:৬০)

মান্না ও সালওয়া আসলে কী ছিল সেই ব্যাখ্যায় আমরা যাবো না, শুধু এটা জানাটাই যথেষ্ট হবে যে এগুলো সরাসরি বেহেশত থেকে আগত খাবার ছিল। আর একটা মজার প্রশ্ন মাথায় আসতে পারে যে পানির ঝর্ণা ১২টা কেন দরকার ছিল..... একটাই তো যথেষ্ট হওয়া উচিৎ ছিল। তাফসীরকারকরা একটা মজার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাদের মতে যে নাহলে বনী ইসরাঈলদের ১২ টা গোত্র নিজেদের মধ্যে পানি নিয়ে মারামারি লাগিয়ে দিত[1]। বনী ইসরাঈলের ১২ টা গোত্রের ব্যাপারে জেনে রাখাটা জরুরি। এই ১ ২টা গোত্র ছিল ইয়াকূব আলাইহি ওয়াসাল্লামের ১২ জন ছেলের থেকে উদ্ভূত। [2]

অর্থ্যাৎ আমরা দেখতে পেলাম যে মরুভূমিতে খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্য যা যা দরকার তার সবই আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলকে দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মাঝেই বনী ইসরাঈল এই খাবারে bored হয়ে উঠল। I repeat, তারা bored হয়ে উঠল, কিসে? জান্নাতী খাবারে। তারা মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আবদার জানালো। কী? কুরআন থেকেই শোনা যাক-

আর তোমরা যখন বললে, হে মূসা, আমরা একই ধরনের খাদ্য-দ্রব্যে কখনও ধৈর্য্যধারণ করব না। কাজেই তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট আমাদের পক্ষে প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের জন্যে এমন বস্তুসামগ্রী দান করেন যা জমিতে উৎপন্ন হয়, তরকারী, কাকড়ী, গম, মসুরি, পেঁয়াজ প্রভৃতি। মূসা (আঃ) বললেন, তোমরা কি এমন বস্তু নিতে চাও যা নিকৃষ্ট সে বস্তুর পরিবর্তে যা উত্তম? (২:৬১)

আমরা কি খেয়াল করেছি যে ওরা কোন খাবার খেতে চাচ্ছিল? যে খাবার খেয়ে ওরা এতদিন অভ্যস্ত! অর্থ্যাৎ মিশরের খাবার!

এখন আমরা নিজেদের একটা প্রশ্ন করি, মাত্র জেল থেকে ফেরত এসে কেউ যদি আমাদেরকে বলে আমি জেলের খাবার দারুণ মিস করছি, তাহলে আমরা কী বুঝবো? আমরা কি ভাববো না যে সে জেলের জীবনটাকেই মিস করছে?

তাহলে বনী ইসরাঈলদের ব্যাপারে কি বলা যায়? ওরা ওদের মিশরের জীবন যা কী না ছিল দাসত্বের, লাঞ্চনার সেটাই মিস করছে? সেখানেই ফিরে যেতে চাইছে?

এই প্রশ্নটা আমাদের নিজেদের প্রত্যেককে করা উচিৎ। এই যে আমরা মুসলিমরা সারা পৃথিবী জুড়ে লাঞ্চিত, অপমানিত হচ্ছি, আমাদের রক্ত হয়ে গেছে এখন সবচেয়ে সস্তা, এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য আমরা কী ত্যাগ করতে রাজি আছি? বনী ইসরাঈলরা তাদের খাদ্যাভাসটুকু বদলাতে রাজি ছিল না.....আমাদের অবস্থা কি এর চেয়ে কিছু উন্নত? আমার যেসব ভাই/ বোনরা জিহাদে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব তাদের আন্তরিক ইচ্ছার প্রতি পূর্ণ সমর্থন রেখে বলছি আমরা কি পারছি ইসলামের জন্য আমাদের জীবন যাত্রার ধরণ বদলাতে? এজন্য নিচের কথাটা আমার খুব ভালো লাগে-

Many Muslims are ready to adopt Islamic teachings, so long their lifestyles remain untouched and unaltered - are you one of them?

Has **"lifestyle"** become an unnoticed **god** for you?? Please think about it carefully!

খুব অল্প খেয়ে, অল্প পরে এবং Most importantly সর্বাবস্থায় তাল মিলিয়ে চলার ক্ষমতা যদি আমরা অর্জন না করতে পারি তাহলে আমাদের দশাও এই বনী ইসরাঈলদের মত হবে যাদের কাছে লাথি গুথার জীবন বেশী আকর্ষণীয় কারণ সেই জীবনে ওদের পছন্দ মত খাবার দাবার আছে!

আবার ফিরে আসছি কাহিনীতে। এভাবেই মরুভূমিতে চলছিল বনী ইসরাঈলদের দিনকাল। ওদের জৈবিক প্রয়োজন সবই মেটানো হয়েছিল। এখন দরকার ছিল ওদের আধ্যাত্মিকভাবে পরিশুদ্ধ করার। তাই আল্লাহ্ ঠিক করলেন মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর তাওরাত নাযিল করবেন যাতে ওদেরকে পথ নির্দেশনা দেয়া হবে।
মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ ডাকলেন তুর পাহাড়ের উপত্যকায়। মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সাথে কথা বলতে গেলেন। এই সময়ে হারুণ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বনী ইসরাঈলদের দায়িত্ব দিয়ে গেলেন.....

[1] ঠিক আমাদের, মুসলিমদের মত!

[2] এই তথ্যটা পরে আমাদের অনেক কাজে লাগবে

শিকড়ের সন্ধানে-৯

মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আল্লাহর মাঝে কথোপকথনঃ

আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলার প্রস্তুতি [1] হিসেবে আল্লাহ মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ত্রিশ দিন রোযা রাখার। এত দিন টানা রোযা রাখার ফলে স্বাভাবিকভাবেই মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে একটা গন্ধ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। তাই মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আগে মিসওয়াক দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে গেলেন। তিনি চেয়েছিলেন এমন গন্ধ নিয়ে আল্লাহর সামনে হাজির না হতে। কিন্তু আল্লাহ্ বরং এই ব্যাপারটি অপছন্দ করলেন। তিনি জানালেন যে রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে খুবই পছন্দনীয়। তাই তিনি মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরো দশ দিন রোযা রাখার নির্দেশ দিলেন। এভাবে চল্লিশ দিন পূর্ণ হল। (৭:১৪২)

প্রতিশ্রুত সময়ে আল্লাহর সাথে কথোপকথনের প্রাক্কালে মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছে বলা যায় একটা আবদার করলেন। তিনি আল্লাহকে নিজ চোখে দেখতে চাইলেন। আল্লাহ্ জানালেন যে এটা অসম্ভব। মানুষের পক্ষে এই দুনিয়ায় চোখ দিয়ে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়। তিনি মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন সামনের পাহাড়ের দিকে তাকাতে। যদি সেটা স্বস্থানে স্থির থাকে, তবেই আল্লাহকে উনি দেখতে পাবেন। এরপর আল্লাহ্ ওই পাহাড়ের উপর নিজের জ্যোতির বিকিরণ ঘটালেন। পাহাড়টি ওখানেই চোখের নিমিষে ধূলিস্ম্যাত হয়ে গেল.....মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। জ্ঞান ফেরার পর উনি প্রথমেই আল্লাহর প্রশংসা করে বলে উঠলেন-

হে প্রভু! তোমার সত্তা পবিত্র, তোমার দরবারে আমি তওবা করছি এবং আমিই সর্বপ্রথম বিশ্বাস স্থাপন করছি। (৭:১৪৩) [2]

এরপর এখানেই আল্লাহ্ মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর তাওরাত নাযিল করেন। এগুলো লেখা ছিল কতগুলো ফলকের উপর। (৭:১৪৫) এখানে উল্লেখিত নির্দেশনার মাঝে ছিল বিখ্যাত Ten commandments, আমরা অনেকেই হয়ত এটার কথা শুনে থাকব।

এটাতো গেল মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আল্লাহর সান্নিধ্যে ছিলেন সেটার দৃশ্যপট। এই সময়টাতে বনী ইসরাঈল যখন তার নেতৃত্বাধীন ছিল না, তখন তারা কি করছিল?

বনী ইসরাঈলীয়দের শিরকে লিপ্ত হওয়াঃ

মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনী ইসরাঈলকে বলে এসেছিলেন যে উনি ত্রিশ দিনের জন্য যাচ্ছেন, আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য। এই নির্ধারিত সময়কাল যে বেড়ে চল্লিশ দিন হয়েছে তা তাদের জানা ছিল না।
বনী ইসরাঈলদের মাঝে সামেরী নামে এক লোক ছিল যে মিশরে থাকাকালীন সময়ে যাদুবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিল, জ্বীনদের সাথে তার বিশেষ সখ্যতা ছিল। আল্লাহ্ যখন জিবরাইল আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে সাগর দ্বিখণ্ডিত করে দেন বনী ইসরাঈলদের জন্য, তখন সামেরী সেই মাটির কিছু অংশ সংগ্রহ করে রেখেছিল।

এদিকে মিশরীয়দের অনেকেই বনী ইসরাঈলের লোকদের কাছে তাদের স্বর্ণালংকার গচ্ছিত রাখত। ওদের সবার সলিল সমাধি হওয়ার পর বনী ইসরাঈলরা অন্যের সম্পদ এভাবে নিজের কাছে রাখার জন্য খুব অনুতপ্ত বোধ করত। তীব্র অনুশোচনাবোধ থেকেই ওরা সব সোনাগুলো পুড়িয়ে ফেলল। সামেরী সেই গলিত স্বর্ণ একসাথে করে একটা বাছুর বানালো। তারপর তার পূর্ব জ্ঞান কাজে লাগিয়ে জ্বীনদের সাহায্য নিল, ফলে ওই বাছুরটা আওয়াজ করতে থাকল যেন তা জীবন্ত। সে বনী ইসরাঈলদের আহবান করল এটার উপাসনা করতে, কারণ এটাই ওদের ইলাহ।

প্রথমে বনী ইসরাঈলরা ব্যাপারটাতে সহজে সাড়া দেয়নি। কিন্তু সামেরী তাদেরকে এই বলে সন্তুষ্ট করালো যে নিশ্চয়ই মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আল্লাহকে খুঁজে পাচ্ছে না, তাই তাঁর দেরী হচ্ছে (নাঊজুবিল্লাহ), অথচ তাঁর ইলাহ তো আসলে এখানেই, এই বাছুরটাই! বনী ইসরাঈলদের একাংশ তখন এই বাছুর পূজায় লিপ্ত হল। (২:৫১, ২০:৮৭-৮৮, ৭:১৪৮)

হারুন আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই তাদেরকে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু ওরা তার কথা গণ্য করেনি। বরং তারা তাকে হত্যার হুমকি দিয়েছিল এবং জিদ ধরে বসেছিল যে মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে না আসা পর্যন্ত তারা এই কাজ থেকে বিরত হবে না। (২০:৯১)

তূর পাহাড়ের উপত্যকায় অবস্থানকালেই আল্লাহ্ মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁর সম্প্রদায় বাছুর পূজার মাধ্যমে আবারো পথভ্রষ্ট হয়েছে।

নিজের লোকেদের মাঝে মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে আসলেন ক্রুদ্ধ ও অনুতপ্ত অবস্থায়। যদিও তিনি আগে থেকেই ব্যাপারটা আল্লাহর কাছ থেকে ওহীর মাধ্যমে জেনেছিলেন, কিন্তু স্বচক্ষে ব্যাপারটা দেখে তিনি আর নিজের রাগ সংবরণ করতে পারলেন না। তীব্র ক্ষোভে তিনি হাত থেকে তাওরাতের তখতীগুলো ফেলে দিলেন.....

প্রথমেই তিনি বনী ইসরাঈলের লোকজনদের তিরষ্কার করতে লাগলেন। তারপর তিনি রাগ প্রকাশ করলেন তাঁর ভাই এর প্রতি, এটা ভেবে যে তিনি হয়ত বনী ইসরাঈলদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে সতর্ক করেননি। তখন হারুন আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা দারুণ কথা বলেন-

হে আমার মায়ের পুত্র, লোকগুলো যে আমাকে দুর্বল মনে করল এবং আমাকে যে মেরে ফেলার উপক্রম করেছিল। সুতরাং আমার উপর আর শত্রুদের হাসিও না। আর আমাকে জালিমদের সারিতে গণ্য করো না। (৭:১৫০)

অর্থ্যাৎ মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হারুন আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রকাশ্যে তিরষ্কার করছিলেন, তখন প্রকারান্তরে তাঁদের শত্রুদেরই জয় হচ্ছিল, কারণ ওদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে ওনাদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করা।

এই জায়গাটাতে আমাদের মুসলিমদের, আমাদের স্কলারদের জন্য একটা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ শিক্ষা বিদ্যমান। আমাদের নিজেদের মাঝে যদি কোনো ব্যাপারে মতানৈক্য থাকে, তাহলে আমাদের উচিৎ সেটা নিজেদের মাঝেই মিটিয়ে ফেলা, প্রকাশ্যে বাক বিতণ্ডা না করে.....

মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হারুন আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানালেন যে তিনি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিলেন[3], কিন্তু তিনি বনী ইসরাঈলদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করতে চান নি দেখে মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য অপেক্ষা করাটাই সমীচীন মনে করেছেন। মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাপারটা বুঝলেন এবং তাঁর নিজের ও হারুন আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন (৭:১৫১)

মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবার শেষে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন সামেরীকে। তিনি সামেরীর কাছে ঘটনার ব্যাখ্যা দাবী করলেন। সামেরী ভাবলেশহীন ভাবে জানালো যে সে যা দেখেছে অন্যরা তা দেখেনি, আর তার অন্তর তাকে এই মন্ত্রণাই দিয়েছে...

মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামেরীকে নির্বাসিত করলেন আর জানালেন যে ওর শাস্তি হবে এটা যে ও মানুষকে শুধু বলতে থাকবে যে 'আমাকে স্পর্শ করো না' অর্থ্যাৎ ও এক কঠিন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হবে এবং ওর মৃত্যু হবে শোচনীয় এবং একাকী..... (২০:৯৭)

[1] এজন্য মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ক্বালামুল্লাহ বলা হয়।

[2] এই ঘটনাটার মাঝে আমাদের আক্বীদার কিছু মূলনীতি নিহিত আছে। মানুষের পক্ষে এই দুনিয়াতে চর্মচক্ষু দিয়ে আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়, এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও মিরাজের সময় আল্লাহকে চোখে দেখেননি এটা আমাদের বিশ্বাস। তবে পরকালে আল্লাহর মুমিন বান্দারা সরাসরি তাঁকে দেখতে পাবে। বিশ্বাসীদের জন্য এটাই হবে সবচেয়ে বড় পুরষ্কার, কারণ দুনিয়াতে তাঁরা আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলেছিল তাঁকে না দেখেই।

[3] অথচ ইহুদী ধর্মগ্রন্থে আছে যে হারুন আলাইহি ওয়াসাল্লামও এই কাজে লিপ্ত হয়েছিল, আস্তাগফিরুল্লাহ। আমাদের জানা উচিৎ যে ওদের ধর্মগ্রন্থ এভাবে নবীদের নামে অসংখ্য অপবাদ দিয়েছে। এটার ফলে তাদের জন্য অনেক পাপ করা সহজ হয়ে গিয়েছে কারণ নবীরা নিজেই এমন করেছেন!

শিকড়ের সন্ধানে-১০

মুসা আলাইহিওয়াসাল্লাম উপাসনা করা বাছুরটাকে একদম আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন যাতে এটার প্রতি বনী ইসরাঈলদের অন্তরে কোনো সমবেদনা বা ইতিবাচক অনুভূতি না থাকে।
এই বাছুর উপাসনার ঘটনার পর আল্লাহ্ জানালেন যে এটার শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড (২:৫৪)। যারাই এই পাপের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল তাদেরকে হত্যা করা হবে। এক্ষেত্রে বিশেষ নির্দেশনা ছিল যেন নিজের পরিবারের সদস্যরাই অভিযুক্ত সদস্যকে হত্যা করে। অর্থ্যাৎ ভাই ভাইকে, ছেলে বাবাকে, বাবা ছেলেকে ইত্যাদি।[1]

এই নির্দেশ নিয়ে চিন্তা করলে আমরা বুঝব এটার মাঝে একটা প্রজ্ঞা আছে। এর ফলে বিচার কার্যে পক্ষপাতিত্বের কোনো অবকাশ থাকে না এবং পরিবারের প্রতি ভালোবাসার উপরে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসাকে প্রাধান্য দেয়া হয়।

তাফসীর ইবনে কাসীরে আছে যে এইসময় ওদেরকে একটা ঘন মেঘ আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, যাতে হত্যা করার সময় কেউ কাউকে দেখতে না পায়। এভাবে এই ঘটনায় ৭০ হাজার বনী ইসরাঈলকে হত্যা করা হয়েছিল।
বনী ইসরাঈলদের এই বাছুর উপাসনার ঘটনাটা বিশ্লেষণ করলে আমরা অনেকগুলো শিক্ষা পাই। আজকের পর্বে আমরা এগুলোর দিকে আলোকপাত করব ইনশাল্লাহ।

প্রথমত, এত কিছু থাকতে সামেরী একটা বাছুর কেন বানালো? অন্য কিছু না কেন? একটা ঘোড়া বা হাতির মূর্তিও তো সে বানাতে পারত, তাই না? উত্তরটা সহজ.....যে মিশর থেকে তারা এসেছে, সেখানকার পৌত্তলিকরা গরুর পূজায় লিপ্ত থাকত, এটা দেখে দেখেই তারা অভ্যস্ত ছিল এবং এটার ব্যাপারে ওরা সংবেদনশীলতা হারিয়ে ফেলেছিল, যেটা আগেও প্রকাশিত হয়েছে ওদের মূর্তিপূজা করতে চাওয়ার ইচ্ছা থেকে। এই ঘটনার মাধ্যমে আবারো পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হয়েছে যে মূর্তিপূজার ব্যাপারটা ওদের কতটা মজ্জাগত হয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, যদিও মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নবী হিসেবে ওদের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন, ওরা চোখের সামনে একটার পর একটা আল্লাহর নিদর্শন দেখছিল, তবু সুদীর্ঘ দিন পৌত্তলিকদের শাসনাধীনে থাকার কারণে ওরা প্রকৃত ইসলামের স্বরূপই ভুলে গিয়েছিল। আমরা যদি মূর্তিপূজা ব্যাপারটার নির্যাস নিয়ে চিন্তা করব তাহলে বুঝবো যে এটা আসলে আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির পর্যায়ে নামিয়ে আনে। তারা মনে করে আল্লাহ্ দেখতে তাঁর কোনো না কোনো সৃষ্টির মত, আল্লাহরও

ক্ষুধা-তৃষ্ণার বোধ আছে ইত্যাদি (নাঊযুবিল্লাহ)। আর একারণেই ওরা আল্লাহ্ এবং তার রাসূলের ব্যাপারে এমনভাবে শব্দ চয়ন করত যা আদতে অত্যন্ত ধৃষ্টতাপূর্ণ। আমাদের মনে আছে আশা করি যে হিক্সস জাতিদের দেখে ওরা বলেছিল যাও তুমি এবং তোমার আল্লাহ্ যুদ্ধ করে আসো। এখানেও আমরা দেখছি যে ওরা বলেছে মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মনে হয় আল্লাহকে খুঁজে পাচ্ছে না ইত্যাদি। এভাবে কথা বলার অন্তর্নিহিত কারণ আসলে ছিল ওরা আল্লাহকে চিনতো না। তাই আমাদের বোঝা উচিৎ যে তাওহীদটা আসলে কী, তাওহীদ তথা একত্ববাদ আসলে আল্লাহর সম্পর্কে সম্পূর্ণ, বিস্তারিত এবং শুদ্ধ ধারণা.....
যারা জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে শিরকে লিপ্ত (হোক সে মুসলিম বা অমুসলিম) তারা আসলে আল্লাহকে ঠিকভাবে চেনে না বলেই এমন করে। তাই এক্ষেত্রে প্রচুর ধৈর্য্য লাগে তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য। না হলে তারা এমন কাজের পুনরাবৃত্তি করতেই থাকবে যা আল্লাহর দৃষ্টিতে অত্যন্ত গর্হিত যেমনটা আমরা দেখছি বনী ইসরাঈলের ক্ষেত্রে।

তৃতীয়ত, সামেরী বাছুর বানানোর জন্য অলংকারগুলো কোথায় পেয়েছিল? ফিরাউনের লোকেরা যে স্বর্ণ গচ্ছিত রেখেছিল সেগুলো সাথে রাখতে বনী ইসরাঈলরা অস্বস্তি বোধ করছিল।

আমরা এই জায়গাটা নিয়ে আর একবার একটু চিন্তা করি.....অন্যের সম্পদ নিজেদের কাছে রাখতে যাদের পাপবোধ হচ্ছিল, সেই তারাই শিরক করতে দ্বিধা করেনি! [2] কী অদ্ভূত এই পাপবোধ, তাই না?

এটা থেকে আমরা শয়তানের একটা চক্রান্ত টের পাই। শয়তান আমাদের সমসময় পাপের ভয়াবহতাগুলোর ব্যাপারে বিভ্রান্ত করে। এই যে অগ্রাধিকার ঠিক করতে ভুল করা, এটা আমাদের খুব কমন একটা সমস্যা। আপনি দেখবেন যে আমরা মুসলিমরাও প্রায়োরিটি সেট করতে পারি না। ছোট ছোট পাপের ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি করি, বড় অনেক গুনাহের ব্যাপারে কোনো খবর নেই! এই গেল রামাদ্বানেও আমার এখানে ইসলামিক সেন্টারে তারাবীহর নামায আট রাকাত পড়ায় দেখে এক দল মুসল্লী রাগারাগী করে স্টুডেন্ট মসজিদে চলে এসেছেন..... আমরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি করি, নফল ইবাদাত কয় রাকাত পড়ব সেটা নিয়ে...আমরাও যে ওদের মত একই পথে হেঁটে চলেছি, সন্দেহ আছে, কোনো?

চতুর্থত, আমাদের কাছে মনে হতে পারে যে নিজের পরিবার দ্বারা হত্যা করার এই শাস্তিটা হয়তো খুব নিষ্ঠুর হয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের ব্রেন থেকে যা উদ্ভূত হয়, তা সবসময় আল্লাহর প্রজ্ঞার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নাও হতে পারে। [3] আমাদের বুঝতে হবে যে আল্লাহ্ তাওরাত নাযিলের

মাধ্যমে বনী ইসরাঈলয়দের দ্বারা জেরুজালেমে একটি ইসলামিক রাষ্ট্র গঠন করতে চেয়েছেন যাতে আইন কানুন থাকবে...এটা ছিল তারই একটা অংশ।

পঞ্চমত, বনী ইসরাঈল কিন্তু এর আগেও একবার মূর্তিপূজা করতে চেয়েছে। তখন আমরা দেখেছি যে মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে কোনো শাস্তি দেন নাই, শুধু 'অজ্ঞ' বলে তিরষ্কার করেছিলেন। কিন্তু এবার কেন এমন কঠোর শাস্তি দেয়া হল?
উত্তরটা হচ্ছে সময়।

মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝতে পেরেছিলেন যে মাত্র মিশর থেকে এসেছে বলে বনী ইসরাঈল এমন করেছিল.....তাই তিনি তাদেরকে সময় দিয়েছিলেন। এই সময় দেয়াটা দাওয়াতী কাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি। কিন্তু এবার ওদের কাজ সীমালঙ্গন করে গিয়েছিল...একেতো এবার তারা সরাসরি শিরকে লিপ্ত হয়ে গিয়েছে, তার উপর যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে, তারা আল্লাহর আরো অনেক নিয়ামত ভোগ করেছে, এতদিনে তাদের শিরকের ভয়াবহতা সম্পর্কে অবহিত হয়ে যাওয়ার কথা।

ষষ্ঠত, বনী ইসরাঈলদের সবাই কিন্তু মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয় নাই। অনেকেই ছিল যারা সরাসরি কাজটা করে নাই, কিন্তু অন্যদের প্রত্যক্ষভাবে বাঁধা না দিয়ে একধরণের নীরব সমর্থন দিয়ে গেছে। সেজন্য আমরা দেখেছি যে যখন তাদের শাস্তি দেয়া হয়েছে তখন এটা বাছ বিচার করা হয়নি যে কারা প্রত্যক্ষভাবে করেছে আর কারা পরোক্ষভাবে..... এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে শিরক এমন একটা অপরাধ যেটা থেকে আমরা যদি আমাদের আশেপাশের মানুষগুলোকে যথাযথভাবে সতর্ক না করি, তাহলে আমরাও সমানভাবে অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত হব আল্লাহর দৃষ্টিতে।

তাই আজকের পরে আমাদের নিজেকে প্রশ্ন করা উচিৎ কাউকে যদি মাজারে যেতে দেখি কিংবা দেখি তাবিজ পরে ঘুরে বেড়াতে আমরা কি সেটা দেখেও না দেখে এড়িয়ে যাবো নাকি দ্ব্যর্থহীণ ভাষায় তাদেরকে সুন্দর করে বোঝাবো কেন এটা ভুল?

সপ্তমত, আমরা খেয়াল করলে দেখব যে মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমেই এসে সামেরীকে তিরষ্কার করেননি। একটু বিস্ময়কর, তাই না? সামেরীই যখন ওদেরকে এভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে তবে তাকে না করে কেন বনী ইসরাঈলের প্রতি আগে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন?

তাঁর এই আচরণ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে শিরক এমন একটা পাপ যেটা যে গর্হিত সেটা বুঝতে আল্লাহ্ আমাদেরকে যে স্বাভাবিক বিচার বুদ্ধি দিয়েছেন সেটাই যথেষ্ট। কেউ আমাদের উদ্বুদ্ধ করলেও প্রাথমিক দায় দায়িত্ব আমাদের উপরেই বর্তায়।

বনী ইসরাঈলদের ভৎর্সনা করার পর তিনি হারুন আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়েছেন। অর্থ্যাৎ যারা আমাদের পাপে লিপ্ত করছে, তাদের তিরস্কার করার আগে উনি গিয়েছেন ধর্মীয় জ্ঞান বিজ্ঞ মানুষের কাছে, কেন তিনি সতর্ক করেননি এটার জবাবদিহি নিতে। এখানে যারা ইসলামের জ্ঞান অর্জন করেন এবং তা পালন করার চেষ্টা করেন তাদের দায়িত্বটা কত বেশী সেটা আবারো বোঝা যায়।

আর সবার শেষে সামেরীর সাথে কথা বলা থেকে বোঝা যায় যে আসলে যারা আমাদের পথভ্রষ্ট করে, তাদের দোষ দিয়ে আমরা নিজেরা পার পাবো না। [4]

এমন ঘটনা আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লামের সময়ও দেখি.....আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে যখন অপবাদ দেয়া হল তখন আল্লাহ্ তাদেরকে তিরষ্কার করেছিলেন যারা না জেনে রটনা রটিয়েছিল, এমন কি যারা চুপ থেকেছিল, প্রতিবাদ করেনি তাদেরকেও। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লামও কিন্তু আব্দুল্লাহ বিন উবাই, মুনাফিক্বদের সর্দার, সে এটার সূচনা করেছিল তাকে হত্যা করেননি। এটা থেকে আমরা আবার বুঝি যে The blame is on the people who listened to the misguided.

আর আগেও উল্লেখ করেছি, আবারো বলছি যে হারুন আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা (৭:১৫০) থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে আমাদের নিজেদের মাঝে প্রকাশ্যে বাক বিতণ্ডা করা উচিৎ না, এতে ইসলামের শত্রুদের কাজ সহজ করে দেয়া হয়।

[1] এজন্য বদরের যুদ্ধের বন্দীদের নিয়ে যখন কী করা হবে এটা নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিধাতে ভুগছিলেন এবং উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শ চাইলেন, তখন তিনি এই ঘটনার রেফারেন্স টেনে বলেছিলেন ভাইকে দিয়ে ভাইকে, বাবাকে দিয়ে ছেলেকে অর্থ্যাৎ আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে দিয়ে আক্বীলকে, আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে আব্দুর রহমানকে এভাবে (এরা তখনও ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং মুশরিকদের হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে নিয়েছিলেন) হত্যা করা হোক।

[2] যদিও আল্লাহ্ এটা তাদের জন্য হালাল করেছিলেন।

[3] শিরক কেন আল্লাহর দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় অপরাধ সেটার উপর একটা ছোট্ট নোট লিখেছিলাম-http://on.fb.me/1Ak7gbi

[4] এ ব্যাপারে কুরআনের একটা আয়াত আমাকে খুব নাড়া দেয় –

যখন সব কাজের ফায়সলা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবেঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছি, অতঃপর তা ভঙ্গ করেছি। তোমাদের উপর তো আমার কোন ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছি, অতঃপর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছ। অতএব তোমরা আমাকে ভৎর্সনা করো না এবং নিজেদেরকেই ভৎর্সনা কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী নও। ইতোপূর্বে তোমরা আমাকে যে আল্লাহর শরীক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করি। নিশ্চয় যারা জালেম তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১৪:২২)

শিকড়ের সন্ধানে-১১

আল্লাহ্ তাঁর মহানুভবতার কারণে বাছুর উপাসনা করা সত্ত্বেও বনী ইসরাঈলদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, যাদের হত্যা করা হয়েছিল এবং যারা হত্যা করেছিল উভয়কেই। এখানে আমাদের একটা জিনিস জানার আছে। ইসলামী শাস্তি আইনের কিছু কিছু বিষয় আমাদের সীমিত বুদ্ধিতে অমানবিক মনে হতে পারে, কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে তওবা করার পর যদি তার জন্য নির্ধারিত শাস্তি দুনিয়াতে কার্যকর হয় তাহলে ওই পাপের জন্য পরকালে তাঁর আর কোনো শাস্তি হবে না। [1] এটা ইসলামী শাস্তি আইনের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য যে এখানে সবগুলো ধারণা পরকালীন বিশ্বাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। [2] তাই ইসলামী শাস্তি আইনগুলোর স্বরূপ বিশ্লেষণের সময় এই বিশাল প্রাপ্তিটার কথা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে (একজন বিশ্বাসীর জন্য পরকালের শাস্তি মাফ হয়ে যাবে এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কী হতে পারে!)

যদিওবা এই শিরকের গুনাহ আল্লাহ্ মাফ করে দিয়েছিলেন কিন্তু বারবার এই ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট হয়ে যেন বনী ইসরাঈলের উপর থেকে নিয়ামত না সরিয়ে নেন সেজন্য মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠিক করলেন যে বনী ইসরাঈলদের মধ্য থেকে ৭০ জন শ্রেষ্ঠ মানুষকে নিয়ে যাবেন তূর পাহাড়ের উপত্যকায়, আল্লাহর কাছে বিশেষভাবে ক্ষমা চাইতে। ওখানে পৌঁছানোর পর আল্লাহ্ আর মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরাসরি কথা বলছিলেন আর আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলদের জন্য নানা আদেশ নিষেধ নাযিল করছিলেন। ওই ৭০ জন লোক যারা ছিলেন মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বাছাইকৃত, তারা শুধু মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই কথা বলতে দেখছিলেন, কারণ আল্লাহর কথাতো শুধু নবী-রাসূলরাই শুনতে পাবেন, সাধারণ মানুষ নয়। তাই তারা তাদের মত প্রকাশ করলেন। কী ছিল সেই মত? ধারণা করতে পারেন?
আসুন কুরআন থেকেই জেনে নেই.....

হে মূসা, কস্মিনকালেও আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহকে (প্রকাশ্যে) দেখতে পাব। (২:৫৫)

তারা বলল যে আল্লাহকে নিজ চোখে না দেখা পর্যন্ত তারা বিশ্বাস করবে না যে এই নির্দেশগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে!!! সুবহানাল্লাহ!
ওরা এই কথা বলার সাথে সাথে একটা প্রচণ্ড বজ্রপাত হল আর সেই প্রচণ্ড শব্দে সাথে সাথে তারা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করল। (২:৫৫)

মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলেন! বাছাই করা ৭০ জন মানুষের আচরণ যদি এমন হয় তাহলে বাকিদের অবস্থা কী! আল্লাহ্ হয়তো এখন উনার পুরো জাতিকেই ধ্বংস করে দিবেন! তখন উনি তাড়াতাড়ি আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করা শুরু করলেন-মুনাজাতে লিপ্ত হয়ে গেলেন। তিনি বললেন-

হে আমার পরওয়ারদেগার, তুমি যদি ইচ্ছা করতে, তবে তাদেরকে আগেই ধ্বংস করে দিতে এবং আমাকেও। আমাদেরকে কি সে কর্মের কারণে ধ্বংস করছ, যা আমার সম্প্রদায়ের নির্বোধ লোকেরা করেছে? এসবই তোমার পরীক্ষা; তুমি যাকে ইচ্ছা এতে পথ ভ্রষ্ট করবে এবং যাকে ইচ্ছা সরলপথে রাখবে। তুমি যে আমাদের রক্ষক-সুতরাং আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের উপর করুনা কর। তাছাড়া তুমিই তো সর্বাধিক ক্ষমাকারী। আর পৃথিবীতে এবং আখেরাতে আমাদের জন্য কল্যাণ লিখে দাও। (৫৬-১৫৫:৭)

এখানে কয়েকটা বিষয় লক্ষণীয়- একটা হচ্ছে মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশ্ন...যখন কোনো জাতির মাঝে অল্প কিছু খারাপ মানুষ থাকে তখন কি আল্লাহ্ তাদের সবাইকে ধ্বংস করে দিতে পারেন? এই একই প্রশ্ন আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাও করেছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লামকে। ভয়ের ব্যাপারটা হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম উত্তরে বলেছিলেন হ্যাঁ, এমনটা হতে পারে, যদি মন্দ বা খারাপের মাত্রাটা খুব বেশী হয়ে যায়। এই বিষয়টা আমাদের খুব করে মাথায় রাখা উচিৎ। এরকম আরো একটা হাদীস আছে যে একবার আল্লাহ্ এক অঞ্চলের মানুষকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতারা গিয়ে দেখল যে ওখানে একজন খুবই আল্লাহ্ ওয়ালা বান্দা আছে যে সারাদিন ইবাদাত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকে। ফেরেশতারা আল্লাহকে জিজ্ঞেস করল এমন মানুষ থাকা সত্ত্বেও কি আল্লাহ্ ওই জনপদ ধ্বংস করে দিবেন? আল্লাহ্ বললেন শাস্তি যেন ওই আল্লাহ্ ওয়ালা বান্দার বাসা থেকেই শুরু করা হয়!

কারণটা কি?

কারণটা কিন্তু আসলে সহজেই বোধগম্য।

ইসলাম একটা সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ধর্ম, এটা শুধু কতগুলো আচার অনুষ্ঠানের সমষ্টি নয়। তাই সারাদিন নিজের ঘরের কোণায় বসে আরাম করে ইবাদাতে কাটিয়ে দেয়া যখন আশেপাশের মানুষ উচ্ছন্নে যাচ্ছে তখন তাদের সতর্ক না করা বা উপদেশ না দেয়া কোনো ইসলামিক আচরণ নয়। সৎ কাজের আদেশ ও খারাপ কাজে নিষেধ আমাদের দ্বীনের একটা প্রধান স্তম্ভ বললে অত্যুক্তি করা হবে না।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি লক্ষণীয় সেটা হল সেটা হচ্ছে মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআ। অনেক স্কলাররা মন্তব্য করেছেন যে সূরা বাক্বারাতে যে দুআটা আল্লাহ্ আমাদের শিখিয়েছেন ইহকালীন এবং পরকালীন সাফল্যের জন্য, সেটা প্রাথমিকভাবে ছিল মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সময়ে করা দুআ, অর্থ্যাৎ আল্লাহর নবী রাসূলরা খুব ভালো করেই বুঝতেন আল্লাহর কাছে কী চাইতে হবে।

তৃতীয়ত, যদিও আল্লাহর রাসূল, তবুও দিন শেষে মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিন্তু একজন মানুষই ছিলেন। তাই তাঁর বাছাই করা ৭০জন মানুষ যে আদতে বনী ইসরাঈলদের মাঝে শ্রেষ্ঠতম মানুষ ছিলেন না সেটা স্পষ্ট করে দিল যে মানুষের পক্ষে আরেকজনের অন্তরের ঈমানের অবস্থা আসলে কখনো জানা সম্ভব না। দাওয়াতী কাজের ক্ষেত্রে এটা আমাদের ব্রেনের কোষে কোষে একদম গেঁথে নেয়া দরকার.....আমরা যেন মানুষকে দেখে বিচার না করি কে ইসলামের পথে আসবে আর আসবে না। আমরা কখনো জানি না, আল্লাহ্ ভালো জানেন।
যাই হোক, আল্লাহ্ এবারো বনী ইসরাঈলদের ক্ষমা করে দিলেন। আমরা খেয়াল করলে দেখবো যে বনী ইসরাঈলদের ইতিহাস আসলে ক্রমাগত অবাধ্যতা করা আর আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার ইতিহাস। এসব আচরণের ফলশ্রুতিতেই তারা একসময় আল্লাহর অভিশাপ কুড়াবে, যেটা আমরা পরবর্তী পর্বগুলোতে ধীরে ধীরে দেখবো ইনশাল্লাহ।
মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআ কবুল করে আল্লাহ্ ঐ ৭০ জনকে আবার পুনরুজ্জীবিত করলেন। (২:৫৬) তারা আল্লাহর নির্দেশাবলী নিয়ে ফিরে গেল ওদের নিজেদের লোকেদের কাছে। তখন ওরাও বলল যে আমাদেরকে এর নিয়ম কানুনগুলো দেখাও, যদি এটা সহজ হয় শুধু তাহলেই আমরা এটা মেনে নিতে স্বীকৃতি জানাবো। মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন না এটা মানতে হবে সামগ্রিকভাবেই, খন্ডিতভাবে নয়। [3] এরপরও ওরা যখন তাওরাতের বিধি বিধানগুলো মানতে চাইলো না তখন ফেরেশতারা তুর পাহাড়টা ওদের উপর এমনভাবে তুলে ধরলেন যেন তা মেঘ! ওরা যদি না মানে তাহলে পর্বতটা এক্ষুনি ওদের উপর ধ্বসে পড়বে। তখন ওরা বাধ্য হল মেনে নিতে। (২:৯৩) ওদের বলা হল সিজদায় অবনত হতে, ওরা তাই করল। তাফসীরে আছে যে ওরা বুকের উপর দিয়ে সিজদাহ করছিল আর এক চোখ দিয়ে উপরে তাকিয়ে দেখছিল যে পাহাড়টা ওদের উপর ভূপাতিত হচ্ছে কী না!

যাই হোক এভাবেই আস্তে আস্তে ৪০ বছর কেটে যাবার উপক্রম হল মরুভূমিতে। এই সময়ের মাঝে হারুন আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, উভয়েরই মৃত্যু হয়। মুসা আলাইহি

ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় পবিত্র ভূমিতে বনী ইসরাঈলদের প্রবেশ দেখে যেতে পারেননি। তিনি খুব করে চেয়েছিলেন এটা.....তাই তিনি অনুরোধ করেছিলেন যে তাঁর জান যেন জেরুজালেমের যত কাছে সম্ভব তত কাছে গিয়ে কবজ করা হয়, আল্লাহ্ তাঁর সেই দুআ শুনেছিলেন, জেরুজালেমের একদম সীমার কাছে এসে তাঁর মৃত্যু হয়।
মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় বনী ইসরাঈলদের ধারাবাহিক ঘটনার ক্রমের এখানেই পরিসমাপ্তি। পরের পর্বে আমরা আরো কিছু কাহিনীর কথা জানবো যেগুলো এই ৪০ বছরের মাঝে ঘটেছিল কিন্তু সেগুলোর কোনো সময়ের ক্রম সম্পর্কে কিছু জানা যায় না.....

[1] মানুষ যখন হুদুদ (শরীয়াহ যেসব অপরাধের শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছে যেমন যিনা, মদ্যপান, হত্যা ইত্যাদি) যোগ্য কোনো অপরাধ করে, তখন সে মূলত দুটো অধিকার লঙ্ঘন করে- আল্লাহর প্রতি এবং অন্য মানুষের প্রতি। তওবা করলে আল্লাহর সাথে কৃত অপরাধ মাফ হয়ে যায়, কিন্তু অন্যের অধিকার লংঘনেরটা হয় না। হুদুদের মাধ্যমে আসলে মানুষের প্রতি কৃত অপরাধের শাস্তি হয়। আর একবার ইসলামী রাষ্ট্রের কোর্টে হুদুদযোগ্য অপরাধের শাস্তি প্রমাণের পর তওবা করলে সেই শাস্তি মাফ হয় না, কারণ এভাবে একটি রাষ্ট্রে আইনের শাসন বলে আদতে কিছু থাকবে না, সবাই পাপ করে বলবে আমি তওবা করেছি।
তাই যখন কেউ আন্তরিকভাবে তওবা করেছে এবং তার উপর শাস্তি কার্যকর হয়েছে, পরকালে সে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত হবে ইনশাল্লাহ।
[2] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লামের সময়ে এক সাহাবীকে ব্যভিচার করার দায়ে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হয়েছিল। শাস্তি কার্যকর সময় পর উনার মৃতদেহ থেকে কয়েক ফোঁটা রক্ত ছিটকে একজন সাহাবীর গায়ে এসে পড়লে উনি বিরক্ত প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর এহেন আচরণে রাগান্বিত হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম মন্তব্য করেছিলেন যে এই ভদ্রমহিলা যে তওবা করেছেন তা যদি পুরো মদীনাবাসীর মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়, তাও যথেষ্ট হবে!

[3] এই আচরণটা চেনা চেনা লাগে না? আমরা মুসলিমরাও তো এখন ক্যাফেটোরিয়া ইসলাম পালন করতে চাই, যাকে বলে pick and choose Islam। যেটা আমাদের কাছে সহজ লাগে বা যৌক্তিক লাগে সেটা পালন করি, বাকিগুলো নয়। তাহলে খুব কি দোষ দেয়া যায় বনী ইসরাঈলদের?

শিকড়ের সন্ধানে-১২

আগেই বলেছিলাম যে আজকের পর্বে কুরআনে উল্লেখিত কিছু কাহিনীর কথা জানবো যেগুলো এই ৪০ বছরের মাঝে ঘটেছিল কিন্তু সেগুলো সংঘটনের সময়ের ক্রম সম্পর্কে কিছু জানা যায় না.....

বনী ইসরাঈলদের দ্বারা মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অসুস্থতার অপবাদ দেয়াঃ

বনী ইসরাঈলদের মাঝে একটা অভ্যাস ছিল যে ওরা যখন গোসল করত তখন প্রাপ্ত বয়স্করাও একসাথে করত এবং এ সময় একজন আরেকজনের দিকে তাকাতেও দ্বিধা করত না। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই আচরণটা আল্লাহর একজন রাসূলের জন্য শোভন ছিল না। উনি তাই একাকী গোসল করতেন। এটা বনী ইসরাঈলদের কাছে খুবই অস্বাভাবিক লাগত। তাই তারা বলাবলি করতে থাকল যে নিশ্চয়ই মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরে কোনো খুঁত বা অসুস্থতা আছে যার জন্য উনি অন্য কারো সামনে গোসল করেন না.....

এটা এমন একটা অপবাদ যেটা ভুল প্রমাণ করতে গেলে যা করতে হবে সেটা মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনোই করবেন না। তাই আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি তাঁর রাসূলকে এই অযথা অপবাদের গ্লানি থেকে মুক্ত করবেন। (৩৩:৬৯) তাই একদিন যখন মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করছিলেন তখন উনি পাশে যে পাথরের উপর উনার পোশাকগুলো রেখেছিলেন, সেই পোশাক বহনকারী পাথরটা আল্লাহর নির্দেশে চলা শুরু করল। উপায়ন্তর না দেখে মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনার পোশাক নেয়ার জন্য ওটার পিছে পিছে দৌড়াতে শুরু করলেন। আর তাতেই তিনি যে আড়াল নিয়ে গোসল করছিলেন সেটার বাইরে উনি চলে আসলেন এবং বনী ইসরাঈলের লোকজনরা দেখতে পেল যে মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পূর্ণ সুস্থ এবং সুঠাম দেহের অধিকারী। তাদের ভুল ধারণার অবসান ঘটল।

এখন এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন উনার জাতির লোকজনদের এই নির্লজ্জ অভ্যাস থেকে বিরত রাখতেন না। এখান থেকে আসলে আমরা দাওয়াতী কাজের একটি মূলনীতি শিখতে পারি- gradualism and prioritization of sins। অর্থ্যাৎ কাউকে দাওয়াত দেয়ার সময় আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে একবারেই কোনো মানুষ বা দেশের লোকেরা পারফেক্ট হয়ে যাবে না। আমাদের বুঝতে হবে যে কোন পাপ থেকে মানুষকে আগে নিষেধ করা উচিৎ। আগের পর্বগুলোতে আমরা বারবার দেখেছি যে বনী ইসরাঈলদের শিরকের

ধারণাই স্পষ্ট না। এমতাবস্থায় ওদেরকে অন্য কোনো ব্যাপারে বলাটা আসলে প্রজ্ঞার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না।
আরেকটা জিনিস আমরা এখান থেকে শিখতে পারি যে কোনো জনপদের অধিবাসীরা যখন আল্লাহকে ঠিকমত চেনে না বা শিরকে লিপ্ত থাকে তখন প্রথম তাদের মাঝে যে পাপের প্রসার ঘটে সেটা হচ্ছে নির্লজ্জতা। এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভালো যে আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হাওয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আল্লাহর নির্দেশ
অমান্য করলেন তখন সর্বপ্রথম যেটা ঘটেছিল সেটা হল তাদের শরীর থেকে জান্নাতী পোশাক খুলে গিয়েছিল। এখান থেকে স্কলাররা বলে থাকেন যে প্রকাশ্য অশ্লীলতা ও ব্যভিচার হচ্ছে প্রথম পাপ যা ব্যধির মত একটি সমাজকে গ্রাস করে যখন তারা আল্লাহর স্মরণ তথা ইবাদাত থেকে সরে যায়...

বাক্কারা সম্পর্কিত ঘটনাঃ

একবার বনী ইসরাঈলদের মাঝে একটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হল। এক লোক তার আত্মীয়কে নিজেই হত্যা করে একজন নিরপরাধের কাঁধে পাপের বোঝা চাপিয়ে দিল। তার উদ্দেশ্য ছিল এক ঢিলে তিন পাখি মারা। সে ওই লোকের মেয়েকে বিয়ে করতে চাচ্ছিল, কিন্তু ভদ্রলোক তা দিতে চাচ্ছিলেন না কিছুতেই। তাই সে ভাবল যে যদি উনাকে মেরে ফেলে তাহলে একেতো বিয়ের পথের বাঁধা দূর হবে, সেই সাথে বিয়ের পর উনার সম্পদের মালিক হবার সুবাদে রক্তপণ তথা দিয়াহও পাওয়া যাবে।

যার উপর মিথ্যা খুনের অপবাদ চাপানো হয়েছিল সে তীব্র প্রতিবাদ করে অস্বীকার করতে থাকে এই অভিযোগ। তখন এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বনী ইসরাঈলদের মাঝে বিশাল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। তখন তারা মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দ্বারস্থ হয় এবং তাঁর সাহায্য কামনা করে, যেন ওহীর মাধ্যমে তিনি তাদের জানিয়ে দেন যে কে আসল খুনি এটা।
মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নির্দেশে বনী ইসরাঈলদের একটা গরু জবাই করতে বলেন। এহেন অদ্ভূত নির্দেশে বনী ইসরাঈলরা অবাক এবং বিরক্ত হয়ে যায়। তারা আগের মতই ধৃষ্টতাপূর্ণ স্বরে মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলে-

তুমি কি আমাদের সাথে উপহাস করছ? (২:৬৭)

আল্লাহর নবী হয়ে মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আল্লাহর নির্দেশ নিয়ে হাসি ঠাট্টা করবেন? এটা কি একজন আল্লাহর রাসূলের জন্য শোভনীয়? কিন্তু ধৈর্য্য ধারণ করে মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন-

মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (২:৬৭)

কিন্তু বনী ইসরাঈলদের কাছে সমাধানটা এতটা সহজ মনে হল না। তাই তারা মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে থাকল যেন গরুটার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়- সেটার বয়স কেমন হবে...? জানানো হল বয়স হবে মাঝামাঝি (২:৬৮)। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে তারা আবার জিজ্ঞেস করল গরুটার রঙ কেমন হবে-------উত্তর আসল খুব আকর্ষণীয়, গাঢ় পীত বর্ণের একটা রঙ। এতেও থেমে না গিয়ে তারা আরো বিস্তারিত বিবরণ জানতে চাইল। তখন মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানালেন যে সেটা কৃষিকাজে ব্যবহৃত হয়েছে এমন হওয়া যাবে না।
এমন অনন্য বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন গরু খুঁজতে গিয়ে বনী ইসরাঈলদের অবস্থা খারাপ হয়ে গেল। কারণ বৈশিষ্ট্যগুলোর দিকে একবার চোখ বুলালেই আমরা বুঝবো যে এগুলার সবগুলো বিদ্যমান এমন গরু খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর বৈকি! অনেক খুঁজে পেতে অবশেষে বনী ইসরাঈল এমন একটি গরু খুঁজে পেল, যার মালিক ছিল এক বিধবা মহিলা। সে যখন বুঝতে পারল যে এই গরুটির জন্য বনী ইসরাঈলরা হন্যে হয়ে রয়েছে, তখন সে দাম হিসেবে চাইল গরুটার ওজনের সমান পরিমাণ সোনা!

বনী ইসরাঈলরা উপায়ন্তর না দেখে এমন অস্বাভাবিক উচ্চ মূল্যেই গরুটা কিনে মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালো। পরবর্তী নির্দেশ ছিল গরুটা জবাই করে সেটার এক টুকরা মাংস মৃত ব্যক্তিটার গায়ে ছোঁয়াতে। আর তাতেই লোকটি পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠল এবং জনসম্মুখে জানালো যে আসলে যে অন্যকে অপবাদ দিচ্ছিল, সেই তাকে হত্যা করেছে। এই তথ্যটা জানিয়েই সে আবার মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। (২:৬৮-৭৩)
আর এভাবেই সত্য প্রকাশিত হয়ে গেল, বনী ইসরাঈলরা একটা প্রায় বেঁধে যাওয়া গৃহযুদ্ধ থেকে রক্ষা পেল।

ঘটনা থেকে শিক্ষণীয়ঃ
এই একটা ঘটনা থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে-

প্রথমত, আপনাদের কী মনে হয় কেন বনী ইসরাঈল মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিল যে উনি উপহাস করছেন কী না? একটু চিন্তা করলে আমরা বুঝবো যে ওরা আসলে বুঝতে পারছিল না যে ওহীর মাধ্যমে খুনী কে এটা জানার সাথে গরু জবাই করার কী সম্পর্ক! অর্থ্যাৎ আল্লাহর নির্দেশের যৌক্তিকতা ওরা বুঝতে পারছিল না.....তাই ওরা সাথে সাথে নির্দেশ পালন করেনি.....

আমাদের কোনো স্বভাবের সাথে কি মিল পাই? চারপাশে এমন কত হাজারো কেস দেখেছি যেখানে মানুষ ইসলামের একদম মৌলিক বিষয়গুলো পালন করছে না শুধুমাত্র এটা তাদের কাছে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না বলে.....আজকের অর্থনীতিতে সুদ কিভাবে নিষেধ হতে পারে, মিউজিক কিভাবে হারাম হতে পারে এগুলা আমাদের বুঝে আসে না বলে, স্রেফ বুঝে আসে না বলে এগুলো থেকে আমরা দূরে থাকি না।
এখানে প্রশ্ন হতে পারে তাহলে কি আমরা আল্লাহর আদেশের পেছনে প্রজ্ঞা খুঁজতে যাবো না? আমরা কি আল্লাহ্ আমাদের যে ব্রেন, চিন্তা ও বিশ্লেষণী শক্তি দিয়েছেন তা কাজে লাগাবো না? কুরআনের পাতায় পাতায় তো আল্লাহ্ আমাদের চিন্তাশীল হতে, ব্রেন খাটাতে বলেছেন.....তাহলে? এখানে আমাদের মূলত দুটো জিনিস বুঝতে হবে-

আমরা ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে ‘বেছে’ নেই, তারপর আল্লাহর দেয়া নিয়ম কানুনগুলো ‘মেনে’ নেই। আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে আল্লাহ্ কোন আয়াতগুলোতে আমাদের চিন্তা করতে বলেছেন তাহলে দেখবো সেগুলো হচ্ছে রাব্ব হিসেবে আল্লাহকে চিনে নেয়ার আহবান সম্বলিত আয়াত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সত্য নবী সেটা, আগেকার অবাধ্য সম্প্রদায়কে কিভাবে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে, কুরআন যে আসলেই আল্লাহর বাণী ইত্যাদি.....অর্থ্যাৎ ঈমান আনার পূর্বে মানুষকে চিন্তাভাবনা করে ‘সত্য’ চিনে নেয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। কুরআনে আমরা এমন আয়াত দেখবো না যেখানে আল্লাহ্ চিন্তা ভাবনা করে ইসলামের কোনো আইন কানুন ‘মেনে’ নিতে বলেছেন।
তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো? ইসলামে আসার পর কি আমরা আমাদের বুদ্ধি ও চিন্তাশীলতার দ্বার বন্ধ করে দিবো?
অবশ্যই না...
তাহলে মূল পয়েন্টটা কী? [1]
মূল বিষয়টা হচ্ছে আমাদের মানসিকতা, তথা অ্যাটিটিউড। আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের সীমিত বুদ্ধি নিয়ে আমরা কখনোই আল্লাহর দেয়া সব বিধানের অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা বা তাৎপর্য বুঝবো না, এটা বোঝা সম্ভব না। যে মেয়েটার বয়ফ্রেণ্ড একান্ত মুহূর্তের ছবি ফটোশপ

করে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দিয়েছে, তাকে আপনি সহজেই বুঝাতে পারবেন প্রেম করা কেন হারাম। কিন্তু যে সমাজে প্রতিষ্ঠিত এমন কারো সাথে বহু বছর প্রেম করেছে এবং উভয় পরিবার বিনা বাক্যে তাদের বিয়ের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে, তাকে বুঝানো খুব কঠিন। তেমনিভাবে সুদী ব্যাংকের উচ্চ পদের চাকরী করে যে অর্থ, সম্মান সবকিছুর স্বর্ণ শিখরে অবস্থান করছে, সে কখনোই বুঝবে না সুদভিত্তিক সিস্টেমের মাঝে সমস্যাটা কোথায়। অন্যদিকে যার বাবা মহাজনের কাছে সুদে ঋণ নিয়ে শোধ করতে না পেরে আত্মাহুতি দিয়েছে, সে হয়তো সহজেই বুঝতে পারবে। এ থেকে আমরা কী বুঝলাম?

আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, আপেক্ষিক ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত। তাহলে একবার চিন্তা করুন যে আমরা সবাই যদি বসে থাকি আল্লাহর বিধানের প্রজ্ঞা বোঝার আশায়.....আগে বুঝবো, তারপর মানবো.....তাহলে এই জীবনে কি সম্ভব হবে আমাদের পক্ষে সব বিধান মানা? তাই আমাদের মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে। সেই ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থাটা কী?

আমরা বুঝি বা না বুঝি বিধানগুলো প্রাথমিকভাবে মেনে চলব, কিন্তু সেগুলোর পিছনে প্রজ্ঞা অনুসন্ধানের যে প্রচেষ্টা, তাও থেমে থাকবে না। আমাদের মানসিকতাটা হবে আত্মসমপর্ণের, আনুগত্যপূর্ণ। আদেশ নিষেধের প্রজ্ঞা জানতে আমরা আল্লাহরই কাছে সাহায্য চাইবো, সাথে এই মনোভাবও ধরে রাখবো যে যদিও বা না বুঝি, তবুও মেনে চলাটা থামাবো না। এমন মানসিকতা থেকেই আমরা ইসলামী অর্থনীতি নিয়ে পড়বো, গবেষণা করবো কেন সুদ হারাম, কেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করার সাথে এটাকে তুলনা করা হয়েছে.....শুকরের মাংস বা মদ খেলে কী শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি হতে পারে ইত্যাদি...আমরা যেন ভুলে না যাই...রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে মানবজাতির প্রতি আল্লাহর প্রথম নির্দেশ ছিল ‘পড়’। কিন্তু সেই সেই পড়াটা কিভাবে হবে? কোন মানসিকতা নিয়েআল্লাহ্ একই সূরায় উত্তরটা দিয়ে ? ইক্বরা বিসমি রাব্বি কাল্লাযী খালাক্ব।--------দিচ্ছেন মাত্র কয়েকটা শব্দে
অর্থ্যাৎ আমাদের সকল জ্ঞান অর্জন হবে আল্লাহর নামে, আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করার লক্ষে। ইতিহাস সাক্ষী যে মুসলিমরাই একমাত্র গ্রুপ যারা কখনো মনে করেনি ধর্মের সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো সংঘর্ষ রয়েছে বা থাকতে প্ারে.....একইসাথে আমরা কখনোই আমাদের বুদ্ধিকেই চূড়ান্ত মানদণ্ড ভাবি না.....
পরবর্তী শিক্ষাগুলো আমরা আগামী পর্বে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ।

[1] এটা নিয়ে ইয়াসির ক্বাদীর একটা ভিডিও রয়েছে, কেউ চাইলে দেখতে পারেন- Reconciling between reason and revelation https://www.youtube.com/watch?v=9Ww3sDAlb-8

শিকড়ের সন্ধানে-১৩

আমরা আলোচনা করছিলাম সেই ঘটনাটা নিয়ে যেটা অবলম্বনে সূরা বাক্বারার নামকরণ করা হয়েছে। আমরা আগের পর্বে মূল ঘটনাটা উল্লেখ করেছি এবং এই ঘটনা থেকে প্রাপ্ত একটি শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করেছি। এই পর্বে আমরা অন্যান্য শিক্ষাগুলো নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ।

এই গরু জবাই করার নির্দেশটি আসলে পূর্বে বনী ইসরাঈলদের জন্য সাগর দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গে উল্লেখিত একটি শিক্ষার সাথে জড়িত। আমরা বলেছিলাম যে আল্লাহ্ মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লাঠি দিয়ে সাগরে আঘাত করতে বলেছিলেন যদিও সাগরে লাঠি দিয়ে আঘাত করলে কখনোই সাগরের পানি সরে যায় না। তবুও এটা থেকে আল্লাহ্ আমাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন যে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার জন্য আমাদেরকে আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করে যেতে হবে। এখানেও চাইলে আল্লাহ্ ওহীর মাধ্যমেই জানিয়ে দিতে পারতেন প্রকৃত হত্যাকারী কে, কিন্তু আল্লাহ্ জবাইকৃত গরুর মাংস দিয়ে মৃতদেহটিকে স্পর্শ করিয়ে তার মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন সত্যটা। অর্থ্যাৎ আল্লাহ্ এখানেও একটা মিরাক্যল ঘটালেন, মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করে দেখালেন, কিন্তু সেখানেও বনী ইসরাঈলকে 'কিছু একটা' করতে হল।

এখান থেকে আমরা আরো একটা দারুণ জিনিস শিখি, সেটা হল কোন ঘটনার পরিণতি আমাদের কাছে কাম্য হতে পারে, কিন্তু সেটা পাওয়ার উপায় বা প্রসেসটা আল্লাহ্ নির্ধারণ করেন, সেই ঘটনাপ্রবাহ আমাদের পছন্দ নাও হতে পারে, যেমনটা এখানে ঘটেছে বনী ইসরাঈলদের সাথে। তারা চাচ্ছে আসল খুনী কে সেটা জানতে, কিন্তু সেটা জানার জন্য তাদের যেসব কাজ করতে হচ্ছে সেটা তাদের কাছে বিরক্তিকর লাগছে। এমনটা আমাদের জীবনে হর হামেশাই ঘটে। খুব ক্লান্তিকর কিছুর মধ্য দিয়ে হয়তো আমরা যাচ্ছি, কিন্তু দিন শেষে দেখা গেল সেটার মধ্য দিয়ে এমন কিছু ঘটেছে যা হয়তো আমরাই এক সময় খুব ব্যাকুলভাবে চেয়েছিলাম আল্লাহর কাছে.....!

তবে এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই পুরো ব্যাপারটা ঘোলাটে করেছে কিন্তু বনী ইসরাঈলদের নিজেদের একগুঁয়েমির কারণেই। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্য সবসময় সহজতা চান, এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনে ওরা যদি সাথে সাথে তা পালন করতে ব্যাপৃত হত, তাহলে যে কোনো একটা গরু জবাই করলেই হত। খেয়াল করলে আমরা দেখবো যে প্রথমে কোনো বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে স্রেফ একটা গরু। বনী

ইসরাঈলরাই বারবার প্রশ্ন করে এমন এক অবস্থা তৈরি করেছে যার জের তাদের পোহাতে হয়েছে অস্বাভাবিক মূল্যে গরুটা কিনতে গিয়ে। তারা একবার প্রশ্ন করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং বার বার করে করেছে এবং প্রতিবার উত্তরে ওরা পেয়েছে আগের চেয়েও কঠিন শর্ত। ভেবে দেখুন গরু তো কৃষিকাজে ব্যবহৃত হবে এটাই স্বাভাবিক, তাই না? কে গরুকে বসিয়ে রাখবে এমনি এমনি? আবার পীত বর্ণের গরু কি সহজলভ্য? আমাদের কেউ আছে যে মনে করতে পারবে যে সে জীবনে হলুদ রঙয়ের গরু দেখেছে!

তাই আমাদের মনে রাখা উচিৎ যে কোনো ব্যাপারে যদি আমাদের জীবন খুব কঠিন হয়ে যায়, কিছুতেই দুআ কবুল না হতে থাকে, তাহলে আমাদের প্রথমে নিজেদের আমলের দিকে তাকানো উচিৎ। হারাম ভাবে জীবিকা অর্জন করে আমরাই দুআ কবুলের রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছি না তো? আমাদের ঘরে শো পিস হিসেবে রাখা মূর্তি, ঝুলিয়ে রাখা ছবি...এগুলোই আমাদের ঘরে রহমতের ফেরেশতার প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ করে দিচ্ছে না তো?

এই ঘটনা থেকে আমরা আরো জানতে পারি ফিকহের নিয়ম কানুন জানার আদব। আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের রাব্ব ভুলে যান না। তাই অনেক কিছুর ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো নির্দেশনা আসেনি, আল্লাহ্ নিরবতা অবলম্বন করেছেন আমাদের জীবনটাকে সহজ করার জন্য। অযথা প্রশ্ন করে আমরা নিয়মগুলোকে আরো কঠিন, আরো জটিল যেন না করে ফেলি।

তাহলে কি আমরা বিস্তারিত প্রশ্ন করে আমাদের সংশয় দূর করে নিবো না?
আবারো বলতে হচ্ছে যে এক্ষেত্রেও আমাদের মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে। কেমন সেই পথ? হাদীসে উল্লেখিত দুটো ঘটনা থেকে আমরা সেটা বুঝে নিবো।

একবার এক সাহাবী আহত হয়ে মাথায় খুব আঘাত পেয়েছিলেন। তাঁর মাথা ব্যান্ডেজ করে দেয়া হয়েছিল এবং পানি লাগানো নিষেধ ছিল। এমন অবস্থায় তাঁর গোসল ফরয হয়ে গেল। তখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গেলেন জানতে যে তাঁর জন্য কোনো রুখসাত বা অবকাশ আছে কী না? কিন্তু উনি তখন নামাযে ছিলেন। তখন তাঁর আশেপাশে যেসব সাহাবী ছিল তাঁরা বললো আমাদেরই জিজ্ঞেস করতে পারো। তাঁরা শুনে বলল যে গোসল করা ছাড়া কোনো উপায় নেই, কারণ তায়াম্মুম শুধু তখন প্রযোজ্য যখন পানি পাওয়া যাচ্ছে না। অসুস্থ সাহাবী শুনে ব্যাণ্ডেজ খুলে গোসল করলেন, অথচ এটা তাঁর শারীরিক অবস্থার জন্য খুবই অনুপযোগী ছিল, ফলে তিনি মারা গেলেন। এই ঘটনা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভয়ংকর রকমের রেগে যান। [1] উনি তীব্র ক্ষোভের সাথে বারবার বলতে থাকেন ওরা তাকে

হত্যা করেছে, ওরা তাকে হত্যা করেছে! কেন ওরা আমার কাছ থেকে জেনে নেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো না!

আবার আরেকবার মুসলিমদের উপর যখন হাজ্জ ফরয করা হল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা সাহাবীদের জানিয়ে দিলেন। তখন একজন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহর ঘরে যাওয়া কি আমাদের উপর প্রতি বছর ফরয করা হয়েছে নাকি জীবনে একবার? এই প্রশ্ন শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ করে থাকলেন। এ থেকেও ওই সাহাবী বুঝলেন না যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা পছন্দ করছেন না। এই প্রশ্ন তিনি করতেই থাকলেন। তিন বারের বার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিরক্তি সহকারে উত্তর দিলেন যে এই অতিরিক্ত প্রশ্ন করার স্বভাবের জন্যই বনী ইসরাঈলরা ধ্বংস হয়েছে এবং আমরা যেন তাদের মত স্বভাবের না হয়ে যাই। তিনি আরো জানালেন যে তখন যদি উনি ইতিবাচক উত্তর দিতেন তাহলে আসলেই আমাদের জন্য হাজ্জ্ব প্রতিবছর ফরয হয়ে যেত!
ভাবুন একবার!

এই দুটো ঘটনা থেকে কি আমরা বুঝতে পারছি যে কোন প্রশ্ন করা যাবে আর কোনটা করা যাবে না?
প্রথম ঘটনা থেকে আমরা দেখলাম যে এটা একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে নিয়মের এক্সটেনশন, যা কখনো আন্দাজ করে বের করা সম্ভব নয়।
অথচ দ্বিতীয় ঘটনাতে প্রশ্নটা ছিল সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয়! আল্লাহর রাসূলতো অস্পষ্ট করে কোনো নিয়ম জানাবেন না, তাই না?
তাই আমাদের বুঝতে হবে যে কোন প্রশ্নটা প্রয়োজনীয় আর কোনটা না! যেমন ধরেন কুরআন পড়তে গিয়ে আপনার মনে হল যে মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মা আর বোনের নাম কী! তাহলে সেটা কিন্তু একটা অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন! মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মায়ের নাম জেনে আপনার কী লাভ? এইভাবে ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন নিয়ে বানোয়াট কাহিনী নিয়ে ইউসুফ জোলেখার প্রেমকাহিনী নামে এমন লোক গাঁথা প্রচার করা হয়েছে যে আমি একজনের কাছে শুনেছি যে প্রেম করার কথা নাকি কুরআনে আছে! সুবহানাল্লাহ!
তাই এই ঘটনা থেকে আমরা যে শিক্ষাগুলো পেলাম সেটার একটা সারাংশ হল-
১) আল্লাহর বিধান আমাদের বুদ্ধির কাছে গ্রহণযোগ্য বা যৌক্তিক না হলেও সেটা পালন করতে হবে, আল্লাহর অসীম প্রজ্ঞার কাছে আমাদের সীমিত বুদ্ধির আত্মসমর্পণ আমাদের ঈমানে দাবী

২) আল্লাহর সাহায্য পেতে হলে আমাদেরকে সেটার জন্য 'কোয়ালিফাই' করতে হবে, অর্থ্যাৎ ক্ষুদ্র হলেও আমাদের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করে যেতে হবে

৩) আমরা যা চাই, তা পাওয়ার প্রসেস আমাদের পছন্দনীয় নাও হতে পারে, ধৈর্য্য ধারণ করতে হবে

৪) যদি আমাদের জীবনে খুব বেশী প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তবে প্রথমে নিজেদের আমলের দিকে তাকাতে হবে, চেক করে নিতে হবে আমরা নিজেরাই দুআ কবুলের রাস্তা বন্ধ করে রেখেছি কী না!

৫) অযথা প্রশ্ন করে ফিকহের নিয়ম কানুনগুলোর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা আমরা জানতে চাবো না, এতে আমাদের জীবন আমরা নিজেরাই দুর্বিষহ করে তুলবো।

[1] আমরা সীরাহতে সাধারণত দেখি না যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাগের তীব্র প্রকাশ ঘটিয়েছেন। আর এটা থেকেই এই ঘটনাটার গুরুত্ব বোঝা যায়।

শিকড়ের সন্ধানে-১৪

শনিবার সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা অমান্যের ঘটনাঃ

আমরা অনেকেই হয়তো জানি যে আমাদের জন্য শুক্রবার যেমন একটা বিশেষ দিন, ইহুদীদের জন্য তেমন বিশেষ দিনটা হচ্ছে শনিবার যা 'সাবাথ' নামে পরিচিত। আল্লাহ্ এই দিনটা তাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন শুধু মাত্র ইবাদাত বন্দেগী করার জন্য। এইদিন জীবিকা অর্জনের জন্য কোনো ধরণের কাজ করা তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু তাদের অনেকেই এটা মানতো না।

তখন আল্লাহ শাস্তি স্বরূপ তাদেরকে পরীক্ষায় ফেললেন। কয়েক সপ্তাহ ধরে এমন ঘটতে থাকল যে সারা সপ্তাহে লোহিত সাগরে কোনো মাছ আসে না, জালে কিছুই ধরা পড়ে না, কিন্তু শনিবারে মাছের প্রাচুর্য দেখা যায়।
এতে বনী ইসরাঈলরা খুব অস্থির হয়ে পড়ল। কারণ আল্লাহর দেয়া নিষেধাজ্ঞার জন্য তারা শনিবারে মাছ ধরতে পারছিল না, ওদের অনেক লস হয়ে যাচ্ছিল।

তখন ওরা একটা কৌশল খাটালো। ওরা শুক্রবার রাতে নদীতে জাল ফেলে রাখত, শনিবার মাছ ধরত না, কিন্তু শনিবার আসা মাছ গুলো ঠিকই জালে আটকা পড়তো।

ব্যাপারটাতে কি কোনো সমস্যা আছে? ওরাতো শনিবার আর মাছ ধরছে না! তাই না?

আমরা কি বুঝতে পারছি যে ব্যাপারটাতে কী সমস্যা?
সমস্যা ছোট খাটো কিছু না, বেশ গুরুতরই.....ওরা আল্লাহকে ফাঁকি দিতে চেয়েছিল। আরেকটু কিতাবী ভাষায় বললে আল্লাহর দেয়া বিধি বিধানকে বাইপাস করে সেটাকে 'আক্ষরিক ভাবে' নিয়েছিল, আল্লাহর আরোপ করা নিষেধাজ্ঞার মর্মকে ঠাট্টা তামাশার বস্তু বানিয়ে ফেলেছিল.....

এখানে উল্লেখ্য যে বাছুর পূজার মত এই কাজটাও সবাই করেনি, এক গ্রুপ করেছিল। আর এইসময় অন্য গ্রুপ, যারা আল্লাহকে ভয় করে চলতো এবং আল্লাহর বেঁধে দেয়া সীমারেখা অতিক্রম করতো না, তারা তাদেরকে তিরষ্কার করতে লাগল। আরও একটা গ্রুপ ছিল যারা মনে করছিল যে ওদেরকে বলে কোনো লাভ নেই, ওরা আল্লাহর পথে ফিরে আসবে না, আল্লাহর শাস্তি ওদের জন্য অবধারিত।

এভাবে আল্লাহর দেয়া নিষেধাজ্ঞাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার কারণে আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের শাস্তি দিলেন। কী শাস্তি?
আল্লাহর নির্দেশে তারা শুকর ও বানর হয়ে গিয়েছিল।

এই ঘটনাটা আল্লাহ্ কুরআনে বর্ণনা করছেন এইভাবে-

আর তাদের কাছে সে জনপদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস কর যা ছিল নদীর তীরে অবস্থিত। যখন শনিবার দিনের নির্দেশের ব্যাপারে সীমাতিক্রম করতে লাগল, যখন আসতে লাগল মাছগুলো তাদের কাছে শনিবার দিন পানির উপর, আর যেদিন শনিবার হত না, আসত না। এভাবে আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি। কারণ, তারা ছিল নাফরমান। আর যখন তাদের মধ্যে থেকে এক সম্প্রদায় বলল, কেন সে লোকদের সদুপদেশ দিচ্ছেন, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিতে চান কিংবা আযাব দিতে চান কঠিন আযাব? সে বললঃ তোমাদের পালনকর্তার সামনে দোষ ফুরাবার জন্য এবং এজন্য যেন তারা ভীত হয়। অতঃপর যখন তারা সেসব বিষয় ভুলে গেল, যা তাদেরকে বোঝানো হয়েছিল, তখন আমি সে সব লোককে মুক্তি দান করলাম যারা মন্দ কাজ থেকে বারণ করত। আর পাকড়াও করলাম, গোনাহগারদেরকে নিকৃষ্ট আযাবের মাধ্যমে তাদের না-ফরমানীর দরুন। তারপর যখন তারা এগিয়ে যেতে লাগল সে কর্মে যা থেকে তাদের বারণ করা হয়েছিল, তখন আমি নির্দেশ দিলাম যে, তোমরা লাঞ্ছিত বানর হয়ে যাও। (৭:১৬৩-১৬৬) [1]

এই জায়গাটাতে একটা বিষয় আছে যা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে আমাদের আত্মা কেঁপে উঠবে। খেয়াল করলে দেখবেন আল্লাহ্ তিনটা গ্রুপের কথা বলেছেন, কিন্তু মুক্তি দান করার কথা বলেছেন মাত্র একটি গ্রুপের- যারা নিজেরা করতো না এবং অন্যকে নিষেধ করতো! অর্থ্যাৎ নিজেরা করতো না অথচ অন্যকে সাবধানও করতো না, এমন গ্রুপটার শাস্তি তাদের মতই হয়েছিল যারা আসলে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছিল!

তাই আজকের সমাজে আমরা যারা নিজেরা ইসলাম পালন করেই আত্মতৃপ্তিতে ভুগছি এবং চারদিকে অশ্লীলতা ও প্রকাশ্য পাপের প্রাচুর্য দেখে মনে করছি যে আমরা নিজেরাতো আর করছি না.....তাদের জন্য এটা একটা বিশাল সতর্ক বাণী। কুরআন এখানে অনবদ্য ভাষায় আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যদিও বা আমরা জানি যে বলে লাভ নেই, বা দেখলাম যে বলে কোনো লাভ হচ্ছে না, তবু আমরা মানুষকে সতর্ক করা থামাবো না, কারণ এটা আমরা করছি নিজেদেরকে দায়মুক্ত করার জন্য, ওদেরকে বাঁচানোর জন্য নয়! আবারো দেখুন আল্লাহ্ কী বলছেন-

সে বললঃ তোমাদের পালনকর্তার সামনে দোষ ফুরাবার জন্য.....

এখন এই ঘটনাটা আমরা একটু বিশ্লেষণ করবো ইনশাল্লাহ। এই ঘটনা শোনার পর কিছু প্রশ্ন মাথায় আসতে পারে, সাহাবীদেরও এসেছিল।

প্রথমত, আজকে আমরা যে বানর এবং শুকর দেখছি, তারা কি তাহলে শাস্তিপ্রাপ্ত বনী ইসরাঈলদের বংশধর? হাদীস থেকে আমরা জানতে পারছি যে উত্তরটা হচ্ছে 'না'। এভাবে যাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়েছিল তাদের কোনো সন্তান সন্ততি হয় নি, তারা ঐ অবস্থাতেই মারা গিয়েছিল। [2]

দ্বিতীয়ত, এমন শাস্তি বনী ইসরাঈলদের কিছু সদস্যকে দেয়া হয়েছিল বলে আমরা কি ওদেরকে খুব অবজ্ঞার চোখে দেখতে পারি? এটার উত্তরও হচ্ছে 'না'। কারণ আবারো হাদীস থেকে আমরা জানতে পারছি যে এমন শাস্তি কিয়ামতের শেষ সময়ে এসে আমাদের উম্মাতের মাঝেও কাউকে কাউকে দেয়া হবে বিশেষ একটি পাপের জন্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

'Among this ummah those who disbelieve in the divine decree (*al-qadr*) will be wallowed up by the earth, transformed into monkeys and pigs or pelted with stones." (*Saheeh al Tirmidhi*, 1748). [3]

আমাদের জীবনে এই ঘটনার বাস্তব প্রয়োগঃ

আমরা আগের পর্বের গুলোতে দেখেছি যে একটু চিন্তা করলে বনী ইসরাঈলদের এক একটি কাহিনী থেকে কত শিক্ষণীয় বিষয় ফুটে ওঠে। এই কাহিনীটিও তার ব্যাতিক্রম নয়। তবে এটার বিশেষত্ব হচ্ছে এর সরাসরি প্রয়োগ আছে আমাদের জীবনে।

আল্লাহ্ আমাদেরকেও এমন একটা দিন দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে শুক্রবার (সেটার বিশেষ ফযীলাতের কথা বলতে গেলে আরেকটা নোট লিখতে হবে, তাই আর কথা বাড়াচ্ছি না) কিন্তু আমাদের উপর বিশেষ রহমত স্বরূপ আল্লাহ্ এই দিন সারাদিন আমাদের দুনিয়াবী কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন নাই, তবে জুমুআর নামাযের সময়টুকুতে দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশ এসেছে। কিন্তু আমরা কি সেটা মানছি?

আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলদের শনিবার দিন মাছের প্রাচুর্য দিয়ে যেমন পরীক্ষা করেছিলেন, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে এমন হতে পারে যে সারাদিন আপনার কোনো কেনা বেচা হয়নি, জুমুআর

নামাযের জন্য দোকান বন্ধ করতে যাবেন, এই সময়ে অনেকগুলো ক্রেতা আসলো, যারা অনেক টাকার পণ্য ক্রয় করবে। তখন কিন্তু আমরা একদম হুবহু একই পরিস্থিতিতে পড়ে যাচ্ছি।

এইভাবে আমাদের জীবনে অনেক সময় উপস্থিত হতে পারে যখন জুমুআর নামাযের সময় আমাদের কোনো কাজ পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সব কিছুকে উপেক্ষা করে আমাদের জুমুআর নামায পড়তে হবে। তা না হলে আল্লাহ্ আমাদের অন্তরে সীলমোহর মেরে দিবেন অর্থ্যাৎ সত্য প্রকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। একটু চিন্তা করলে দেখবো যে এটা কিন্তু বানর হয়ে যাওয়ার চাইতে কম কোনো শাস্তি না!

আমরা যদি সূরা জুমুআর তাফসীর পড়ি তাহলে দেখবো যে ঠিক এরকম একটা প্রসঙ্গেই সূরাটি নাযিল হয়েছিল, যখন সাহাবীদের এক দল (এটা একদম মদীনার প্রথম দিকের কথা যখন মদীনাতে চরম অর্থনৈতিক সংকট চলছিল) এ জুমুআর খুতবা চলাকালে সেটা বাদ দিয়ে কেনাকাটা করতে চলে গিয়েছিলেন কারণ তখন বাজার বসেছিল.....ইন্টারেস্টিং বিষয়টা হচ্ছে এই সূরার শুরুটা হয়েছে ইহুদীদেরকে তিরস্কার করে। সেজন্য অনেক তাফসীরকারক মন্তব্য করেছেন যে একটা উম্মাহর উত্থান ও পতনের সাথে সেই জাতি তাদের জন্য নির্ধারিত ইবাদাতের বিশেষ দিনটা কিভাবে পালন করছে সেটার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এখন আসুন আমরা নিজেদের প্রশ্ন করি, আমরা কি জুমুআর দিনটাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিচ্ছি নাকি এটাকে একটা ছুটির দিন ভেবে যাবতীয় দুনিয়াবী কাজ বা বিশ্রামের কাজগুলো এই দিন সেরে নিচ্ছি?

এই ঘটনার এই স্পেসিফিক প্রয়োগ ছাড়াও একটা সামগ্রিক প্রয়োগ আছে যার চর্চা আমরা করতে পারি আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে। বনী ইসরাঈলরা এখানে মূলত কী করেছিল? তারা আল্লাহকে ফাঁকি দিতে চেয়েছিল..... তাই না?

এখন আমরা প্রশ্ন করতে পারি যে আমরা কি অনবরত ফতওয়া শপিং করে [4] আল্লাহকে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করি না? কতবার এমন হয়েছে যে পরিচিতদের স্ট্রাকচারডভাবে ইসলাম শিক্ষায় ব্যাপৃত হতে বলেছি, তারা বলেছেন তারা বেশী জানতে চান না, কারণ বেশী জানলে বেশী হিসাব দিতে হবে। আদতে কী হাস্যকর চিন্তা, তাই না? আল্লাহ্ কি জানেন না যে আমরা ইচ্ছা করে দ্বীন শিক্ষা করিনি? আল্লাহ্ কি আমাদের নিয়্যত, পরিস্থিতি এগুলো সম্পর্কে সম্যক অবগত নন?

এ কারণে কোনো একজন স্কলারের একটা লেখা পড়েছিলাম যে *Let's live our life on the basis of taqwa, not fatwa-* কথাটা খুব গভীর কিন্তু! খুঁজলে কিন্তু সব কিছুই জায়েজ করা ফতওয়াই পাওয়া যাবে, কিন্তু আমরা বনী ইসরাঈলদের মত আল্লাহকে ফাঁকি দিতে চাচ্ছি না তো?

[1] এ ব্যাপারে আরো বলা হয়েছে ২:৬৫-৬৬ এবং ৫:৫৯-৬০ তে।

[2] http://islamqa.info/en/14085

[3] তাই আমাদের উচিৎ ভাগ্যে বিশ্বাসের ব্যাপারে বিস্তারিত জানা। এ সংক্রান্ত একটা নোট লিখেছিলাম, তাক্বদীরে বিশ্বাসের স্বরূপঃ এটা কি কোনো গোলকধাঁধা? http://on.fb.me/1pphmmw

[4] এটার উপরও একটা নোট লিখেছিলাম-Fatwa Shopping-কার সাথে প্রতারণা করি আমরা?

http://on.fb.me/1omDavi

শিকড়ের সন্ধানে-১৫

আজকে থেকে আমরা যে কাহিনী জানা শুরু করবো, সেটা বনী ইসরাঈলদের ক্ষমতা অর্জনের ইতিহাস। [1] এটা মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পরের ঘটনা, যখন ৪০ বছর পার হয়ে গেছে। এই ৪০ বছরের অনেকগুলো ঘটনা আমরা জেনেছি, এর মাঝে অনেক পরিবর্তন এসেছে। প্রথমত, জেরুজালেমে প্রবেশের জন্য আল্লাহর দেয়া নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও অনেক বড় একটা পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। কেউ কি আন্দাজ করতে পারছেন সেটা?

এই ৪০ বছরে বনী ইসরাঈলদের প্রজন্মটা বদলে গেছে। মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যারা ফিরাউনের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে মিশর ছেড়ে এসেছিল তাদের অধিকাংশই এই সময়ের মাঝে মৃত্যুবরণ করেছে। মরুভূমির শুষ্ক ও প্রতিকূল আবহাওয়াতে বেড়ে উঠেছে এক সম্পূর্ণ নতুন প্রজন্ম যাদের ইসলামের উপলব্ধি ছিল বিশুদ্ধ ও ইসলামিক বিধি বিধান পালনের ব্যাপারে যারা ছিল চরম আন্তরিক। হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে এই সময়ে এমন একজনও বেঁচে ছিল না যারা বাছুর পূজা করেছিল। সর্বোপরি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই যে, তারা ছিল দাসত্বমূলক মনোভাব থেকে মুক্ত।

এই নতুন প্রজন্মকে নিয়ে ইউশা ইবনে নুনের নেতৃত্বে বনী ইসরাঈলরা জেরুজালেমে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়।

মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে আল্লাহ্ ইউশা ইবনে নুনকে পরবর্তী নবী এবং বনী ইসরাঈলদের নেতা হিসেবে মনোনীত করেন। বাইবেলে তিনি যশোয়া হিসেবে পরিচিত। [2] কুরআনে তাঁর কথা পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সূরা কাহফে, মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গী হিসেবে যিনি মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে গিয়েছিলেন খিদির আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জ্ঞান অর্জন করতে।

ইউশা ইবনে নুন বনী ইসরাঈলদের সাথে নিয়ে জেরুজালেম ও তার তৎসংলগ্ন এলাকা জয় করার উদ্দেশ্যে অভিযানে বের হন। যাওয়ার আগে তিনি বলেন তিন ধরণের লোক আমার সাথে যাবে না-

১) যে বিয়ে করেছে কিন্তু এখনো স্ত্রীর সাথে বিয়েটা কার্যকর করেনি

২) যে কোনো বাড়ির কাজে হাত দিয়েছে কিন্তু এখনো শেষ হয়নি

৩) যার কোনো উটনী বাচ্চা দেবার অপেক্ষায় আছে।

এই ঘোষণা দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে ইউশা ইবনে নুন যখন একদম জেরুজালেম জয়ের কাছাকাছি পৌঁছে গেছেন তখন আসরের ওয়াক্ত হয়ে যায়। আর একটু পরই যেহেতু সূর্যাস্তের সময় হয়ে যাবে এবং তাহলে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে, তাই ইউশা ইবনে নুন দুআ করেন যে সূর্যের অস্ত যাওয়া যেন দেরী করানো হয়, আল্লাহ্ তাঁর দুআ কবুল করেন এবং বনী ইসরাঈলরা হিক্সস গোত্রের সবাইকে পরাজিত করে জেরুজালেমে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। এটা ঘটে প্রায় ১২০০ খ্রিঃ পূর্বে: আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলদের নির্দেশ দিয়েছিলেন যে তাঁরা যেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে সিজদাহরত অবস্থায় শহরে প্রবেশ করে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি যে সামান্য কয়েকজন ছাড়া অধিকাংশ বনী ইসরাঈলরা জেরুজালেমে প্রবেশ করে উদ্ধত অবস্থায়, উল্লাস করতে করতে এবং আল্লাহ্ যা বলতে বলেছেন তা বিকৃত করে অন্য শব্দ উচ্চারণরত অবস্থায়। কুরআনে এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে-

আর যখন আমি বললাম, তোমরা প্রবেশ কর এ নগরীতে এবং এতে যেখানে খুশী খেয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে বিচরণ করতে থাক এবং দরজার ভিতর দিয়ে প্রবেশ করার সময় সেজদা করে ঢুক, আর বলতে থাক-'আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও'-তাহলে আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং সৎ কর্মশীলদেরকে অতিরিক্ত দানও করব। অতঃপর যালেমরা কথা পাল্টে দিয়েছে, যা কিছু তাদেরকে বলে দেয়া হয়েছিল তা থেকে। (২:৫৮,৫৯) [3]

যাই হোক এরপর ইউশা ইবনে নুন সব গণিমতের সম্পদ (যুদ্ধলব্ধ মালামাল) একত্র করেন। ওই সময় এই সম্পদ গ্রহণ করার অনুমতি যোদ্ধাদের ছিল না। [4] আকাশ থেকে একটা আগুন এসে সব সম্পদ পুড়িয়ে দিত, যেটা ছিল আল্লাহর দিক থেকে কবুল হওয়ার একটা চিহ্ন। কিন্তু এইসময় দেখা গেল যে আগুন আসলো, কিন্তু পুড়ে গেল না। তখন ইউশা ইবনে নুন বুঝতে পারলেন যে এখানে সব সম্পদ নেই, কিছু সম্পদ চুরি গেছে। তখন তিনি বললেন ১২ টি গোত্র থেকে একজন করে নেতা যেন এসে তাঁর হাতের উপর হাত রেখে ঘোষণা দেয় যে তাঁর গোত্রের কেউ চুরি করেনি। এমন করতে গিয়ে একটি গোত্রের নেতার হাত উনার হাতের সাথে আঠার মত লেগে গেল। তখন উনি বললেন যে তোমার গোত্রের কেউই চুরিটা করেছে। অতএব ঐ গোত্রের সবাইকে আলাদা আলাদা ভাবে ঘোষণা দিতে হবে। একইভাবে দুজন লোকের হাত উনার সাথে লেগে গেল,

উনি বুঝলেন যে এই দুজনই সেই দোষী। তখন তাদের কাছ থেকে চুরি করা স্বর্ণের পাত উদ্ধার করা হল এবং তারপর আকাশ থেকে আবার আগুনের গোলা এসে সব সম্পদ ধ্বংস করে দিল।

ইউশা ইবনে নুন মরুভূমি থেকে আসার আগে কিছু মূল্যবান জিনিস সাথে করে এনেছিলেন। তার মাঝে ছিল মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হওয়া তাওরাতের আসল খণ্ডগুলো, মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের লাঠি, মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হারুন আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবহৃত আরো কিছু জিনিসপত্র ইত্যাদি। এগুলো তিনি একটি তাবু গেঁড়ে সেখানে সযত্নে সংরক্ষণ করে রাখেন। বনী ইসরাঈলদের ইতিহাসে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যা Ark of the Covenant নামে সমধিক পরিচিত।

এরপর থেকে বনী ইসরাঈলরা এখানেই বসবাস করতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে তাদের অধিকৃত অঞ্চলের সীমানা বাড়াতে থাকে। ইউশা ইবনে নুন বেঁচে ছিলেন প্রায় ১৩০ বছরের [5] মত। এভাবে মোটামুটি ১৫০ বছরের মত বনী ইসরাঈলরা আল্লাহর বিধান মোটামুটিভাবে মেনে চলে। এরপর থেকে তাদের মাঝে কিছু দুরাচার দেখা যায়...

আমরা ইতিহাসের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে আগামী পর্বে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ, তার আগে উপরে বর্ণিত কাহিনী থেকে কিছু শিক্ষা গ্রহণের প্রয়াস চালাবো।

প্রথমতঃ আমরা খেয়াল করলে দেখবো যে বিশিষ্টতার বিচারে কিন্তু মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থান ইউশা ইবনে নুনের চেয়ে অনেক উপরে। অথচ তাঁর সময়ে কিন্তু বনী ইসরাঈল তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি। কেন?

এই ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে নেতা যেমনই হোক না কেন সাধারণ মানুষেরা যদি আল্লাহ্ ভীরু বা সৎ না হয়, তাহলে আল্লাহ্ ওই জাতিকে নেতৃত্ব বা ক্ষমতা দান করবেন না। আমরা গত পর্বগুলোতে দেখেছি যে বনী ইসরাঈলদের সাধারণ মানুষদের ইসলামের বুঝ এবং আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলার প্রবণতা কত কম ছিল। তাই আজকে যখন আমরা আমাদের মুসলিম শাসকদের গালাগালি করে, তাদের উপর সব দোষ চাপিয়ে দায়মুক্ত হতে চাইছি, তখন আমাদের বোঝা উচিৎ যে একজন ডায়নামিক লিডার অবশ্যই বিজয়ের জন্য অপরিহার্য কিন্তু সেটাই যথেষ্ট না। [6] শুধু বনী ইসরাঈলদের ইতিহাস না, আমাদের নিজেদের মুসলিমদের ইতিহাস পড়লেও আমরা দেখবো যে ক্রুসেডার বা তাতারদের আক্রমণ দ্বারা মুসলিম উম্মাহর অবস্থা যখন একদম বিধ্বস্তপ্রায়, ইসলামের নিশানা পৃথিবীর বুক থেকে মুছে যাওয়ার উপক্রম,

তখন আল্লাহ্ খুব ছোট কোনো গ্রুপের উত্থান ঘটিয়েছেন যারা ইসলামের ব্যাপারে জ্ঞান রাখতেন এবং আল্লাহর বেঁধে দেয়া সীমার ব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। সালাহ উদ্দিন আয়্যুবীর জীবনী পড়লে এটা স্বচ্ছ দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে..... সব ধরণের প্রলোভন থাকা সত্ত্বেও তিনি খিলাফাতের দাবী করেননি, যদিও তখন আব্বাসীদ খিলাফাত স্রেফ প্রতীকী চিহ্নের মত নামে মাত্রে বিরাজমান ছিল। অর্থ্যাৎ ক্ষমতার মোহ থেকে তিনি ছিলেন মুক্ত।

দ্বিতীয়তঃ এই যে প্রজন্মটার কথা আমরা বলছি যারা মরুভূমিতে বেড়ে উঠেছিল, তাদের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁরা বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত ছিল না। আমরা যত বিলাসী জীবনে অভ্যস্ত হবো, তত জীবনের প্রতি পিছুটান আমাদের বাড়বে, আমরা আল্লাহর রাস্তায় ত্যাগ করতে অপারগ হয়ে যাবো।

এই কারণেই আমরা যদি ইউশা ইবনে নুনের দেয়া নির্দেশগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করি, তাহলে উপলব্ধি করবো যে ওই বৈশিষ্ট্যগুলো আসলে ইঙ্গিত করে যে ওই লোকের মন পড়ে আছে দুনিয়ার দিকে। আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধে জয়লাভ তাদেরকে দিয়ে হবে না যারা এখনো দুনিয়ার প্রতি আসক্ত। বাড়ি গাড়ি, পরিবার তথা ধন-জনের প্রতি দুর্বলতা যারা কাটিয়ে উঠতে পারেনি, তারা যদি সেনাবাহিনীতে থাকে তাহলে বরং তারা একটা সামগ্রিক বিপর্যয় ডেকে আনবে যেমনটা ঘটেছিল ওহূদের যুদ্ধের সময়। মাত্র হাতে গোণা কয়েকজন গণীমতের সম্পদের প্রতি আকর্ষণ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় যে যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় ছিল নিশ্চিত, সেখানে যুদ্ধের মোড় আশ্চর্যজনকভাবে ঘুরে গিয়েছিল এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ৭০ জন সাহাবীর শাহাদাতের ঘটনা ঘটেছিল। এই ঘটনার পর উমার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মন্তব্য করেছিলেন যে আমাদের মাঝে যে কারো দুনিয়ার প্রতি মোহ আছে তা এই উহুদের ঘটনা না ঘটলে আমি বুঝতাম না।

তৃতীয়তঃ আরো একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা দৃষ্টি আকর্ষণের দাবীদার সেটা হচ্ছে এই প্রজন্ম বেড়ে উঠেছে জেরুজালেম জয়ের বাসনা বুকে নিয়ে, তাদের মাঝে দাসত্ব প্রবৃত্তি ছিল না। অথচ তাদেরই পূর্ব পুরুষদের আমরা দেখেছি ফিরাউনের কবল থেকে বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়াতে ওদের যত কষ্ট করতে হয়েছে তাতে তারা ছিল বিরক্ত, তারা খুব বেশী করে মিস করছিল মিশরের খাদ্যাভাস ..... তথা ওই বঞ্চনার জীবনেই ওরা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ওরা কোনো তাগিদ অনুভব করত না.....।

এই জায়গাটায় এসে আমাদের নিজেদের দিকে তাকানো উচিৎ। আমরা এই যে পদলেহনকারী অবস্থায় আছি, কুকুর বিড়ালের মত মরছি এই পরিস্থিতি থেকে কি আসলেই বেরিয়ে আসতে চাই? আমরা জীবনে কী স্বপ্ন দেখি? আমরা কি visionary হতে পেরেছি? আমরা কি চিন্তা করি যে এই দুর্নীতিগ্রস্ত সামাজিক ব্যবস্থা, সুদ ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন আসবে আমাকে দিয়েই? নাকি প্রাত্যহিক জীবনের পুনরাবৃত্তির আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে একসময় মৃত্যু হবে এটাই মেনে নিয়েছি, যে জীবন কী না চার পেয়ে প্রাণীদের চেয়ে খুব একটা ভিন্ন কিছু নয়?

এই প্রশ্ন রেখে (reminder to myself first) আজকের পর্বের সমাপ্তি টানছি, আরো শিক্ষা নিয়ে আগামী পর্বে আলোকপাত করবো ইনশাল্লাহ।

[1] আজ থেকে যে ঘটনা প্রবাহ আমরা জানবো তা বিশেষ মনোযোগের দাবীদার। কারণ আমাদের আজকের সময়ের জন্য তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

[2] বাইবেলে উনাকে দেখানো হয়েছে একজন খুব নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক হিসেবে যিনি জেরুজালেম অধিকারের পর নির্বিচারে সেখানকার অধিবাসী এমনকি পশুপাখিদের হত্যা করেন। আমরা আগেও বলেছি যে বাইবেলে বিভিন্ন নবীদের ভয়ংকর সব পাপ যেমন যিনা, মদ্যপান এমন কি শিরকেরও অপবাদ দেয়া হয়েছে যাতে তাদের নিজেদের পক্ষে সাফাই গাওয়া সহজ হয়। তাই নিঃসন্দেহে ইউশা ইবনে নুনকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে তা সত্যের অপ্রলাপ বৈ আর কিছু নয়।

[3] আরো বলা হয়েছে ৭:১৬১-৬২ তে

[4] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাতই একমাত্র যাদের গণিমাতের সম্পদ গ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।

[5] তখন মানুষের গড় আয়ূই ছিল একশর উপরে।

[6] এজন্য একটা কথা আমার খুব ভালো লাগে- If we want to have a leader like Abu Bakar (RA), we need to be followers like Umar RA. Are we?

শিকড়ের সন্ধানে-১৬

গত পর্বে আমরা আলোচনা করছিলাম বিজয়ের পূর্ব শর্তগুলো নিয়ে। কথা হচ্ছিল আমাদের মানসিক দারিদ্রতা ও দাসত্বমূলক মনোভাব নিয়ে। সাম্প্রতিক সময়ে আমি আমাদের মুসলিমদের ইতিহাসে মাইলফলক হিসেবে পরিচিত এমন বিভিন্ন ঘটনাগুলোর আদ্যপান্ত নিয়ে পড়ছি। যেমন ক্রুসেডারদের আক্রমণ, মঙ্গোলদের আক্রমণ, মুসলিম স্পেনের উত্থান ও পতন, মুসলিমদের কন্সট্যান্টিনোপোল বিজয় ইত্যাদি। এগুলো পড়তে গিয়ে একটা বিষয়ে আমি সন্দেহাতীতভাবে নিশ্চিত হয়েছি যে বিজয় লাভের একটা খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হচ্ছে 'মানসিকতা' তথা 'অন্তরের অবস্থা'।

আল্লাহ্ সূরা হাশরে ইহুদীদের একটি দূর্গ অবরোধ করে রাখার পর মুসলিমদের অপ্রত্যাশিতভাবে জয়লাভের কারণ হিসেবে বলেছেন-'আল্লাহ তাদের (ইহুদীদের) অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করে দিলেন' (৫৯:২) অর্থ্যাৎ আল্লাহ্ যখন যে দলের মানুষের অন্তরে ভয়ের সৃষ্টি করে দেন, সেই দল সব সময় পরাজিত হয়। এই জন্য আপনি যদি সাহাবীদের পারস্য, রোমান সাম্রাজ্যের সাথে যুদ্ধের কাহিনী পড়েন, তাহলে মনে হবে তা যেন রুপকথাকেও হার মানাচ্ছে। তাদের এমন অভাবনীয় সাফল্যের কারণ ছিল একটাই- তাঁরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে ভয় পেতেন না। (৯৮:৮) পক্ষান্তরে মঙ্গোলরা যখন মুসলিমদের আক্রমণ করে (যে ঘটনা ইতিহাসে Sack of Bagdad নামে সমধিক পরিচিত), তখন এমন ঘটনা ঘটেছে যে একজন মঙ্গোল একজন মুসলিমকে হাতের কাছে পেয়েছে, কিন্তু হত্যা করার জন্য তার কাছে কোনো অস্ত্র ছিল না, তখন সে ঐ মুসলিমকে বলেছে সে যেন মাথা নিচু করে থাকে যতক্ষণ না সে একটা তলোয়ার খুঁজে এনে তাকে হত্যা করছে এবং সত্যি সত্যিই ওই মুসলিম ওভাবেই থেকেছে এবং ঐ লোক একটা অস্ত্র এনে তাকে হত্যা করেছে। সুবহানাল্লাহ! ভাবা যায়?

আল্লাহ্ মুসলিমদের অন্তরে মঙ্গোলদের ব্যাপারে এমনভাবে ভয় সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন আর মঙ্গোলদের মধ্য থেকে মুসলিমদের ব্যাপারে ভয় এমনভাবে সরিয়ে দিয়েছিলেন [1] যে এটা খুব স্বাভাবিক একটা ঘটনা হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। শুধু তাই না, মঙ্গোলদের বাহিনী দেখে ভয়ে বুখারা (ইমাম বুখারীর শহর), সামাকান্দ এসব শহর থেকে হাজার হাজার সৈন্যবাহিনী পিছু হটে ছিল সাধারণ মানুষদের অসহায় ফেলে রেখে। ফলে বাড়ির পুরুষদের চোখের সামনে নারীদের সম্মানহানি করা হয়েছে.....নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে সবাইকে। এমনকি মসজিদে ওরা গান বাজনা এবং নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। অথচ শহরের স্কলার এবং মুরুব্বীরা বেরিয়ে এসে তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। আমি যখন এই কাহিনী শুনছিলাম, প্রথমে খুব অবাক

লাগছিল। কারণ তখন এমনিতে খিলাফাতের রুগ্ন দশা থাকলেও বাইরের বিশ্বের কাছে তা প্রবল পরাক্রমশালীই ছিল, মুসলিমদের কাছেই ছিল সব জ্ঞান-বিজ্ঞান আর সভ্যতা [2]।

তাহলে আমরা বুঝলাম যে আমরা যতই মনে করি যে আজকাল আমরা জ্ঞান বিজ্ঞানে পিছিয়ে আছি বলেই আমাদের এই দৈন্যদশা, তাহলে সেই কথাটা আংশিক সত্যি। আল্লাহর ভয়কে সবার উপরে স্থান দেয়ার জন্য আমাদের দরকার তীব্র ঈমানী শক্তি, যেটার আমাদের সবচেয়ে অভাব। তাই ইহুদীদের দেখাদেখি আমরা যদি মনে করি নোবেল প্রাইজ পাওয়ার মধ্যে আর আর্থিক উন্নতি অর্জনেই সমাধান, তবে সেটা হবে একটা ভুল সমীকরণ। [3] আমাদের অবশ্যই টেকনিক্যাল স্কিল অর্জন করতে হবে কারণ সাহাবাদের যুদ্ধ জয়ের ক্ষেত্রে অসাধারণ সমর কৌশল গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক ছিল, কিন্তু সেটাই মূল কারণ ছিল না। [4] আবারো বলছি মূল নিয়ামক ছিল অন্তরের অবস্থা।

তাই আমাদের উচিৎ বিজয়ের কথা ভাবার আগে নিজেদের অন্তরের অবস্থা যাচাই করে দেখা। আমরা কি অবিশ্বাসীদের শক্তিকে ভয় পাই?

চতুর্থতঃ

'বিজয়' আসলে কার পক্ষ থেকে আসে? যখন বিজয় আসে, তখন আমাদের প্রতিক্রিয়া কী হওয়া উচিৎ? কেন আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলয়দের ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে জেরুজালেমে প্রবেশ করতে বলেছিলেন? আমরা খেয়াল করলে দেখবো যে এই নির্দেশ নতুন কিছু নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ হুবহু একই নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেটা আমরা অনেকেই নিয়মিত নামাযে পড়ি, ছোট সূরা হিসেবে.....আন্দাজ করতে পারেন যে সূরাটা কী?

সূরা নাসর।

এখান থেকে আমরা বুঝি যে বিজয় যখন আসে, তখন আমাদের সবার প্রথমে স্বীকার করে নিতে হবে যে বিজয় আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে, একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকেই। তাই এটা আমাদের চাইতেও হবে এক আল্লাহরই কাছে, আর আসার পর সবার প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করতে হবে, নিজেদের সাফল্য মনে করে উল্লসিত হওয়া যাবে না, আর সেইসাথে আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। কিন্তু আল্লাহর ক্ষমা প্রার্থনার সাথে বিজয়ের সম্পর্ক কী?

যোগসূত্রটা হচ্ছে সামষ্টিক ও ব্যক্তিগত লেভেলের মাঝে।

প্রশ্ন হচ্ছে ইসলামের যদি বিজয় ঘটে সামগ্রিকভাবে, তাহলে ব্যক্তি আমার বিজয় কি নিশ্চিত হয়ে যায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে? আগের পর্বে উল্লেখ করা আয়াতটা আবার খেয়াল করি...যদি বনী ইসরাঈলরা এভাবে প্রবেশ করতো শহরে, তাহলে তাদের ক্ষমা করে দেয়া হত অর্থ্যাৎ যদিও আমাদের চর্মচক্ষু অনুযায়ী বনী ইসরাঈলয়দের বিজয় ঘটেছিল, ওদের মাঝে অনেকে ছিল যাদেরকে আল্লাহ্ ক্ষমা

করেননি! এখন আল্লাহ্ যদি আমাদের ক্ষমাই না করেন তাহলে এই বিজয়ে আমাদের কী লাভ? এজন্য আমার একটা লেকচারে শোনা একটা কথা খুব ভালো লাগে- ইসলাম আল্লাহর দ্বীন, এটার বিজয় হবে এটাই আল্লাহর ওয়াদা। কিন্তু সেই বিজয় যদি ঘটে আর আমি যদি তাতে দর্শক হয়ে থাকি আর জাহান্নামে যাই, তবে সেই বিজয় আমার জন্য কোনো কল্যাণ বয়ে আনবেনা। অন্যদিকে আমার জীবদ্দশায় যদি ইসলাম পরাজিত শক্তিও হয়ে থাকে, আর আমি আমার সাধ্যের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করার জন্য আল্লাহর ক্ষমা পেয়ে যাই, তাহলে সেটাই আমার জন্য 'প্রকৃত বিজয়'। আমি এই বিজয় মিছিলে দর্শক নয়, সক্রিয় সৈন্য হয়ে থাকতে চাই।

এজন্য আমাদের সবার দুআ করা উচিৎ- O Allah you choose me to serve your Deen and select me as an active soldier, not passive audience! [5]

পঞ্চমতঃ

বনী ইসরাঈলরা শুধু যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে করতে সিজদারত অবস্থায় ঢোকার নির্দেশ অমান্য করেছিল তাই না, তারা আল্লাহ্ যা বলতে বলেছিলেন, সেটাকে জিহবা দিয়ে বিকৃত করে এমনভাবে বলছিল, যাতে শুনলে মনে হয় তারা আল্লাহ্ যা বলতে বলেছেন সেটাই বলছে, যদিও আসলে তারা ব্যঙ্গ করে ধৃষ্টতামূলক অন্য শব্দ বলছিল।

এখন ইহুদীদের এই অভ্যাসটা কিন্তু আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ও দেখতে পাই। কুরআন আমাদেরকে সরাসরি জানাচ্ছে এই বিষয়টা। একটু পড়ি এ সংক্রান্ত আয়াতটা-

কোন কোন ইহুদী তার লক্ষ্য থেকে কথার মোড় ঘুড়িয়ে নেয় এবং বলে, আমরা শুনেছি কিন্তু অমান্য করছি। তারা আরো বলে, শোন, না শোনার মত। মুখ বাঁকিয়ে দ্বীনের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের উদ্দেশে বলে, রায়েনা' (আমাদের রাখাল)। অথচ যদি তারা বলত যে, আমরা শুনেছি ও মান্য করেছি এবং (যদি বলত) শোন এবং আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ, তবে তাই ছিল তাদের জন্য উত্তম আর সেটাই ছিল যথার্থ ও সঠিক। কিন্তু আল্লাহ তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন তাদের কুফরীর দরুন। অতএব, তারা ঈমান আনছে না, কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক। (৪:৪৬)

হে মুমিন গণ, তোমরা 'রায়িনা' বলো না-'উনযুরনা' বল এবং শুনতে থাক। আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। (২:১০৪)

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওরা আরবীতে 'রায়িনা' বলতো, যেটার অর্থ আসলেই আমরা মেনে নিলাম। কিন্তু ওদের মনে ছিল হিব্রুতে এই শব্দের অর্থ যেটা, সেটা, অর্থ্যাৎ 'আমাদের

রাখাল'। যারা এমনিতে শুনছে, তারা কিন্তু বুঝবে না সমস্যাটা কোথায়। তাঁরা সরল হৃদয়ে বিশ্বাস করবে এটাই স্বাভাবিক। তাই আল্লাহ্, যিনি অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত, তিনি মুসলিমদের জানিয়ে দিলেন ওদের মনের কথা এবং নির্দেশ দিলেন 'উনযুরনা' বলতে যা আরবীতে আগেরটির প্রতিশব্দ, কিন্তু অনুরূপ উচ্চারণের কোনো শব্দ হিব্রু ভাষায় নেই।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসেও আমরা দেখি যে তারা উনাকে দেখে আস সালামু আলাইকুম না বলে জিহবার কারুকাজ করে বলতো 'আস সামু আলাইকা' যার অর্থ ছিল May Death Upon you রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা বুঝতে পেরেও না বোঝার ভান করতেন, উনার স্বভাব সুলভ শান্ত এবং সহনশীল ভঙ্গীতে Technically প্রতি উত্তর দিতেন ওয়াআলাইকুম, মানে তোমার উপরেও অর্থ্যাৎ তোমার উপরেও তাই বর্ষিত হোক যেটা তুমি আমার উপরে চেয়েছো .

এখন এইখানে আমাদের একটা দারুণ বিষয় শেখার আছে। আমাদের কি মনে হয় যে কেন আল্লাহ্ এই বিষয়টা

কুরআনে বারবার উল্লেখ করলেন? আল্লাহ্ আমাদের শিখাচ্ছেন যে ইহুদীরা মুখে যা বলে তা তাদের মনের কথা নয়! আমরা যদি কুরআন থেকে ইহুদীদের এই স্বভাবটা শিখতাম, তাহলে কি আমরা ওদের সাথে কোনো চুক্তি করে ওদের বিশ্বাস করতাম? কিন্তু আমরা যে কুরআনের শিক্ষা থেকে অনেক দূরে! তাইতো ইতিহাস সাক্ষী যে আমরা বারবার ওদের বিশ্বাস করে ঠকেছি। বনী ইসরাঈলদের কাহিনী শেষ করার পর ইনশাল্লাহ আমার পরিকল্পনা আছে ইসরাঈল রাষ্ট্রের কিভাবে জন্ম হল সেটার উপর একটা ধারাবাহিক নোট লেখার। সেখানে আমরা দেখবো যে কিভাবে 'ব্যালফ্লোর ডিক্লেরাশন' এর মাধ্যমে ওরা আমাদের সাথে কথার খেলা খেলেছিল, ঠিক একইভাবে!

এই ঘটনা থেকে শিক্ষা ছিল এইটুকুই। আগামী পর্ব থেকে আমরা ইনশাল্লাহ বনী ইসরাঈলদের পরবর্তী ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিবো।

[1] এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুস্পষ্ট হাদীস আছে- Thawdan (RAT) narrated "Allah's Messenger, peace and blessings be upon him, said, 'Imminently, there will come a time when the nations gather against you, just as people gather around a feast.' A man said, 'Will it be because we are few at that time, O Allah's Messenger?' He responded, 'No, you will be

numerous in those times, but you will be as useless as the scum of the sea, and Allah will remove the fear that your enemies used to posses from you from their chests, and He will place al-Wahn in your hearts', it was said, 'What is al-Wahn?', he responded, 'Love of life, and hatred of death.'" [Ahmad, Abu Dawud] এটা নিয়ে ইয়াসি ক্বাদীর খুব সুন্দর একটা ভিডিও ক্লিপ আছে, শুনে দেখতে পারেন

- https://www.youtube.com/watch?v=iK5_riVgNnw

[2] যেমন আমরা অনেকেই জানি না আমেরিকা তার পতনের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে, তবু আমরা একেই সুপার পাওয়ার ভাবি।

[3] পরক্ষণেই মনে পড়লো বার্মার কথা, ভারতের কথা.....ওখানে কি একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটছে না? আমাদেরই সময়ে?

[4] উম্মাহর উত্থান পতনে টেকনিক্যাল স্কিল ও স্পিরিটুয়ালিটির মাঝে ভারসাম্যের ব্যাপারে এই লেকচারটা শোনা যেতে পারে- https://www.youtube.com/watch?v=4dEvEFBpVjg

[5] Victory র সংজ্ঞা জানতে এই লেকচারটা শুনে দেখতে পারেন-

https://www.youtube.com/watch?v=WwgtOWApFeg

শিকড়ের সন্ধানে-১৭

আগের পর্বে আমরা পর্যালোচনা করেছি বনী ইসরাঈলদের পবিত্র ভূমিতে প্রবেশের ঘটনাটি। সাথে এও উল্লেখ করেছি যে প্রথম বেশ কিছু বছর তারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করেছিল। আজ থেকে আমরা এর পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ। এখানে একটা কথা বলে নেয়া জরুরী যে এই সিরিজে আমরা ঘটনার যে ক্রম উল্লেখ করছি সেটা শেখ উমার সুলাইমানের বনী ইসরাঈলদের কাহিনীর উপরে একটা লেকচার সিরিজ অনুসারে লেখা হচ্ছে। [1] উনি ওখানে সব ঘটনার রেফারেন্স উল্লেখ করেননি। পরে আমি দেখেছি যে অধিকাংশ কাহিনী আসলে তাফসীর ইবনে কাসীর থেকে নেয়া। আমরা জানি যে তাফসীর ইবনে কাসীরে অনেক সময় ইসরালিয়াত (বনী ইসরাঈলদের থেকে প্রাপ্ত উদ্ধৃতি) দেয়া হয়েছে। এ সংক্রান্ত মূলনীতিটা হচ্ছে যদি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সাথে সাংঘর্ষিক না হয়, তাহলে এতে কোনো ক্ষতি নেই। আমি শেখ উমার সুলাইমানের লেকচার সিরিজ ছাড়াও মুফতি মেনেকেরটা [2] শুনে দেখেছি। দুটো সিরিজে উল্লেখিত কাহিনীর ক্রমের মাঝে আমি পার্থক্য পেয়েছি। কিন্তু আমি আগেও বলেছি, আবারো বলছি, যা কিছুর বিস্তারিত উল্লেখ করা আল্লাহ্ প্রয়োজন মনে করেননি, তাই আদতে আমাদের জানা জরুরী নয়। যদি জরুরী হত, তাহলে আল্লাহ্ অবশ্যই কুরআন বা সহীহ সুন্নাহর মাধ্যমে আমাদের জানিয়ে দিতেন। তাই আমরা ইনশাল্লাহ ঘটনার ক্রম বা বিস্তারিত বিবরণের দিকে মনোযোগী না হয়ে ঘটনা থেকে কী শিক্ষা নেয়া যায় সেটার দিকে আলোকপাত করবো।

আমাদের হয়তো মনে আছে যে বনী ইসরাঈলদের মাঝে ১২টা গোত্র ছিল যারা ছিল ইয়াকুব আলাইহি ওয়াসাল্লামের ১২ জন ছেলের বংশধর। এই ছেলেদের মাঝে ১০ জন ছিলেন এক মায়ের, বাকী ২ জন, ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বিন ইয়ামিন ছিলেন আরেকজন মায়ের। এদের দুজনের প্রতি বাকিদের যে প্রচণ্ড ঈর্ষাবোধ কাজ করতো এটা আমরা আগে থেকেই জানি, হিংসা থেকেই ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তারা এহেন আচরণ করেছিল। পরবর্তীতে আল্লাহ্ ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিভাবে সম্মানিত করেন এই কাহিনীও আমরা সবাই জানি। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে শয়তান তার কুটকৌশল দিয়ে আল্লাহর নবীর ঘরের ভেতরও অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে। আমরা কেউই আসলে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে নিরাপদ নেই। আজকের সোশ্যাল মিডিয়ার যুগের ঘরের কথা পরে জানা যখন পানির মত সহজ হয়ে গিয়েছে, তখন এই হিংসা উদ্রেক হওয়ার ব্যাপারটা আমাদের সবার মাথায় রাখা উচিৎ। [3]

যাই হোক, ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বিন ইয়ামিনের প্রতি অন্যদের যে একটা সূক্ষ্ম বিতৃষ্ণা বা ক্ষোভ ছিল, সেটা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরেও অব্যাহত থাকে। এতদিন হয়তো চাপা ছিল, কিন্তু নিজেরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর তা কদর্যরূপে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তবে ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরবর্তীতে ক্ষমতা লাভ করায় তাঁর বংশধরদের তারা আর কিছু বলার সাহস পেত না। বাকি থাকল শুধু একজন। তাই দেখা যায় যে বিন ইয়ামিনের গোত্রের উপর তারা কারণে অকারণে নানা ধরণের অত্যাচার করতে থাকে। এই যে নিজেদের মাঝে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যাওয়া, এটা আসলে যে কোনো জাতির ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাওয়ার প্রথম ধাপ। আমরা আজকের মুসলিমরা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যখন আমরা কোনো বহিঃশত্রু দ্বারা আক্রান্ত হই, তখন আমরা সাময়িকভাবে ঠিকই নিজেদের মাঝে বিভেদ ভুলে যেতে পারি, কিন্তু পরিস্থিতি একটু স্বাভাবিক হলেই আমাদের নিজেদের মাঝে শতধা বিভক্তি, বিদ্বেষ সব প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

তৎকালীন বনী ইসরাঈলদের মাঝে আরো যে একটা বৈশিষ্ট্য মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, সেটা হল ‘Chosen People’ এর কন্সেপ্টটাকে নিজেদের একচ্ছত্র এবং জন্মগত অধিকার মনে করা। তারা ওদের অধীনস্থ ব্যক্তিদের ‘জেন্টাইল’ হিসেবে অভিহিত করতো এবং মনে করতো যে ওদের সম্পদ কেড়ে নেয়া বৈধ। এই একই ধারণা আজকের ইহুদীদের মাঝেও পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। বস্তুত, আজকে প্যালেস্টাইনে আমরা যে নির্বিচার গণহত্যা দেখি, তা আদতে ওদের এই মানসিকতারই ফসল। ওরা মনে করে ওরা যাই করুক না কেন সেটার ঐশী বৈধতা রয়েছে এবং অন্য সব মানুষ, যারা ইহুদী নয় তাদের সাথে যা খুশী করার অধিকার তাদের রয়েছে।

আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো যে ইহুদীরা বারবার বিভিন্ন স্থান থেকে বিতাড়িত হয়েছে, সেখানকার ক্ষমতাসীনদের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছে। এই ব্যাপারটা আজকাল তারা খুব মর্মস্পর্শী করে উপস্থাপন করে এবং এটাকেই তাদের নিজস্ব বাসভূমি (ইসরাঈল) প্রতিষ্ঠার পেছনে যুক্তি হিসেবে তুলে ধরে। কিন্তু আমাদের জানতে হবে ঘটনার আদ্যপান্ত। আল্লাহ্ আমাদের কুরআনের মাধ্যমে জানিয়েছেন যে ইহুদীরা তাদের উপর নাযিলকৃত ঐশী কিতাব বিকৃত করেছে। এই বিকৃতির একটা উদাহরণ হচ্ছে-আল্লাহ্ ইহুদীদের নিজেদের মধ্যে সুদের ভিত্তিতে লেনদেনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। ওরা সেটা পরিবর্তন করেছিল এইভাবে যে ইহুদীরা নিজেদের মধ্যে এই কাজ করতে পারবে না, তবে অইহুদীদের সাথে করতে পারবে। ওই যে নিজেদের বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ভাবা, সেখান থেকেই ওরা ভাবতো নিয়ম কানুন ওদের জন্য একরকম, আর অন্য সবার জন্য আরেকরকম। আজো ওদের গ্রন্থেই আমরা প্রমাণ পাই-

"**To a foreigner you may charge interest,** but to your brother you shall not charge interest, that the LORD your God may bless you in all to which you set your hand in the land which you are entering to possess. (Deuteronomy 23:19, 20)

ইতিহাস সাক্ষী যে এজন্য ইহুদীরা যেখানেই যেত, সেখানেই তাদের অধিবাসীদের সাথে সুদের কারবার শুরু করতো। এজন্য কুরআনে সুদ সংক্রান্ত যে কয়টি আয়াত নাযিল হয়েছে তার মাঝে একটা হচ্ছে ইহুদীদেরকে এই কাজের জন্য তিরষ্কার করে। [4] আমরা যারা শেক্সপিয়ারের মার্চেন্ট অব ভেনিস পড়েছি তাদের হয়তো মনে আছে যে উপন্যাসের ভিলেন ছিল একজন ইহুদী। আমরা এখন একটা অদ্ভুত সময়ে বাস করছি যখন মানুষ সুদের সাথে লেনদেনকে কিছু মনে করে না। কিন্তু এমনটি কখনোই ছিল না, সবসময়ই সমাজে সুদখোররা খুব ঘৃণিত হত। ফলে ইহুদীদের আসলে সব জায়গা থেকে বের করে দেয়া হত তাদের এই সুদী কার্যক্রমের কারণে। কিন্তু তারপরও আসলে ওদের স্বভাব বদলায়নি, ওরা আজো পৃথিবীর সব মাল্টি ন্যাশনাল ব্যাংকগুলোর মূল প্রতিষ্ঠাতা।

আমাদের মুসলিমদের মাঝেও আজকাল এই প্রবণতা দেখা যায়, মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেই আমরা জান্নাতের টিকেট পেয়ে গেছি এটা মনে করি। বিস্ময়কর হলেও সত্য যে আপনি যদি Islamqa নামক ফতওয়ার ওয়েবসাইটটা একটু ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখেন, আপনি এমন একাধিক প্রশ্ন পাবেন যেখানে জানতে চাওয়া হয়েছে যে হারাম জিনিস যেমন মদ, শুকরের মাংস এগুলো অমুসলিমদের কাছে বিক্রি করা বৈধ কী না![5] যদি আল্লাহর আইনের ব্যাপারে তোয়াক্কা নাও করি, আমাদের কমন সেন্স থেকেই বুঝতে পারি যে এভাবে ব্যাপারটার প্রতি সংবেদনশীলতা নষ্ট হয়ে যায় এবং নিজেরাও একসময় এই কাজে অভ্যস্ত হয়ে যাই, ঠিক যেমনটা হয়েছে ইহুদীদের ক্ষেত্রে।

ইহুদীরা এই সময় আরো একটা কাজ করতো, সেটা হচ্ছে ওরা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতো না। মানে ওদের মাঝে ধনী বা ক্ষমতাশীল কোনো ব্যক্তি যদি কোনো অপরাধ করতো, তাহলে তারা সেটা এড়িয়ে যেত, কিন্তু গরীব, অসহায় কেউ করলে সাথে সাথে শাস্তি প্রয়োগ করতো। এজন্য আমরা দেখতে পাই যে একই কাজ যখন মদীনাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীরা করার উপক্রম করেছিল, তখন উনি কি ভয়ংকর রেগে গিয়েছিলেন! বুখারী শরীফের হাদীসে আছে যে একবার বনী মাখযূম গোত্রের উচ্চ বংশীয় এক মহিলা চুরি করেছিল, তখন

সবাই উসামা বিন যায়িদকে গিয়ে অনুরোধ করেছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে সুপারিশ করার জন্য। উসামা বিন যায়িদকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনিতে খুব পছন্দ করলেও এই কথা উনি বলতেই উনি রাগান্বিত হয়ে বলেছিলেন যে আমার মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করে, তাহলে আমি তাঁর হাত কেটে দিবো। বলে তিনি বনী ইসরাঈলদের কথা বলেছিলেন যে ওদের এহেন আচরণ ওদের ধ্বংসের একটা কারণ।

এখন এই জায়গায় আমাদের একটা বিষয় খুব গভীরভাবে ভাবতে হবে। আমরা আজকাল খুব মনঃকষ্টে ভুগি যে আমরা মুসলিমরা বিশ্বের সুপার পাওয়ার নই। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে আমরা এখনো কিন্তু আমাদের ছোট ছোট পরিমণ্ডলে ঠিকই ক্ষমতাসীন। একজন স্বামী তার পরিবারের ব্যাপারে, একজন মা তাঁর সন্তানদের ব্যাপারে, গৃহকর্ত্রী তাঁর বাড়ির কাজের লোকদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল। আমরা কি এদের সাথে সুবিচার করতে পারি? যদি এই ছোট্ট বলয়েই আমরা না করতে পারি, তাহলে আমাদের এই স্বভাব নিয়ে আরো বড় পরিসরে গিয়ে আমরা কি আল্লাহর দ্বীনের মর্যাদা সমুন্নত করবো নাকি ভূলুণ্ঠিত করবো? আমরা যখন ক্ষমতায় আছি, তখন যদি আমরা নিজেদের মাঝে এবং আমাদের অধীনস্থ যারা আছে তাদের সাথে ন্যয় বিচার স্থাপন করতে না পারি, তাহলে কি আমাদের আরো ক্ষমতায় যাওয়া সাজে?

এরপর থেকে ক্ষমতায় না থাকার জন্য হা হুতাশ করার আগে অবশ্যই আমাদের এটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা উচিৎ। ফিরে আসছি ঘটনার বিবরণে।

বনী ইসরাঈলরা যখন এইভাবে নিজেদের মাঝে বিভক্ত ছিল এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করছিল, তখন আল্লাহ্ আবার বহিঃ শত্রুদের তাদের উপরে শক্তিশালী করে দিলেন। আশেপাশের গোত্রের ওরা এসে বনী ইসরাঈলদের পবিত্র ভূমি থেকে তাড়িয়ে দিলো এবং তারা ইরাক, শাম, তুরস্ক ইত্যাদি নিকটবর্তী স্থানগুলোতে প্রাণ ভয়ে পালিয়ে যেতে থাকলো।

বনী ইসরাঈলদের কাহিনী থেকে খুব সম্ভবত এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় শিক্ষণীয় বিষয়। কখন ইসলামের শত্রুদের আল্লাহ্ মুসলিমদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী করে দেন?

যখন আমরা আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকি.....ইসলামের শত্রুদের কাজই ইসলামের বিরুদ্ধে লাগা। কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে সাফল্য আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে, তাই আল্লাহ্ ওদের সাফল্য দেন তখনই, যখন উনি আমাদের উপর অসন্তুষ্ট থাকেন। ভেবে দেখুন, মুনাফিক্ব কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় ছিল না? ইহুদীরা কি তখনও ছিল না? তবে তখন কিভাবে তাঁরা বিশ্ব জয় করেছেন আর আমরা আজ কুকুর বিড়ালের মত মরছি?

[1] http://ilmflix.com/course/lost/

[2] https://www.youtube.com/watch?v=8iF6keTIx2c

[3]https://www.facebook.com/video.php?v=634752693308441&set=vb.124021824381533&type=2&theater

[4] বস্তুতঃ ইহুদীদের জন্য আমি হারাম করে দিয়েছি বহু পূত-পবিত্র বস্তু যা তাদের জন্য হালাল ছিল-তাদের পাপের কারণে এবং আল্লাহর পথে অধিক পরিমাণে বাধা দানের দরুন। আর এ কারণে যে, তারা সুদ গ্রহণ করত, অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে, তারা অপরের সম্পদ ভোগ করতো অন্যায় ভাবে। বস্তুত; আমি কাফেরদের জন্য তৈরী করে রেখেছি বেদনাদায়ক আযাব। (৪:১৬১-৬২)

[5] http://islamqa.info/en/40651

শিকড়ের সন্ধানে-১৮

গত পর্বে আমরা বলেছিলাম যে বনী ইসরাঈলদের উপর আল্লাহ্ বহিঃশত্রুদের শক্তিশালী করে দিয়েছিলেন। গাজা ও আসক্কালানদের মাঝে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বনী ইসরাঈলরা পবিত্র ভূমি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। এই যুদ্ধেই Ark of the covenant (১৫ তম পর্ব দ্রষ্টব্য) ও তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়। কথিত আছে যে, এই খবর শুনে বনী ইসরাঈদদের তৎকালীন রাজা শোকে মারা যান। এরপর থেকে যদিও বনী ইসরাঈলদের মাঝে আল্লাহ্ অনেক নবী পাঠিয়েচ্ছিলেন, কিন্তু বহুদিন তারা নেতৃত্বশূন্য অবস্থায় ছিল।

শুধু পবিত্র ভূমি থেকে বিতাড়নই না আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে আরো একটি বড় শাস্তি দেয়া হয়, সেটা হচ্ছে ওরা যেখানে আশ্রয় নিয়েছিল, সেখানে এক মহামারী আকারে প্লেগ দেখা যায়। মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে দলে দলে বনী ইসরাঈলরা তাদের বাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে থাকে। এমন সময়ে আল্লাহ্ মৃত্যুর ফেরেশতাকে বলে দেন যেন তাদের সবার জান কবজ করা হয়। ফলে অনেক চেষ্টা করেও তারা মৃত্যু থেকে পালাতে পারেনি.....

যে স্থানে এই ঘটনা ঘটে, হিজকীল আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামে একজন নবী একবার সেই স্থান পার হচ্ছিলেন। উনি এতগুলো মৃতদেহ দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, তখন আল্লাহ্ তাকে বললেন তুমি কি দেখতে চাও যে আমি এদের পুনরুত্থিত করতে পারি কি না? উনি হ্যাঁ বোধক জবাব দিলে আল্লাহ্ উনাকে দুআ করতে বলেন। উনি দুআ করলে এই সবগুলো মানুষ একবারে আবার জীবন ফিরে পায়। সর্বসাকুল্যে এদের সংখ্যা ছিল ৯০০০ এর মতন। এই ঘটনাটা আল্লাহ্ কুরআনে উল্লেখ করেছেন সূরা বাক্বারাতে। [1]

তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন? অথচ তারা ছিল হাজার হাজার। তারপর আল্লাহ তাদেরকে বললেন মরে যাও। তারপর তাদেরকে জীবিত করে দিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের উপর অনুগ্রহকারী। কিন্তু অধিকাংশ লোক শুকরিয়া প্রকাশ করে না। (২:২৪৩)

সূরা বাক্বারার একটা বিশেষত্ব হচ্ছে যে এখানে এই রকম আরো অনেকগুলো কাহিনী উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা চোখের সামনে দেখিয়েছেন। আমরা এখানেই পড়েছি বাক্বারা নামকরণ হয়েছে যেজন্য, সেই ঘটনাটা (১২তম পর্ব দ্রষ্টব্য)। এরকম আরো একটি সামনে পড়বো ইনশাল্লাহ। [2]

যাই হোক, এভাবে বেশ কিছুদিন ছন্নছাড়া অবস্থায় থাকতে থাকতে বনী ইসরাঈলরা ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে গেল। তারা বুঝলো যে আল্লাহ্ কর্তৃক পাঠানো একজন বাদশাহ বা নেতার অধীনে যুদ্ধ করা ছাড়া ওদের এই দুরবস্থা থেকে মুক্তি মিলবে না। তখন সেই সময় ওদের কাছে আল্লাহ্ যে নবী পাঠিয়েছিলেন, স্যামুয়েল আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তারা তাঁর কাছে গিয়ে অনুরোধ করলো আল্লাহ্ যেন তাদেরকে একজন রাজা পাঠান, যিনি ওদের নেতৃত্ব দিবেন।

মূসার পরে তুমি কি বনী ইসরাঈলের একটি দলকে দেখনি, যখন তারা বলেছে নিজেদের নবীর কাছে যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নির্ধারিত করে দিন যাতে আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে পারি। নবী বললেন, তোমাদের প্রতিও কি এমন ধারণা করা যায় যে, লড়াইর হুকুম যদি হয়, তাহলে তখন তোমরা লড়বে না? তারা বলল, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করব না। অথচ আমরা বিতাড়িত হয়েছি নিজেদের ঘর-বাড়ী ও সন্তান-সন্ততি থেকে। অতঃপর যখন লড়াইয়ের নির্দেশ হলো, তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তাদের সবাই ঘুরে দাঁড়ালো। আর আল্লাহ তা'আলা জালেমদের ভাল করেই জানেন। (২:২৪৬)

আমাদের কি মনে আছে যে উপরের নবী কোন ঘটনার কথা বলছেন?

হুম-মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বনী ইসরাঈলদের যুদ্ধ করে পবিত্র ভূমিতে ঢোকার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখনকার কথা। এখানে একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, ওরা যদি তখন আল্লাহর নির্দেশ মানতো তাহলে ফিলিস্তিনের সেই সব জাতিরা একবারেই ধ্বংস হয়ে যেত। ওরা তখন অমান্য করেছিল বলেই সুদীর্ঘকাল ধরে প্রতিপক্ষদের সাথে ওদের যুদ্ধ-পাল্টা যুদ্ধ করতে হয়েছে। ইউশা ইবনে নুনের নেতৃত্বে পবিত্র ভূমিতে ঢুকতে পারার ব্যাপারটা ছিল সাময়িক সাফল্য মাত্র।
এই ঘটনা থেকে আমরা কী শিক্ষা পাই?
আল্লাহ্ আমাদের জন্য 'দীর্ঘমেয়াদী' স্বস্তি ও সাফল্য চান। অল্প কষ্টের বিনিময়ে তিনি আমাদের অনেক বড় নিয়ামত দিতে চান। কিন্তু সেটা না বুঝে আমরা নিজেদের জন্য যে পথ বেছে নেই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা বেশী কণ্টকাকীর্ণ এবং ঝামেলাদায়ক হয়ে থাকে।

এরপর থেকে আমরা কি সন্তুষ্ট থাকবো আল্লাহর সিদ্ধান্তে, যদিও বা কোনো কিছু আমাদের মনের মত না হয়? ভরসা করতে পারবো আল্লাহর প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের উপর?

এখানে আমরা আরো দেখলাম যে মুখে মুখে আমরা অনেক কথাই বলি, কিন্তু পরিস্থিতি আসলে তখন আমাদের আন্তরিকতার পরীক্ষা হয়ে যায়। এবারও আল্লাহ্ সত্যি সত্যিই যখন জিহাদের

নির্দেশ দিলেন, সেই প্রথমবারের মতই অল্প সংখ্যক ছাড়া বনী ইসরাঈলদের প্রায় সবাই মুখ ফিরিয়ে নিল। তাই আমাদের নিজেদেরকে প্রশ্ন করা উচিৎ যে আমরা কি কথার ফুলঝুড়ি ছিটানোর দলে নাকি কথা কম বলে কাজ করে যাওয়াদের দলে?

এর পরের ঘটনাও আল্লাহ্ উল্লেখ করছেন একই সূরার পরবর্তী আয়াতগুলোতেই- ***আর তাদেরকে তাদের নবী বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তালূতকে তোমাদের জন্য বাদশাহ সাব্যস্ত করেছেন। তারা বলতে লাগল তা কেমন করে হয় যে, তার শাসন চলবে আমাদের উপর। অথচ রাষ্ট্রক্ষমতা পাওয়ার ক্ষেত্রে তার চেয়ে আমাদেরই অধিকার বেশী। আর সে সম্পদের দিক দিয়েও সচ্ছল নয়। নবী বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর তাকে পছন্দ করেছেন এবং স্বাস্থ্য ও জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রাচুর্য দান করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ তাকেই রাজ্য দান করেন, যাকে ইচ্ছা। আর আল্লাহ হলেন অনুগ্রহ দানকারী এবং সব বিষয়ে অবগত। বনী-ইসরাঈলদেরকে তাদের নবী আরো বললেন, তালূতের নেতৃত্বের চিহ্ন হলো এই যে, তোমাদের কাছে একটা সিন্দুক আসবে তোমাদের পালকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের মনের সন্তুষ্টির নিমিত্তে। আর তাতে থাকবে মূসা, হারুন এবং তাঁদের সন্তানবর্গের পরিত্যক্ত কিছু সামগ্রী। সিন্দুকটিকে বয়ে আনবে ফেরেশতারা। তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তাহলে এতে তোমাদের জন্য নিশ্চিতই পরিপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে। (২:২৪৭-৪৮)***

আল্লাহ্ যখন তালুত (আঃ)-কে বাদশাহ হিসেবে মনোনীত করলেন, তখন ওরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলো যে উনি বিন ইয়ামিনের বংশের, যাদেরকে কীনা ওরা এতদিন ধরে হেলা, অত্যাচার ইত্যাদি করে এসেছে! তাছাড়া উনি সম্পদশালীও ছিলেন না! ফলে ওরা মন থেকে তাকে মেনে নিতে পারছিলো না। কিন্তু আল্লাহই যে উনাকে নির্বাচিত করেছেন সেটার প্রমাণ হিসেবে তালুত (আঃ) এর বাসার সামনে আল্লাহ্ ফেরেশতাদের মাধ্যমে পৌঁছিয়ে দিলেন সেই Ark of the covenant যা কী না হারিয়ে গিয়েছিল বলে আমরা আগে উল্লেখ করেছি। এই ঘটনা থেকে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষণীয় আছে।

প্রথমত, আমরা যখন আল্লাহর কাছে কিছু চাই, তখন তা যে আমাদের মনের মত করে কবুল হবে তা কিন্তু নয়! বনী ইসরাঈলরা যা চেয়েছিল আল্লাহ্ তাই দিয়েছিলেন, ওদের জন্য একজন রাজা মনোনীত করে দিয়েছিলেন, কিন্তু ওরা তাকে পছন্দ করেনি কারণ নির্বাচিত ব্যক্তিটি তাদের মন মত হয়নি। এটা আমাদের সাথেও হতে পারে। হয়তো আল্লাহ্ আমাদের দুআ কবুল করলেন,

কিন্তু সেটা আমরা যেভাবে ভেবেছিলাম সেভাবে নয়, হয়তো বা আমাদের অপছন্দনীয় কোনো উপায়ে!

দ্বিতীয়ত, বনী ইসরাঈলরা তালুত (আঃ)-কে পছন্দ করেনি কারণ কে আল্লাহর প্রিয় বান্দা সেটার একটা নিজস্ব মনগড়া মানদণ্ড তারা তৈরি করে নিয়েছিল। তা আসলেই আল্লাহর দ্বারা স্বীকৃত কী না সেটা পরখ করে নেয়ার প্রয়োজন মনে করেনি আমরা নিজেরা এমন অনেক সময় করি এটা কারো অনেক টাকা থাকলে আমরা ধরে নেই যে তার প্রতি আল্লাহর অনেক রহমত, তাকে আল্লাহ্ অনেক পছন্দ করেন। কিন্তু কুরআনে একাধিকবার আল্লাহ্ আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে এই দুনিয়ার প্রাচুর্য কোনো বিশাল ব্যাপার নয়। এখানেও আমরা দেখছি যে তালুত (আঃ) সম্পদশালী ছিলেন না, কিন্তু তাঁর ছিল জ্ঞান, দ্বীনের জ্ঞান। তাই পৃথিবীর অনেক কিছুর মোহ কাটিয়ে হয়ে হলেও আমাদের দ্বীনের জ্ঞান অর্জনে ব্যাপৃত হওয়া উচিৎ।

[1] কেউ যদি আরো বিস্তারিত পড়তে চান তাহলে এখানে পড়তে পারেন
http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=146

[2] সূরা বাক্বারার মোট যে পাঁচটি জায়গায় এটা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো হল- ২:৫৫-৫৬, ২:৭২-৭৩, ২:২৪৩, ২:২৫৯, ২:২৬০ বিস্তারিত পড়তে পারেন এখানে-
http://attafsir.wordpress.com/2012/04/10/those-who-were-brought-back-to-life/

শিকড়ের সন্ধানে-১৯

কথা হচ্ছিল আল্লাহ্ কর্তৃক তালুত আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মনোনীত করার ব্যাপারে বনী ইসরাঈলদের আপত্তি নিয়ে। আগের পর্বে উল্লেখিত এ সংক্রান্ত আয়াতে আল্লাহ্ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ একটা কথা বলেছেন, আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে রাজত্ব দেন।

এই যে আমার মনের মত কাউকে নেতা বা নবী হতে হবে.....মূলত এটাই ছিল ইহুদীদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মেনে না নেয়ার প্রধান কারণ। এমন না যে তারা সংশয়ে ছিল যে উনি আসলেই আল্লাহর নবী কী না। ওরা সন্দেহাতীতভাবে জানতো যে উনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। আল্লাহ্ কুরআনে তাদের কথা বলছেন-

যাদেরকে আমি কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চিনে, যেমন তাদের সন্তানদেরকে চিনে। (৬:২০)

সাফিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা, যাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ে করেছিলেন বনু কুরাইযার ঘটনার পরে, যিনি বনু কুরাইযা গোত্রের নেতার মেয়ে ছিলেন, তাঁর কাছ থেকে বর্ণিত হাদীস আছে, যার মূল বক্তব্যটা ছিল এরকম যে-রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম যেদিন মদীনাতে প্রবেশ করেছিলেন, সেদিনই তাঁর বাবা তাঁর চাচাকে এসে বলেছিলেন যে এটাই সেই নবী যার কথা আমাদের গ্রন্থে আছে, কিন্তু আমার জীবন থাকতে আমি তাকে মেনে নিবো না! কিন্তু কেন?

আগে আমরা দেখেছি যে ইহুদীরা নিজেদেরকে chosen people ভেবে একটা মিথ্যা আত্মতৃপ্তিতে ভুগতো, অন্য সবাইকে জেন্টাইল বা উম্মী হিসেবে অভিহিত করে হেলা করতো। এজন্য আল্লাহ্ একাধিকবার কুরআনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষণ হিসেবে উনাকে 'উম্মী নবী' হিসেবে অভিহিত করেছেন। [1] তাই তারা যখন দেখলো যে যাদেরকে এতদিন ওরা সবচেয়ে হেয় করে এসেছে, সেই অশিক্ষিত আরবদের মধ্য থেকে একজনের নেতৃত্ব ওদের মেনে নিতে হবে, তখন নিজেদের অহংবোধকে বিসর্জন দিয়ে কিছুতেই তারা সেটা করতে পারছিলো না!

এই ঘটনা থেকে তাহলে আমরা কি শিখলাম? কয়েকটা বিষয়-

প্রথমত, আল্লাহর আনুগত্য করতে হলে অনেক সময়ই আমাদেরকে আমাদের ইগো বা অহংকারবোধকে বিসর্জন দিতে হয়। এটা সবাই পারে না.....এটা একটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ।

আমার মনের মত না, এমন অনেক কিছু আমাদের মেনে নিতে হয় বা করতে হয়। এখানেই আসলে আত্মসমর্পণের নির্যাসটা বিদ্যমান। যা ভালো লাগে, শুধু তা করলে সেটাতো আত্মসমর্পণ হল না.....সেটা হল প্রবৃত্তি পূজা!

দ্বিতীয়ত, অন্ধ গোত্র প্রীতি ইসলামে নিন্দনীয় একটা বিষয়। আজকের পরিভাষায় এটাকে আমরা জাতীয়তাবাদ বলতে পারি। ছোটবেলা থেকে আমাদের ধর্ম বইয়ে যে একটা কথা শিখানো হয় যে দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ- সেটা যে আদতে একটা জাল হাদিস সেটা অনেকেই হয়তো আমরা জানি না। তবে দেশের কল্যাণের জন্য কাজ করা আর জাতীয়তাবাদী না হওয়ার মাঝে কোনো সংঘর্ষ নেই কারণ একজন প্র্যাক্টিসিং মুসলিম আল্লাহকে ভয় করে চলেন বলেই তাঁর হাতে দেশ সবচেয়ে বেশী নিরাপদ। [2]

তৃতীয়ত, ক্ষমতার মালিক আল্লাহ্। আল্লাহ্ যখন তাঁর ইচ্ছা মতন কিছু করেন, তখন তা তাঁর প্রজ্ঞা, ন্যায়- বিচার ও জ্ঞানের সাথে সংগতি রেখেই করেন। কিন্তু আমরা আমাদের স্বল্প বুদ্ধি দিয়ে অনেক সময় ভাবি যে অমুক একটা জিনিস derserve করে না, তমুক ওটা কিভাবে পেল ইত্যাদি, যেমনটা তালুত আলাইহি সাল্লামকে বাদশাহ নির্বাচিত করায় ওরা অবাক হয়ে গিয়েছিল। আমাদের সবসময় আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপর আস্থা রাখা উচিৎ।

ফিরে যাচ্ছি ঘটনার বিবরণে...

বাধ্য হয়ে বনী ইসরাঈলরা তালুত আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে যুদ্ধে অংশ নিল। এই সময়ে কারা আদতে নিবেদিত প্রাণ সেটা যাচাই করার জন্য আল্লাহর নির্দেশে তালুত আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা ছোট্ট পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন। এ সংক্রান্ত পুরো ঘটনাটা আল্লাহ্ কুরআনে উল্লেখ করছেন এইভাবে-

অতঃপর তালূত যখন সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বেরুল, তখন বলল, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। সুতরাং যে লোক সেই নদীর পানি পান করবে সে আমার নয়। আর যে, লোক তার স্বাদ গ্রহণ করলো না, নিশ্চয়ই সে আমার লোক। কিন্তু যে লোক হাতের আঁজলা ভরে সামান্য খেয়ে নেবে তার দোষ অবশ্য তেমন গুরুতর হবে না। অতঃপর সবাই পান করল সে পানি, সামান্য কয়েকজন ছাড়া। পরে তালূত যখন তা পার হলো এবং তার সাথে ছিল মাত্র কয়েকজন ঈমানদার, তখন তারা বলতে লাগল, আজকের দিনে জালূত এবং তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই, যাদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহর সামনে

তাদের একদিন উপস্থিত হতে হবে, তারা বার বার বলতে লাগল, সামান্য দলই বিরাট দলের মোকাবেলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহর হুকুমে। আর যারা ধৈর্য্যশীল আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন। (২:২৪৯)

এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয়- যে কাজটা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে সেটা কিন্তু হারাম কিছু না! চিন্তা করলে আমরা দেখবো যে এর পেছনে বিশাল প্রজ্ঞা বিদ্যমান। আগেও এ বিষয়টা আমরা বারবার খেয়াল করেছি, এই বনী ইসরাঈলদের কাহিনীতেই (৭ম পর্ব এবং ১৫ তম পর্ব)। রোযার মাস আসলে কিন্তু আদতে আমরা এই কাজটাই করি। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হালাল কাজ থেকে বিরত থাকি, আত্মসংযমের ট্রেনিং হয়ে যায়, যেন হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যায়। অথচ এই বিষয়টা ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারি না বলেই অনেক সময় দেখা যায় রোযা রেখে আমরা হালাল জিনিস থেকে বিরত থাকছি ঠিকই, কিন্তু হারাম কাজ ঠিকই করে যাচ্ছি (গীবত, মিথ্যা বলা ইত্যাদি), ফলে আমাদের রোযা পরিণত হচ্ছে উপবাসে, আমাদের চরিত্রের মাঝে কোনো স্থায়ী পরিবর্তন না এনেই রোযার মাসটা বিদায় নিচ্ছে।

আশ্চর্যজনকভাবে হলেও সত্যি, ৮০ হাজার জনের মাঝে যে কয়জন বনী ইসরাঈলয়রা এই পরীক্ষায় টিকে গিয়েছিল, তাদের সংখ্যা ছিল অতি সামান্য, বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের সমান। আর বদর যুদ্ধের মতই, এই যুদ্ধেও প্রতিপক্ষ ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের সাহায্য করেছিলেন এবং বনী ইসরাঈলরা এই অসম এবং আপাত অসম্ভব যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছিল। এখান থেকে আমরা আবারও বুঝি যে আল্লাহর রাস্তায় বিজয়ী হবার জন্য সংখ্যাটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং গুরুত্বপূর্ণ হল গুণাগুণ! আমরা আরো দেখতে পাই যে এই ৩১৩ জন বুঝতে পেরেছিলেন যে বিজয় আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। তাই তাঁরা কম সংখ্যার দরুন হতাশ হয়ে যাননি, আল্লাহর কাছে ধৈর্য্য ও সাহায্যের জন্য দুআ করেছিলেন।

এই যুদ্ধেই দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিপক্ষ তথা ফিলিস্তিনিদের নেতা জালুতকে হত্যা করেন একটি মাত্র পাথরের আঘাতে। অথচ প্রথমে জালুত দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে অবজ্ঞায় হেসে ফেলেছিলো। এই ঘটনার বিবরণে আল্লাহ্ বলছেন-

তারপর ঈমানদাররা আল্লাহর হুকুমে জালূতের বাহিনীকে পরাজিত করে দিল এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করল (২:২৫১)

সীরাহতেও আমরা এমন একাধিক ঘটনা পাই। আবু জাহল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে কঠিন শত্রুদের একজন কিন্তু প্রথম তীরবিদ্ধ হয়েছিল দুজন কিশোরের দ্বারা। আবার খন্দকের যুদ্ধের সময়ও আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু পরাজিত করেছিলেন কুরাইশদের মধ্যে বিখ্যাত সৈন্য আমরকে।

যাই হোক, এই যুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার পর জেরুজালেমে বনী ইসরাঈলরা ফিরে আসতে সক্ষম হয়। তালুত আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালুত আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভিষিক্ত হন। তাঁর নেতৃত্বে বনী ইসরাঈলদের স্বর্ণযুগ শুরু হয়। উনার শাসনাকাল নিয়ে আমরা পরের পর্বে কথা বলবো ইনশাল্লাহ।

[1] যেমন ৬২:২

[2] এটার উপর একটা নোট লিখেছিলাম- http://on.fb.me/1t3MLcc

শিকড়ের সন্ধানে-২০

এই পর্বে আমরা আলোচনা করবো দাঊদ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে। শুধু ইসলামিক নয়, ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থেরও তিনি একজন কিংবদন্তী ব্যক্তিত্ব। তিনি একজন সুবিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন। তাঁর সময়ে শুধু জেরুজালেম নয়, এর আশেপাশের অনেক এলাকাও বনী ইসরাঈলীয়দের নিয়ন্ত্রণে আসে।

আল্লাহ্ দাঊদ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বেশ কয়েকটি নিয়ামত দিয়েছিলেন।

প্রথমত, জালুতকে হত্যা করার পর তার লোহার বর্মটা দাঊদ আলাইহি ওয়াসাল্লামের হস্তগত হয়। কিন্তু ফিলিস্তিনীয়রা ছিল বিশাল লম্বা চওড়া আর শক্ত সমর্থ লোক। ওদের জন্য তৈরি করা বর্ম বনী ইসরাঈলয়দের জন্য উপযোগী ছিল না। ওটা পরলে আর নড়াচড়াই সম্ভব হত না ওদের জন্য। ফলে আল্লাহ্ দাঊদ আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য লোহাকে নরম এবং ব্যবহার উপযোগী করে দিয়েছিলেন। বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে উনার শাসনকাল আর ইতিহাসের লৌহ যুগ হিসেবে পরিচিত সময়টা একই!

আল্লাহ্ বলেন-***আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করেছিলাম এই আদেশ মর্মে যে, হে পর্বতমালা, তোমরা দাউদের সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং হে পক্ষী সকল, তোমরাও। আমি তাঁর জন্য লৌহকে নরম করে ছিলাম। (৩৪:১০)***

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ তাঁর উপর নাযিল করেছিলেন যাবুর নামক আসমানী গ্রন্থ।

তৃতীয়ত, খুবই শ্রুতিমধুর কণ্ঠ। উনার তিলাওয়াত পশুপাখিরাও মুগ্ধ হয়ে শুনতো, এমনকি উনি যখন আল্লাহর প্রশংসায় লিপ্ত হতেন, পশুপাখি ও পর্বতমালাও তাতে অংশ নিত। কুরআনে আছে, ***তারা যা বলে তাতে আপনি সবর করুন এবং আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদকে স্মরণ করুন। সে ছিল আমার প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল।আমি পর্বতমালাকে তার অনুগামী করে দিয়েছিলাম, তারা সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে পবিত্রতা ঘোষণা করত; আর পক্ষীকুলকেও, যারা তার কাছে সমবেত হত। (৩৮:১৭-২০)***

চতুর্থত, ন্যায়বিচার করার ক্ষমতা। সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য দাঊদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অধীনস্থদের মাঝে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। আল্লাহ্ বলেনঃ

আমি তাঁর সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাঁকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী বাগ্মীতা। (৩৮:২০)

দাঊদ আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বিচার ক্ষমতার উপরে কুরআনে একটি কাহিনী রয়েছে যেটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ একটি কাহিনী.....

দাঊদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত উনার প্রাসাদের একদম ভিতরে একটা ঘরে নিভৃতে আল্লাহর ইবাদাতে ব্যাপৃত থাকতেন। সেখানে সচরাচর কেউ ঢুকতো না। একদিন হঠাৎ করে দুইজন লোক সেটার দেয়াল বেয়ে একদম ঘরের ভেতর ঢুকে গেল। এভাবে হঠাৎ করে তাদেরকে ঘরের মাঝে দেখে দাঊদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারা অভয় দিয়ে বললো যে তারা একটি বিচার কার্যে ফয়সালা চাওয়ার জন্য উনার কাছে এসেছে। তারা বললোঃ

ভয় করবেন না; আমরা বিবদমান দুটি পক্ষ, একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করেছি। অতএব, আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন, অবিচার করবেন না। আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। সে আমার ভাই, সে নিরানব্বই দুম্বার মালিক আর আমি মালিক একটি মাদী দুম্বার। এরপরও সে বলেঃ এটিও আমাকে দিয়ে দাও। সে কথাবার্তায় আমার উপর বল প্রয়োগ করে। (৩৮:২২-২৩)

এই অভিযোগ শুনেই দাঊদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপসংহারে পৌঁছে গেলেন এবং বললেন-

সে তোমার দুম্বাটিকে নিজের দুম্বাগুলোর সাথে সংযুক্ত করার দাবী করে তোমার প্রতি অবিচার করেছে। শরীকদের অনেকেই একে অপরের প্রতি জুলুম করে থাকে। তবে তারা করে না, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী ও সৎকর্ম সম্পাদনকারী। অবশ্য এমন লোকের সংখ্যা অল্প। (৩৮:২৪)

উনি এই কথা বলে শেষ করার পর হঠাৎ করেই দেখলেন যে লোকগুলো উধাও হয়ে গেছে। আর তাতেই তিনি বুঝলেন যে ওরা আসলে মানুষ কেউ ছিল না, আল্লাহ্ তাঁকে পরীক্ষা করার জন্যই ওদের পাঠিয়ে ছিলেন। আর এটা টের পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ্ বলেন-

দাউদের খেয়াল হল যে, আমি তাকে পরীক্ষা করছি। অতঃপর সে তার পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল, সেজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করল। (৩৮:২৪)

বলেন তো এটা কেন পরীক্ষা ছিল? দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভুলটা কী ছিল যে উনি তড়িঘড়ি করে ক্ষমা চাইলেন?

আমরা একটু খেয়াল করলে দেখবো যে দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে এক পক্ষের কথা শুনেই উনার মতামত দিয়ে ফেলেছিলেন, বিচার কার্য পরিচালনা করার ক্ষেত্রে যেটা একটা বিশাল ভুল! আল্লাহ্ আসলে এই ঘটনার মাধ্যমে তাকে শিখিয়েছেন কিভাবে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফয়সালা করতে হবে! আল্লাহ্ বলেন-*হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব, তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজত্ব কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। (৩৮:২৬)*

এখানে আমরা দেখলাম যে পৃথিবীতে ক্ষমতার অধিকারী হলে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের দায়িত্ব হয়ে যায়। আর এটা খুব সহজ কোনো কাজ নয়। এখান থেকে আমরা যে শিক্ষাটা পেলাম সেটা এমন একটা শিক্ষা যেটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করার সুযোগ আছে। খুব ছোট ছোট ব্যাপারে আমাদের ফয়সালা করতে হতে পারে। সেটা হতে পারে ভাই-বোনের মাঝে, ছেলে মেয়েদের মাঝে, স্বামী স্ত্রীর মাঝে..... হতে পারে আমাদের পরিবারে, কর্মক্ষেত্রে, সর্বত্র। কোনো পরিস্থিতিতেই আমাদের এক পক্ষের কথা শুনে কোনো রায় দিয়ে দেয়া উচিৎ না। এটা ছাড়াও সুবিচার প্রতিষ্ঠার আরো অনেক কৌশল ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে। যেমন খুব রাগ বা উত্তেজনার মাথায় আমাদের কোনো বিচার করা উচিৎ না। তাছাড়া একটা ইসলামী সমাজে একজন বিচারপতির বেতন হয় সর্বোচ্চ যেন কোনো ঘুষ বা কোনো কিছুর প্রলোভন তাকে সুবিচার প্রতিষ্ঠা থেকে টলাতে না পারে। কী দারুণ, তাই না?

হাদীস থেকে আমরা দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো কিছু গুণাবলীর কথা জানতে পারি। যেমন উনি একদিন পর পর রোযা রাখতেন (যেটা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয় রোযা), রাতের বেশ কিছুটা অংশ নামাযে রত থাকতেন ইত্যাদি। [1]

এখানে আবারো উল্লেখ্য যে ইহুদীরা তাদের স্বভাব বশত দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়েও অনেক মিথ্যাচার করেছে তাদের ধর্মগ্রন্থে। সেগুলোর কোনো কোনোটা এত মারাত্মক যে জানানোর উদ্দেশ্যেও প্রকাশ করা সম্ভব নয়। বিচার কার্যে নিরপেক্ষতা বজায় রাখার শিক্ষা সংক্রান্ত যে ঘটনাটা আগে উল্লেখ করলাম, সেটার পটভূমি সম্পর্কেও অনেক উল্টাপাল্টা তথ্য পাওয়া যায় যেগুলোর উৎস ইসরাঈলিয়াত। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি যে সেগুলো আমরা তখনই গ্রহণ করতে পারবো যখন তা আমাদের প্রতিষ্ঠিত মূলনীতিগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক হবে না। এমন একটি

মূলনীতি হচ্ছে কোনো নবী রাসূলই এমন কিছু করেননি যা তাদের মর্যাদার সাথে যায় না। নিঃসন্দেহে তাঁরা ছিলেন অনুপম চরিত্রের অধিকারী।

যাই হোক, প্রায় ৪০ বছর শাসন করার পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর ছেলে সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কথিত আছে যে উনার জানাযায় বহু মানুষ, এমনকি পশু পাখিরাও অংশ নিয়েছিল।

আল্লাহ্ কুরআনে দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর তাঁর যেসব রহমতের কথা উল্লেখ করেছেন, তাঁর মাঝে একটা হচ্ছে তিনি তাকে দিয়েছেন সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত একজন ছেলে (৩৮:৩০)। আমরা এর পরের পর্বে উনাকে নিয়ে কথা বলবো ইনশাল্লাহ।

[1] The Messenger of Allah (sal Allahu alaihi wa sallam) said: "The most beloved fasting to Allah, the Mighty and Sublime, is the fast of Dawud (alaihis salam). He used to fast one day and not the next. And the most beloved prayer to Allah, the Mighty and Sublime, is the prayer of Dawud (alaihis salam). He used to sleep half the night, stand for one third of it (in prayer), and sleep for one-sixth of it." [Jami at-Tirmidhi - sahih hadith]

শিকড়ের সন্ধানে-২১

দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লামও ইহুদী ধর্মগ্রন্থের একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। ওদের ইতিহাসে উনি king Solomon হিসেবে সমধিক পরিচিত। আল্লাহ্ উনাকে দাঊদ আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরাধিকারী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তবে এখানে 'উত্তরাধিকার' ধারণাটা আমরা সাধারণত যে অর্থে বুঝি তার থেকে ভিন্ন। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে নবীরা টাকা-পয়সা উত্তরাধিকার হিসেব রেখে যান না, রেখে যান দ্বীনের জ্ঞান। [1] তাই এখানে উত্তরাধিকার বলতে নবী ও বাদশাহ হিসেবে, সেই সাথে দ্বীনের জ্ঞানের উত্তরাধিকার বুঝানো হয়েছে, অর্থ সম্পদের নয়।

সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশিষ্টতাঃ

আল্লাহ্ সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লামকে অনন্য কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন যা অন্য কোনো নবীকে দেয়া হয় নি। যেমনঃ আল্লাহ্ উনাকে অর্ধ পৃথিবীর রাজত্ব দান করেছিলেন, যার মধ্যে শুধু মানুষই ছিল না, ছিল জ্বীন, বাতাস, পশু-পাখিও। এদের সবার উপর আল্লাহ্ তাঁকে নিয়ন্ত্রণ প্রদান করেছিলেন এবং তাদের কথা বোঝার ক্ষমতা আল্লাহ্ তাঁকে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ বলেনঃ

এবং সুলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে; তা তাঁর আদেশে প্রবাহিত হত ঐ দেশের দিকে, যেখানে আমি কল্যাণ দান করেছি। আমি সব বিষয়েই সম্যক অবগত রয়েছি এবং অধীন করেছি শয়তানদের কতককে, যারা তার জন্যে ডুবুরীর কাজ করত এবং এ ছাড়া অন্য আরও অনেক কাজ করত। আমি তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করে রাখতাম। (২১:৮১-৮২)

কুরআনে আরো আছেঃ

সুলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'হে লোক সকল, আমাকে উড়ন্ত পক্ষীকূলের ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়েছে এবং আমাকে সব কিছু দেয়া হয়েছে। নিশ্চয় এটা সুস্পষ্ট শ্রেষ্ঠত্ব।' সুলায়মানের সামনে তার সেনাবাহিনীকে সমবেত করা হল। জ্বিন-মানুষ ও পক্ষীকুলকে, অতঃপর তাদেরকে বিভিন্ন ব্যূহে বিভক্ত করা হল। (২৭:১৬-১৭)

সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লাম যে পশুপাখিদের ভাষা বুঝতেন এটা কুরআনে সরাসরি একাধিকভার উল্লেখ করা হয়েছে। পিঁপড়াদের মাঝে কথোপকথন বুঝতে পারার ঘটনাটা আমরা অনেকেই হয়তোবা জানি। আজকের যুগে এসে এই কাহিনীটা হয়তো আমাদের কাছে খুব স্বাভাবিক লাগছে

কারণ এখন আমরা জানি যে গাছেরও প্রাণ আছে, সব প্রাণীদেরই নিজস্ব ভাষা আছে। কিন্তু একটা সময় ছিল যখন কুরআনে উল্লেখিত এই কাহিনীটাকে অসম্ভব হিসেবে আখ্যায়িত করে অবিশ্বাসীরা হাসাহাসি করতো। আল্লাহ্ বলেন-

যখন তারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছাল, তখন এক পিপীলিকা বলল, হে পিপীলিকার দল, তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর। অন্যথায় সুলায়মান ও তার বাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পিষ্ট করে ফেলবে।তার কথা শুনে সুলায়মান মুচকি হাসলেন এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা, তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাতে আমি তোমার সেই নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার পছন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে নিজ অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর। (২৭:১৮-১৯)

উপরোক্ত আয়াতে উল্লেখিত দুআটা আমার খুব পছন্দের। আমরা নিয়মিত এই দুআটা করতে পারি দ্বীনের পথে কাজ করার জন্য আমাদের তৌফিক বাড়ানোর উদ্দেশ্যে। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের মা-বাবার প্রতি যা কিছু রহমত বর্ষিত হয়েছে, প্রকারান্তরে সেগুলো আমাদের জন্যও রহমত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আমরা যদি কোনো প্র্যাক্টিসিং মুসলিম পরিবারে জন্ম নেই এবং এর ফলে দ্বীন পালন করা আমাদের সহজ হয়, তবে আল্লাহ্ যে আমাদের মা-বাবাকে হিদায়াত দান করেছেন সেটা আমাদের জন্যও রহমত স্বরূপ আবির্ভূত হয়েছে। আরো যেটা শিখি তা হল আল্লাহর শোকর করার সবচেয়ে উপযুক্ত পদ্ধতি হচ্ছে সৎ কর্ম করা এবং পাপ থেকে বিরত থাকা।

যেমন, আল্লাহ্ আমাদেরকে দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন, সেই চোখ দিয়ে আমরা যদি পর্ণোগ্রাফি দেখি তাহলে সেটাই সবচেয়ে বড় অকৃতজ্ঞতা। ইসলামে আসলে শুধু lip service এর কোনো স্থান নেই। এজন্য আমরা খেয়াল করলে দেখবো যে কুরআনে কোনো জায়গাতেই শুধু ঈমান আনার কথা বলা হয়নি। প্রতিটি জায়গায় ঈমান আনার সাথে নেক আমল করার কথা বলা হয়েছে। আর পিঁপড়াদের একজন আরেকজনের ব্যাপারে সহমর্মিতা প্রদর্শন থেকেও আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে।

সাবার রাণী বিলকিস ও সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লামঃ

আমরা ছোটবেলা থেকেই হয়তো বা সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লাম ও সাবার রাণীর কাহিনী শুনে আসছি। এই কাহিনীটার কথা কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। সেই কাহিনীর মাঝেও রয়েছে

সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লামের অনুপম ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ যে উনি পশু-পাখিদের কথা বুঝতেন। কুরআনে বলা হচ্ছে-

সুলায়মান পক্ষীদের খোঁজ খবর নিলেন, অতঃপর বললেন, কি হল, হুদহুদকে দেখছি না কেন? নাকি সে অনুপস্থিত? আমি অবশ্যই তাকে কঠোর শাস্তি দেব কিংবা হত্যা করব অথবা সে উপস্থিত করবে উপযুক্ত কারণ। কিছুক্ষণ পড়েই হুদ এসে বলল, আপনি যা অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার কাছে সাবা থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি। আমি এক নারীকে সাবাবাসীদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সবকিছুই দেয়া হয়েছে এবং তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে। আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলী সুশোভিত করে দিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। অতএব তারা সৎপথ পায় না। (২৭:২০-২৪)
ঘটনার এই বিবরণ থেকে আমাদের অনেক গুলো শিক্ষণীয় আছে।

প্রথমত, যারা আমাদের অধীনস্থ তাদের ভালমন্দের ব্যাপারে নিয়মিত খোঁজখবর রাখা শাসনকর্তার দায়িত্ব। সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লাম সামান্য এক ছোট্ট হুদহুদ পাখি যে নেই এটা সাথে সাথেই খেয়াল করেছেন এবং এ ব্যাপারে তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাই ক্ষমতা থাকা আসলে সবসময় খুব আনন্দের বিষয় নয়, এটা একটা বিশাল দায়িত্ব যেটার ব্যাপারে আমাদের পুংখানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হবে। একজন আদর্শ নেতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি তাঁর দলের নেতাকর্মীদের ব্যাপারে সম্যক অবহিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে আমরা এর ভুরি ভুরি উদাহরণ দেখতে পাই।

দ্বিতীয়ত, কেউ যদি কোনো অপরাধ করে তাহলে তাকে শাস্তি প্রদানের আগে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া উচিৎ। এর আগেও দাউদ আলাইহিওয়াসাল্লামের কাহিনী থেকে আমরা জেনেছি যে বিবাদমান দুই পক্ষের মাঝেও সবসময় দুই পক্ষের বক্তব্য না শুনে কোনো উপসংহারে পৌঁছানো উচিৎ না। তাই হুদহুদ পাখিকে সুযোগ দেয়া হয়েছে তাঁর অনুপস্থিতির কারণ দর্শানোর।

তৃতীয়ত, একটা জাতি উন্নতির যত শীর্ষেই অবস্থান করুক না কেন তাঁরা যদি তাওহীদের অনুসারী না হয় তবে আল্লাহর চোখে তা অর্থহীন। আমরা অনেক সময়ই পাশ্চাত্যের জাঁকজমক দেখে দিশেহারা হয়ে যাই, তারা যে শিরকে লিপ্ত, সেটাকে হালকা করে দেখা শুরু করি ও তাদের মত হতে চাই। কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে দুনিয়ার কোনো কিছুই-ক্ষমতা, অর্থ সম্পদ,

সন্তান সন্ততি আল্লাহর পক্ষ থেকে সন্তুষ্টির চিহ্ন নয়। কারণ ফিরাউনকেও কিন্তু আল্লাহ্ এই দুনিয়ার সব কিছুই দিয়েছিলেন। একমাত্র একটা বিষয়কে আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি- সেটা হল দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে আগ্রহ জন্মানো। [2]

চতুর্থত, আমাদের জীবনে শয়তানের উপস্থিতি এবং ষড়যন্ত্রের কথা আমদের সবসময় মাথায় রাখা উচিৎ। অনেক সময় আমরা আমাদের আশেপাশের মানুষকে অনেক কাজ করতে দেখি যা খুবই অসংলগ্ন এবং অস্বাভাবিক মনে হয়। এটা আসলে সম্ভব হয় কারণ শয়তান কাজগুলো তাদের সামনে সুশোভিত করে দিয়েছে। শয়তানের প্ররোচনা না থাকলে স্বাভাবিক বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের পক্ষে মূর্তি বা আল্লাহর অন্য কোনো সৃষ্টির (যেমন চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদির) সামনে মাথা নত করার কথা না।

[1] The Prophet, said: *"We [prophets] do not leave anything as inheritance. Whatever we leave is charity."* [Al-Bukhaari]. Prophet, said: *"Scholars are the heirs of the prophets and the prophets do not leave behind a dinar or a dirham but rather, only [leave behind] knowledge, and whoever acquires it, has, in fact, acquired an abundant portion."* [Abu Daawood, At-Tirmithi and Ibn Maajah, Al-Albaani - *Saheeh*]

এজন্যই আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরাধিকারী হিসেবে ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে ফাদাক বা অন্য কোনো সম্পত্তি দেননি। শিয়ারা এই বিষয়টি নিয়েই আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে অনেক বিষেদ্গার করে।

[2] হাদীসে আছে- আল্লাহ্ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন (বুখারী ও মুসলিম)

শিকড়ের সন্ধানে-২২

আগের পর্বে আমরা সাবার রাণী ও সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লাম এর মধ্যকার সাক্ষাতের কাহিনীর পটভূমি বর্ণনা করছিলাম। ঘটনার বিবরণ আমরা কুরআন থেকেই জানতে পারি-

সুলায়মান বললেন, এখন আমি দেখব তুমি সত্য বলছ, না তুমি মিথ্যবাদী। তুমি আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং এটা তাদের কাছে অর্পণ কর। অতঃপর তাদের কাছ থেকে সরে পড় এবং দেখ, তারা কি জওয়াব দেয়। বিলকীস বলল, হে পরিষদবর্গ, আমাকে একটি সম্মানিত পত্র দেয়া হয়েছে। সেই পত্র সুলায়মানের পক্ষ থেকে এবং তা এইঃ অসীম দাতা, পরম দয়ালু, আল্লাহর নামে শুরু; আমার মোকাবেলায় শক্তি প্রদর্শন করো না এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও। বিলকীস বলল, হে পরিষদবর্গ, আমাকে আমার কাজে পরামর্শ দাও। তোমাদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে আমি কোন কাজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। তারা বলল, আমরা শক্তিশালী এবং কঠোর যোদ্ধা। এখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই। অতএব আপনি ভেবে দেখুন, আমাদেরকে কি আদেশ করবেন। সে বলল, রাজা বাদশারা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন তাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং সেখানকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গকে অপদস্থ করে। তারাও এরূপই করবে। আমি তাঁর কাছে কিছু উপঢৌকন পাঠাচ্ছি; দেখি প্রেরিত লোকেরা কি জওয়াব আনে। (২৭:২৭-৩৫)

এই ঘটনাপ্রবাহ থেকেও আমাদের অনেকগুলো শিক্ষণীয় আছে-

প্রথমত, কেউ কিছু বললে প্রথমেই আমাদের সেটা অন্ধভাবে বিশ্বাস করা উচিৎ না, সেটা যাচাই বাছাই করা উচিৎ, যেটা সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লাম হুদহুদ পাখির দেয়া তথ্যের ক্ষেত্রে করেছেন।

দ্বিতীয়ত, কাউকে কোনো খারাপ কাজে লিপ্ত দেখলে প্রথমেই রাগান্বিত না হয়ে বা তাদের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে তাদের বরং দাওয়াত দেয়া উচিৎ যেটা সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লাম এখানে সাবার অধিবাসীদের সাথে করেছেন।

তৃতীয়ত, সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লাম এর দাওয়াতের ভাষা ছিল সংক্ষিপ্ত কিন্তু ক্ষুরধার ও স্পষ্ট। আমাদের এই কৌশলটা শেখা উচিৎ।
বেশী লম্বা কথা বললে ফলাফল উল্টা হতে পারে, মানুষ বিরক্ত হয়ে বিমুখ হয়ে যেতে পারে।

চতুর্থত, সুলাইমান (আঃ) প্রথমে এই চিঠি কার কাছ থেকে সেটা উল্লেখ করেছেন, তারপর আল্লাহর নাম নিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে হতে পারে যে উনি আল্লাহর নাম কেন প্রথমে নেননি। স্কলাররা ইজতিহাদ করে এটার কারণ অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন। তাদের কারো কারো মত- যেহেতু সাবাবাসীরা সূর্যপূজায় লিপ্ত ছিল, তাই এটার সমূহ সম্ভাবনা ছিল যে ওরা অন্য কোনো উপাস্যের নাম দেখে প্রথমেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠবে এবং এবং বাকি চিঠিটাই আর পড়বে না। এমনও হতে পারে যে তারা আল্লাহকে গালিও দিয়ে বসবে। এমনটা যেন না হয় সেজন্য সুলাইমান (আঃ) আল্লাহর নাম পরে নিয়েছেন। এখান থেকে আমরা বুঝি যে দাওয়াতী কাজ করার সময় প্রতিপক্ষের অবস্থা, সময়, পরিস্থিতি এগুলো বিবেচনায় রেখে উপযুক্ত কৌশল অবলম্বন করা উচিৎ।

পঞ্চমত, কোনো বড় সিদ্ধান্ত আমাদের আলোচনা করে নেয়া উচিৎ, এককভাবে না যেমনটা বিলকিস এখানে করেছেন।

ষষ্ঠত, কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে সব দিক বিবেচনা করা উচিৎ, প্রতিপক্ষের শক্তি ও সামর্থ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জনের জন্য যথাযথ চেষ্টা করা উচিৎ যেমনটা বিলকিস এখানে করেছেন। আর এজন্য বিশ্বস্ত দূত মারফত ঘটনাস্থল থেকে সরাসরি তথ্য সংগ্রহের কোনো বিকল্প নেই।

উপরোক্ত ঘটনাপ্রবাহ থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, রাণী বিলকিসের উপঢৌকন পাঠানোর আসল উদ্দেশ্য ছিল সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লামের ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা অর্জন করা। এটা হুদহুদ পাখির মাধ্যমে জানতে পেরে সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লাম রাণী বিলকিসের দূতের সামনে তাঁর সেনাবাহিনীর শক্তির পূর্ণ প্রদর্শন করেন যা কী না শুধু মানুষই নয়, পশুপাখি, জ্বীন, বাতাস সবকিছুর সমন্বয়ে গঠিত ছিল। তা দেখে সেই ব্যক্তি হতভম্ব হয়ে যায়। তার নিয়ে আসা উপহারগুলো, যা তাদের দৃষ্টিতে খুবই মূল্যবান ছিল, সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লামের রাজত্বের জাঁকজমকের সামনে মলিন দেখাতে থাকে। সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লাম তাঁর বক্তব্য খুব সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন-

অতঃপর যখন দূত সুলায়মানের কাছে আগমন করল, তখন সুলায়মান বললেন, তোমরা কি ধনসম্পদ দ্বারা আমাকে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন, তা তোমাদেরকে প্রদত্ত বস্তু থেকে উত্তম। বরং তোমরাই তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে সুখে থাক। ফিরে যাও তাদের কাছে। এখন অবশ্যই আমি তাদের বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসব, যার মোকাবেলা করার

শক্তি তাদের নেই। আমি অবশ্যই তাদেরকে অপদস্থ করে সেখান থেকে বহিষ্কৃত করব এবং তারা হবে লাঞ্ছিত। (২৭:৩৬-৩৭)

সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লামের দরবারের জৌলুস দেখে অভিভূত এবং তাঁর স্পষ্ট সতর্কবার্তা শুনে ভীত দূত ফিরে গিয়ে রাণী বিলকিসকে জানালেন যে উনার সাথে কোনো সামরিক কোনো সংঘর্ষে জড়ানো চরম বোকামী হবে। নিজেদের জান-মাল, সম্মানের নিরাপত্তা বিধান করতে হলে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তখন রাণী বিলকিস সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি নিজে গিয়েই তার বশ্যতা স্বীকারের কথা জানাবেন।

সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লাম এই খবরও পেয়ে যান। তখন সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লাম তাঁর অধীনস্থদের বললেন,

হে পরিষদবর্গ, তারা আত্নসমর্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে কে বিলকীসের সিংহাসন আমাকে এনে দেবে? জনৈক দৈত্য-জিন বলল, আপনি আপনার স্থান থেকে উঠার পূর্বে আমি তা এনে দেব এবং আমি একাজে শক্তিবান, বিশ্বস্ত। কিতাবের জ্ঞান যার ছিল, সে বলল, আপনার দিকে আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব। অতঃপর সুলায়মান যখন তা সামনে রক্ষিত দেখলেন, তখন বললেন এটা আমার পালনকর্তার অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, না অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে নিজের উপকারের জন্যেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে জানুক যে, আমার পালনকর্তা অভাবমুক্ত কৃপাশীল। (২৭:৩৮-৪০)

উপরের ঘটনা থেকে আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় শেখার আছে।

প্রথমত, জ্বীনদের ক্ষমতা। জ্বীনদেরকে আল্লাহ্ এমন কিছু ক্ষমতা দিয়ে পাঠিয়েছেন যা আমাদের জন্য অসম্ভব, অতি মানবীয়। অনেক সময় অনেক পীর-ফকির যারা আসলে জ্বীনদের সাহায্যে অলৌকিক কিছু কাজ করে, আমরা সেগুলো দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে যাই এবং সেইসব লোকদের আল্লাহর আউলিয়া ভাবা শুরু করি। জ্বীনদের ক্ষমতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকার কারণে আমরা এভাবে বিভ্রান্ত হই। সামনের পর্বে আমরা এটা নিয়ে আরো বিস্তারিত কথা বলবো ইনশাল্লাহ। [1]

দ্বিতীয়ত, আমরা দেখছি যে সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ এই দুনিয়াতে অভাবনীয় অনেক কিছু দিয়েছিলেন। কিন্তু শেখার বিষয় হচ্ছে এর ফলে সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লামের

প্রতিক্রিয়া কী ছিল? এগুলো কি উনাকে অহংকারী করেছিল? উনার একজন অধীনস্ত যখন চোখের পলকে রাণী বিলকিসের সিংহাসনটা নিয়ে আসলো তখন সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লাম কি আত্মতৃপ্তির হাসি দিলেন বা আত্মতুষ্টি প্রকাশ করলেন? উনি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন কারণ তিনি জানতেন যে এসবের কোনো কিছুই আদতে তাঁর কৃতিত্ব না। কুরআনের অন্যত্রও আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন-

আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দান করেছিলাম। তাঁরা বলেছিলেন, আল্লাহর প্রশংসা, যিনি আমাদেরকে তাঁর অনেক মুমিন বান্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। (২৭:১৫)

আমাদের জীবনে আমরা যখন কোনো কাজে সাফল্য পাই তখন আমরা কি সেটাকে নিজেদের অর্জন ভাবি, নাকি আল্লাহর রহমত হিসেবে বিবেচনা করে আল্লাহর দরকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে লুটিয়ে পড়ি? মুসা আলাইহিওয়াসাল্লামের লোকদের কথা আল্লাহ্ কুরআনে বলছেন-

অতঃপর যখন শুভদিন ফিরে আসে, তখন তারা বলতে আরম্ভ করে যে, এটাই আমাদের প্রাপ্য। আর যদি অকল্যাণ এসে উপস্থিত হয় তবে তাতে মূসার এবং তাঁর সঙ্গীদের অলক্ষণ বলে অভিহিত করে। (৭:১৩১)

অর্থ্যাৎ ভালো কিছু ঘটলে তারা সেটাকে নিজেদের প্রাপ্য মনে করে। আমাদের নিজেদের স্বভাবও কি এমন?

আমাদের বুঝতে হবে যে দুনিয়ার যে কোনো অর্জন, প্রাপ্তি তখনই আল্লাহর রহমত যদি তা আমাদের আল্লাহর আরো বেশী নৈকট্যশীল করে।

পক্ষান্তরে যদি তা আমাদের নিজেদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হিসেবে ভাবতে শেখায় এবং অহংকারী ও স্বেচ্ছাচারী করে তোলে, তবে তা আসলে রহমত নয়, শাস্তি।

[1] কিতাবের জ্ঞান আছে-আল্লাহর এই সৃষ্টি আসলে কে ছিল এ নিয়ে কিছু জানা যায় না।

শিকড়ের সন্ধানে-২৩

আমরা বর্ণনা করছিলাম রাণী বিলকিস ও সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লামের মধ্যবর্তী ঘটনা। সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লাম যখন তাঁর দূত মারফত আগে থেকেই খবর পেলেন যে রাণী বিলকিস তাঁর সাথে দেখা করতে আসছেন, তখন তিনি তাকে হতবাক করে দেয়ার জন্য কিছু কৌশল অবলম্বন করলেন। কুরআন আমাদেরকে এই কাহিনী বর্ণনা করছে-

সুলায়মান বললেন, বিলকীসের সামনে তার সিংহাসনের আকার-আকৃতি বদলিয়ে দাও, দেখব সে সঠিক বুঝতে পারে, না সে তাদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের দিশা নেই? (২৭:৪১)

রাণী বিলকিস আগেই তাঁর দূতের কাছ থেকে সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লামের রাজত্বের প্রতিপত্তি ও বিশালতা সম্পর্কে জানতে পেরেছিল। কিন্তু চোখের সামনে তাঁর নিজের সিংহাসনের অনুরূপ নির্মাণ দেখে সে একটু দ্বিধান্বিত হয়ে গেল। কারণ এটা ছিল একটু অন্যরকম, আরো জাঁকজমকপূর্ণ। আর তাঁর রাজত্ব ও সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লামের রাজত্বের মাঝে দূরত্ব এত বেশী ছিল যে এত তাড়াতাড়ি এটা নিয়ে আসাও ছিল এক প্রকার অসম্ভব। সে নিজে আসার আগেও তো এটাকে যথাস্থানে দেখে এসেছে। তাই তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হল, তখন সে উত্তর অনিশ্চিত কণ্ঠে দিল –

অতঃপর যখন বিলকীস এসে গেল, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, তোমার সিংহাসন কি এরূপই? সে বলল, মনে হয় এটা সেটাই। (২৭:৪২)

উনার এই হত বিহ্বল অবস্থার মাত্রাকে আরো ত্বরান্বিত করতে সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লাম তাঁকে নিয়ে গেলেন উনার নিজস্ব প্রাসাদে। এটা ছিল পাতলা আয়নার তৈরি। অথচ খোলা চোখে দেখে মনে হবে যেন পানির তৈরি। তাই রাণী বিলকিস পা যেন না ভিজে সেজন্য পা উঁচু করতে উদ্যত হলেন, তখন সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লাম তাকে সত্যটা জানালেন।

তাকে বলা হল, এই প্রাসাদে প্রবেশ কর। যখন সে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করল সে ধারণা করল যে, এটা স্বচ্ছ গভীর জলাশয়। সে তার পায়ের গোছা খুলে ফেলল। সুলায়মান বলল, এটা তো স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ। (২৭:৪৪)

এই ঘটনাটা রাণী বিলকিসের ঈমান আনার জন্য যথেষ্ট ছিল, কারণ ক্রমান্বয়ে সে বুঝতে পেরেছিল যে কোনো মানুষের পক্ষে নিজ ক্ষমতায় এমন নান্দনিক স্থাপত্য কর্ম নির্মাণ করা সম্ভব নয়। সাথে ছিল সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লামের নম্রতা ও ভদ্রতা। উনি নিশ্চিত বুঝতে পারলেন যে সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লাম যে দ্বীন মেনে চলছেন সেটাই সত্য, উনার রাব্ব ব্যতীত আর কোনো শক্তি ইবাদাতের যোগ্য নয়। তিনি ঈমান আনার ঘোষণা দিয়ে বলে উঠলেন-

হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করেছি। আমি সুলায়মানের সাথে বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা আল্লাহর কাছে আত্নসমর্পন করলাম। (২৭:৪৪)

তাঁর এই ঘোষণার শব্দচয়নের মাঝে একটা দারুণ কনসেপ্ট লুকিয়ে আছে। রাণী বিলকিস যখন নিজের ভুল বুঝতে পারলেন তখন তিনি বললেন 'আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করেছি'... যদি আমরা যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারি, তবে এটা আমাদের একটা বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে। কুরআন যতবার মানুষের কোনো পাপের কথা উল্লেখ করেছে ততবার সে ব্যাপারটাকে উপস্থাপন করেছে নিজের সাথে জুলুম করা হিসেবে। অর্থ্যাৎ আমরা যখন পাপ করি, তখন প্রকারান্তরে আমরা আমাদের জন্যই দুর্ভাগ্য বয়ে নিয়ে আসি, আল্লাহর এতে কিছুই না!

সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লামের ন্যায় বিচারঃ

শুধু এই সুবিশাল রাজত্বই নয়, সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লামের উপর আল্লাহর অসীম রহমতের মাঝে আরো একটি ছিল ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার এক অনুপম ক্ষমতা। আল্লাহ্ বলছেন-

এবং স্মরণ করুন দাউদ ও সুলায়মানকে, যখন তাঁরা শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার করেছিলেন। তাতে রাত্রিকালে কিছু লোকের মেষ ঢুকে পড়েছিল। তাদের বিচার আমার সম্মুখে ছিল। অতঃপর আমি সুলায়মানকে সে ফায়সালা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং আমি উভয়কে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দিয়েছিলাম। (২১:৭৮-৭৯)

এখানে মূলত কেসটা দাউদ আলাইহিওয়াসাল্লামের শাসনামলে তাঁর সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিল, কিন্তু সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লাম তখন ওখানেই ছিলেন। যেহেতু নিজের মেষপালকে সামলে রাখা মালিকের দায়িত্ব, তাই দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম রায় দিলেন যে যার ক্ষেত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাকে মেষগুলো দিয়ে দেয়া হবে যাতে সে তার ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারে।

কিন্তু সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লাম চিন্তা করলেন যে এক দিনের এই ভুলের জন্য মেষের মালিকের জীবিকা সংস্থানের উৎস স্থায়ীভাবে তার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা তাঁর কাছে

সঠিক মনে হচ্ছিল না। তাই তিনি একটি বিকল্প সমাধান দিলেন। তিনি বললেন যে মেষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিটিকে দিয়ে দেয়া হবে ঠিকই কিন্তু স্থায়ীভাবে নয়, সাময়িক ভাবে, যতদিন না তার ক্ষেত আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসছে। এটা আবার ঠিক হয়ে গেলে ক্ষেতের মালিক মেষগুলোকে আবার আসল মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেবে, শুধু মাঝখানের দিনগুলোতে সে মেষগুলোর দুধ ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে।

এটা ছিল একটা ভারসাম্যপূর্ণ রায় যা দুই পক্ষকেই সন্তুষ্ট করেছিল। দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই বিকল্প ফয়সালা শুনলেন তখন উনিও বুঝলেন যে এটা তাঁর নিজের দেয়া সিদ্ধান্তের চেয়ে ভালো, তাই উনিও সেটাই কার্যকর করলেন।

এই ঘটনা থেকে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে।

প্রথমত, বিচার-ফয়সালার ক্ষেত্রে out of the box চিন্তা করার ক্ষমতা থাকা খুব জরুরী একটা দক্ষতা। সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লামের এটা অনেক ছিল মাশাল্লাহ।

দ্বিতীয়ত, এখান থেকে প্যারেন্টিং সংক্রান্ত অনেকগুলো যুগান্তকারী শিক্ষা আমরা পাই। আমরা দেখি যে কিভাবে সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লামকে সাথে রেখেছিলেন দাউদ আলাইহিওয়াসাল্লাম বিচার কাজের মত জরুরী একটা কাজে। এভাবে তিনি ছেলেকে পরোক্ষভাবে ট্রেনিং দিচ্ছিলেন।

আমরা আরো দেখি যে কিভাবে উনি ছেলের দেয়া সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলেন স্রেফ সেটা বেশী দূরদর্শী ও ন্যায়সঙ্গত ছিল বলে। আরে ছোট মানুষ ও কী বুঝে এমন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি উনার দক্ষতাকে হেসে উড়িয়ে দেননি বরং যথার্থ সম্মান দিয়েছিলেন।

আরো শেখার আছে কিভাবে বাবা হিসেবে উনি নিজের ইগোকে বিসর্জন দিতে পেরেছিলেন। তাঁর কাছে মুখ্য ছিল ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, সেটা যার মাধ্যমেই হোক না কেন!

তৃতীয়ত, জ্ঞান আর প্রজ্ঞা এক জিনিস নয়। প্রজ্ঞা হচ্ছে সঠিক সময়ে সঠিক জ্ঞানকে প্রয়োগ করার ক্ষমতা। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এক বিশেষ রহমত যা আল্লাহ্ সবাইকে দেন না। আল্লাহ্ বলেন-

তিনি যাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা দান করেন এবং যাকে প্রজ্ঞা দান করা হয়, সে প্রভুত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়। উপদেশ তারাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানবান। (২:২৬৯)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন যে আল্লাহ্ সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লামকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দুটোই দান করেছেন। প্রজ্ঞা ছাড়া জ্ঞান আসলে অর্থহীন, এটা গ্রন্থগত তথা পুঁথিগত বিদ্যার মতন যা অনেক সময় অনেকের জন্য আশীর্বাদের বদলে বোঝা হয়ে যায়। তাই আমাদের উচিৎ জ্ঞানের পাশাপাশি হিকমতের জন্যও আল্লাহর কাছে দুআ করা।

আল্লাহ্ কর্তৃক সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লামকে পরীক্ষাঃ

আমরা এতক্ষণ ধরে শুধু সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লামের উপর আল্লাহর অসীম রহমতের কথাই পড়েছি। কিন্তু দুনিয়ার জীবনটাতো একরকম যায় না, আর নবী রাসূলরাও মানুষই ছিলেন, আমাদের মত রক্ত মাংসে গড়া মানুষ। তাই সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লামেরও একবার এমন হয়েছিল যে উনি উনার ঘোড়াদের দেখাশোনা করতে গিয়ে আসরের নামাযের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। [1] নবী রাসূলদের এই মানবীয় দিকগুলো যখন আমি পড়ি, তখন ইসলামকে আমি নতুন করে ভালোবাসতে শুরু করি। কারণ ইসলামের এটা একটা অনন্য দিক যে সেটা মানুষের সকল ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা, ভুল-ভ্রান্তি আর অসহায়ত্বকে মেনে নেয়। নিশ্চয়ই আমাদের রাব্ব সর্বজ্ঞানী ও ক্ষমাশীল।

কুরআনে আছে-

যখন তার সামনে অপরাহ্নে উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি পেশ করা হল, তখন সে বললঃ আমি তো আমার পরওয়ারদেগারের স্মরণে বিস্মৃত হয়ে সম্পদের মহব্বতে মুগ্ধ হয়ে পড়েছি-এমনকি সূর্য ডুবে গেছে। এগুলোকে আমার কাছে ফিরিয়ে আন। অতঃপর সে তাদের পা ও গলদেশ ছেদন করতে শুরু করল। (৩৮:৩১-৩৩)

অর্থ্যাৎ যখন উনি টের পেলেন যে এগুলো তাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করছে তখন উনি এগুলোকে আল্লাহর উদ্দেশে কুরবানী করে দিলেন। এটা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে কোনো কিছু যদি আমাদেরকে আল্লাহর কথা ভুলিয়ে দেয় তবে আমাদের সেটার সাথে দূরত্ব সৃষ্টি করতে হবে। সেটা হতে পারে ফেসবুক, হতে পারে ব্যবসা বাণিজ্য যা আমাদের, অনেক সময় নিয়ে নিচ্ছে ইত্যাদি।

সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লামের জীবনে আরো একটা বিশাল পরীক্ষা এসেছিল রোগের আকারে। উনি একবার এমন অসুস্থ হয়েছিলেন যে কোনো কিছু দ্বারাই আরোগ্য লাভ হচ্ছিল না, একদম চলন-শক্তিহীন হয়ে গিয়েছিলেন, পুরো রাজত্ব তাঁর হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

আল্লাহ্ বলেনঃ

আমি সোলায়মানকে পরীক্ষা করলাম এবং রেখে দিলাম তার সিংহাসনের উপর একটি নিস্প্রাণ দেহ। (৩৮:৩৫)

তখন তিনি আল্লাহর কাছে আকুল হয়ে দুআ করলেন-
হে আমার পালনকর্তা, আমাকে মাফ করুন এবং আমাকে এমন সাম্রাজ্য দান করুন যা আমার পরে আর কেউ পেতে পারবে না। নিশ্চয় আপনি মহাদাতা। (৩৮:৩৬)

উপরের এই ঘটনাটা থেকেও আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে।

প্রথমত, আমরা আজকাল 'শিফা' হিসেবে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার কালচারটাই ভুলতে বসেছি। অসুখ বিসুখ হলে ওষুধ বা ডাক্তারদের উপর পূর্ণ বিশ্বাস করে ফেলি আর ভুলে যাই যে সুস্থতার মালিক আসলে আল্লাহ্, অন্য সব কিছু উসীলা মাত্র। আল্লাহ্ যদি চান তাহলে কোনো উসীলা ছাড়াই কিংবা যখন সব উসীলা ব্যর্থ হয়েছে তখন স্রেফ আপন শক্তিমত্তা দিয়ে তাঁর বান্দাকে সুস্থ করে দিতে পারেন, যেমনটি এই ক্ষেত্রে ঘটেছে।

দ্বিতীয়ত, এই দুআটা আমাদেরকে দুআর আদব শিখায়। আমরা দেখলাম যে সুলাইমান আলাইহিওয়াসাল্লাম আল্লাহকে রাব্ব হিসেবে সম্বোধন করেছেন যেটা কুরআন জুড়ে দেখানো হয়েছে যে নবী রাসূলরা সাধারণত এভাবেই দুআ করা শুরু করতেন। অর্থ্যাৎ আল্লাহকে উপযুক্ত নামে ডাকাটা দুআ কবুলের ক্ষেত্রে সহায়ক।
তারপর তিনি ইস্তিগফার করেছেন। এই কাজটা আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহর কাছে যে কোনো কিছু চাওয়ার আগে আমাদের উচিৎ নিজেদের গুনাহগুলোর ক্ষমা প্রার্থনা করা।

তৃতীয়ত, এই সম্পদ, ক্ষমতা, স্বাস্থ্য সবই আল্লাহর দান। আল্লাহই দেন আবার আল্লাহই তা কেড়ে নিতে পারেন চোখের নিমেষে। তাই সর্বদা সচেতন থাকা উচিৎ যে এগুলো যেন আমাদের অহংকারী ও আল্লাহ্ বিমুখ না করে ফেলে।

[1] খন্দকের যুদ্ধের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেও এমনটা হয়েছিল।

শিকড়ের সন্ধানে-২৪

আমরা কথা বলছিলাম সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাসনকাল ও জীবনের নানা ঘটনাবলী নিয়ে। পড়েছি তাঁর অনন্য সব বৈশিষ্ট্যের কথা। এসব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে (আমার মতে) যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেটার উপরে আমরা আজকের পর্বে বিস্তারিত আলোকপাত করবো ইনশাল্লাহ।

কেউ কি আন্দাজ করতে পারছেন সেটা কী?

জ্বীনদের উপরে সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লামের আধিপত্য.....

একটা কথা আমি প্রায়ই বলি যে জ্বীনজগত সম্পর্কে ধারণার ব্যাপারে আমরা সাধারণত চরমপন্থা অবলম্বন করি। এক দল আছেন যারা সব কিছুকেই জ্বীনের আছর বলে মনে করেন এবং কিছু হলেই পীর, ফকিরদের কাছে যান জ্বীন ছাড়াতে। এসব পীরদের অলৌকিক কর্মকাণ্ড [1] দেখে তারা বিস্ময়াভিভূত হয়ে যান, তাদেরকে আল্লাহর আউলিয়া ভেবে শিরকে লিপ্ত হয়ে যান। তাদের এইসব গোঁড়া আচার আচরণকে স্রেফ কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিয়ে আরেক শ্রেণীর মুসলিম আবার জ্বীনের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে বসেন, ফলে আমাদের জীবনে অনেক অসুস্থতা, ঝামেলা ইত্যাদি যে জ্বীনের প্রভাবে হয় এটার বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করেন। তাদের অনেকেই হয়তো জানেন না যে জ্বীনে বিশ্বাস আমাদের ঈমানের অঙ্গ কারণ এটা গায়েবে বিশ্বাসের [1] সাথে সংশ্লিষ্ট, আল্লাহ্ কুরআনে এদের কথা উল্লেখ করেছেন, এদের ব্যাপারে বহু সহীহ হাদীস রয়েছে।

আজকের পর্বে আমরা জ্বীনজগতে বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু মূলনীতি তুলে ধরবো ইনশাল্লাহ।

প্রথমত, ভালো জ্বীন কখনো মানুষের সাথে যোগাযোগ করে না।

তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে অনেক জ্বীন হুজুরের যে 'ভালো' পোষা জ্বীন থাকে বলে আমরা শুনে থাকি? সেটা ব্যাপারটা কী?

দ্বিতীয়ত, মানুষ কখনো জ্বীনদের উপরে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না, তাদেরকে এই ক্ষমতা দেয়া হয়নি।

তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে তা করতেন?

তৃতীয়ত, জ্বীনরা গায়েব জানে না।

তাহলে অনেক ভাগ্য গণকের কথা যে ফলে যায়, সেটা কিভাবে হয়?

আমরা এখন একে একে এই সব কয়টি মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করবো। তবে তার আগে বলে নেয়া ভালো যে মানুষের মাঝে যেমন মুসলিম ও কাফির আছে, জ্বীনদের মাঝেও তেমন আছে। আর আমাদের প্রত্যেকের সাথেই একটি সঙ্গী জ্বীন আছে, যার নাম ক্বারিন, তার কাজই হলো আমাদেরকে খারাপ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করা। [2] এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ার পরীক্ষার একটা অংশ। আর এই বিষয়টি আল্লাহ্ স্বয়ং কুরআনে সরাসরি উল্লেখ করেছেন-

তার সঙ্গী শয়তান বলবেঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমি তাকে অবাধ্যতায় লিপ্ত করিনি। বস্তুতঃ সে নিজেই ছিল সুদূর পথভ্রান্তিতে লিপ্ত। আল্লাহ বলবেনঃ আমার সামনে বাকবিতন্ডা করো না আমি তো পূর্বেই তোমাদেরকে আযাব দ্বারা ভয় প্রদর্শন করেছিলাম। (৫০:২৭-২৮)

এখানে মানুষ ও তার ক্বারীনের মাঝে তর্কের কথা বলা হচ্ছে। কিয়ামতের দিন ওরা একে অন্যকে দোষারোপ করতে থাকবে।

ফিরে আসছি মূলনীতিগুলোর আলোচনাতে। প্রথম ও দ্বিতীয় মূলনীতি আসলে খুব নিবিড়ভাবে জড়িত। আমাদের জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে (যেমনঃ সংসার ভাঙা, বিয়ে থেমে থাকা ইত্যাদি) যেগুলো আসলে জ্বীনদের সহায়তায় করা হয়। আর যেহেতু ভালো জ্বীনরা কখনো মানুষের সাথে যোগাযোগ করে না, তাই এগুলো করা হয় খারাপ জ্বীনদের সাহায্য নিয়ে। আবার এইসব খারাপ জ্বীনদের উপরে কোনো মানুষ কখনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না...তাহলে উপর্যুক্ত কাজগুলো আসলে কিভাবে করা হয়?

এটা করা হয় 'পারস্পরিক সমঝোতার' ভিত্তিতে। আমরা সবাই জানি যে শয়তানের মিশন হচ্ছে যত বেশী সংখ্যায় সম্ভব আদম সন্তানকে তার সাথে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া। জ্বীনদের মাঝে যারা তার অনুসারী, তারা তাকে এ কাজে সাহায্য করে। এ ব্যাপারে নিচের হাদীসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ-

The Prophet (pbuh) said: "Iblis places his throne upon water; he then sends detachments (for creating dissension between people); the nearer to him in rank are those who are most notorious in creating dissension. One of them comes and says: "I did so and so." And he says: "You have done nothing." Then one amongst them comes and says: "I did not spare so and so until I sowed the seed of discord between a husband and a wife." Shaytaan goes near him and says: "You have done well." He then embraces him" (Sahih Muslim and narrated by Jabir Ibn 'Abdullah). **[3]**

অর্থ্যাৎ জ্বীনদের একটা দল সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করে মানুষকে বিপথগামী করার, বিনিময়ে শয়তান তাদেরকে নানা ধরণের পুরষ্কারের প্রলোভন দেখায়। [1] কিন্তু আদতে শয়তানের কি সাধ্য আছে তাদেরকে পুরস্কৃত করার? নিচের আয়াতটা একদম সত্য উন্মোচন করে দিয়েছে আমাদের সামনে-

যখন সব কাজের ফায়সলা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবেঃ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছি, অতঃপর তা ভঙ্গ করেছি। তোমাদের উপর তো আমার কোন ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এতটুকু যে, আমি তোমাদেরকে ডেকেছি, অতঃপর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছ। অতএব তোমরা আমাকে ভৎর্সনা করো না এবং নিজেদেরকেই ভৎর্সনা কর। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী নই। এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী নও। ইতোপূর্বে তোমরা আমাকে যে আল্লাহর শরীক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করি। নিশ্চয় যারা জালেম তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১৪:২২)

এখন এই যে শয়তানের ওয়াদা দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে একদল জ্বীন মানুষকে বিপথগামী করতে উদ্যোগী হয়, মানুষের মাঝে একদল স্থূলবুদ্ধি সম্পন্নরা আবার তাতে সাড়া দেয়। তারা দুনিয়াতে অর্থ, ক্ষমতা, খ্যাতি এগুলোর মোহে আবিষ্ট হয়ে গিয়ে শয়তানের সাহায্য নেয়, নানা ধরনের কুফরী কালামে লিপ্ত হয়-যেমন তাবিজ কবজ, যাদু টোনা [2], ভাগ্য গণনা ইত্যাদি। কিন্তু ওই যে বললাম যে মানুষের পক্ষে জ্বীনদের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা সম্ভব না, তাই জ্বীনরা ওইসব মানুষদের সাথে একটা 'চুক্তি' করে। সেই চুক্তির ধারা অনুযায়ী মানুষ নানা ধরণের শিরকি, হারাম কাজে লিপ্ত হয় [3], জিনদের ইবাদত করে। বিনিময়ে দুষ্ট ও শয়তান জিনেরা তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয় এবং মানুষ যেসব কাজ করতে চায় সেগুলো করে দেয়। যেমনঃ কাউকে বাণ মেরে অসুস্থ করে ফেলা, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটানো, ভবিষ্যৎ বলে দেয়া, মানসিক বিকৃতি, ভুল দেখা বা শোনার উপসর্গ দেখা দেয়া ইত্যাদি.....

এই উভয় দলের মাঝে এই সমঝোতাপূর্ণ সম্পর্কের কথা আল্লাহ্ কুরআনে আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন-

আর যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে সমবেত করবেন। সেদিন বলবেন, "হে জিনের দল, মানুষের অনেককে তোমরা বিভ্রান্ত করেছিলে" এবং মানুষদের মধ্য থেকে তাদের সঙ্গীরা বলবে, "হে আমাদের রব, আমরা একে অপরের দ্বারা লাভবান হয়েছি এবং আমরা পৌঁছে গিয়েছি সেই সময়ে, যা আপনি আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন।" তিনি বলবেন, "আগুন তোমাদের ঠিকানা, তোমরা সেখানে স্থায়ী হবে। তবে আল্লাহ যা চান তা ব্যতীত।" নিশ্চয় তোমার রব বিজ্ঞ, সর্বজ্ঞ। (৬:১২৮)

জ্বীনদের সাহায্য নিয়ে আরো যে একটা কাজ হয় সেটা হচ্ছে ভবিষ্যৎ গণনা। আমরা আগেই আমাদের তৃতীয় মূলনীতিতে জেনেছি যে জ্বীনরা গায়েব জানে না। তাহলে এই ভাগ্য গণনার ব্যাপারটা কিভাবে হয়? সেটাও আল্লাহ্ তাঁর অসীম রহমতে আমাদের হাদীসের মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছেন-

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে তিনি আল্লাহর রাসূলকে বলতে শুনেছেন: "ফেরেশতারা আকাশের সীমানায় নেমে আসমানে মীমাংসা হওয়া বিষয়ের উল্লেখ করেন, ফলে শয়তানরা তা চুরি করে শোনে [4] এবং গণকদের কাছে গোপনে পৌঁছে দেয়, অতঃপর তারা এর সাথে নিজেরা একশটি মিথ্যা কথা বানিয়ে বলে। বুখারী (৩২১০)

আর ভাগ্যগণকরা যখন কারো অতীতের কোনো exclusive ঘটনা জানিয়ে আস্থা অর্জন করার চেষ্টা করে, সেটা করে ওই ব্যক্তি (যে গণকের কাছে এসেছে) তার ক্বারীনের সাহায্য নিয়ে। ক্বারীন যেহেতু ওই লোকের সাথে শুরু থেকেই আছে, তাই সে উনার ব্যাপারে সব তথ্যই জানেন!

[1] অলৌকিক কর্মকাণ্ডগুলো অধিকাংশই হয় জ্বীনদের সাহায্যে। যেমনঃ কেউ শূন্যের উপর ভেসে আছে দেখে অনেকে তাকে আল্লাহর আউলিয়া ভাবা শুরু করে। অথচ ব্যাপারটা আসলে সহজ, জ্বীনটা লোকটাকে হাত দিয়ে উপরে তুলে রেখেছে, কিন্তু আমরা মানুষরা জ্বীনটাকে দেখতে পাচ্ছি না, যদিও তারা ঠিকই আমাদের দেখতে পায় **(৭:২৭)**

[2] গায়েবের জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে এমন সবকিছু যা মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা জানা যায় না। সেটা হতে পারে অতীতের ঘটনা, কিংবা ভবিষ্যতের ঘটনা কিংবা দূরত্বের কারণে মানুষের জ্ঞান থেকে অন্তরালে থাকা কিছু যেমন জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি। গায়েবের জ্ঞানের একমাত্র সহীহ উৎস 'ওহী'। তবে এর অর্থ এই নয় যে নবী-রাসূল কিংবা ফেরেশতারা গায়েব জানেনবরং , গায়েবের জ্ঞানের একাংশ আল্লাহ পাক তাদেরকে জানালে তবেই কেবল তারা তা জানতে পারে। আর তাই এটি ইসলামী আকীদার একটি অন্যতম মূলনীতি যে গায়েবের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ পাকের বৈশিষ্ট্য, এই বৈশিষ্ট্য কারও প্রতি আরোপ করলে তাকে আল্লাহর সমকক্ষ করা হয়।

[3] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন এর ব্যাতিক্রম। হাদীসে আছে-

It was narrated that 'Abd-Allaah ibn Mas'ood said: The Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) said: "There is no one among you but a companion from among the jinn has been assigned to him." They

said, “Even you, O Messenger of Allaah?’ He said, “Even me, but Allaah helped me with him and he became Muslim (or: and I am safe from him), so he only enjoins me to do that which is good.” Narrated by Muslim, 2814

[4] এই নোটের মূল থিমের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট না কিন্তু খুব জরুরী একটা বিষয় হচ্ছে একটা ইসলামী সমাজ গঠনে পরিবারের অপরিসীম গুরুত্ব আমরা মুসলিমরা ঠিকঠাক মত না বুঝলেও শয়তান ঠিকই বোঝে! সে বোঝে যে স্বামী স্ত্রীর মাঝে ঝামেলা করতে পারলেই অন্য অনেক অনাচারের পথ খুলে যাবে।
তাই আমাদেরকে কি উচিৎ না নিজেদের মাঝে যতটা সম্ভব compromise করে হলেও একটা ইসলামিক ঘর বিনির্মাণে সর্বশক্তি নিয়োগ করা?
[5] শয়তানের কমন দুইটা পুরষ্কার হচ্ছে power & kingdom, সাথে Eternal life. আমরা দেখবো যে ইবলিস আদম আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও ঠিক একই কথা বলেছিল। সে তাঁর কাছে এসেছিল একজন চরম হিতাকাংখী হিসেবে (৭:২০-২১), (২০:১২০)
[6] তবে এগুলোর কোনোটাই কার্যকর হয় না যদি না আল্লাহ্ অনুমতি দেন। এগুলোর স্বীকার হলে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে উল্টা যাদুটোনার আশ্রয় না নিয়ে শরীয়তসম্মত চিকিৎসার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকা। এ ব্যাপারে জানতে নিচের নোটটি পড়া যেতে পারে-http://on.fb.me/1v9D5EX
[7] কিছু কিছু কাজ অকল্পনীয় যেমন মেয়েদের ঋতুস্রাবের রক্ত পান, কুরআনের মুসহাফের উপর বাথরুম করা, সেটা দিয়ে শৌচকাজ করা, অন্য মানুষ বা পশুপাখির রক্ত পান, বিশিষ্ট কোনো মানুষের রক্ত হাজির করা (ফলে তারা তাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়, অনেকসময় করে), জ্বীনদের সিজদাহ করা, তাদের নামে উৎসর্গ করা ইত্যাদি।
[8] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়্যতের পূর্বে জ্বীনরা আকাশের সীমানায় অবাধে বিচরণ করতে পারতো,আসমানে গৃহীত সিদ্ধান্তের ব্যাপারে জানা তাদের জন্য সহজ ছিল। এজন্যই কুরাইশদের মাঝে ভাগ্য
গণকদের বিপুল মর্যাদা ছিল। কিন্তু কুরআন নাযিল হওয়া শুরু হওয়ার পর থেকে তাদের প্রথম আসমান পার হওয়ার ক্ষমতাই চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হয়। মূলত কুরআন যে নাযিল হয়েছে সেটা তারা এই ঘটনা থেকেই বুঝতে পারে। এরপর থেকে কোনো খবর তাদের শুনতে হয় চুরি করে, যদি ফেরেশতারা টের পেয়ে যায় তাহলে আগুনের গোলা ছুঁড়ে দেয়া হয়। যারা পালইয়ে বাঁচতে পারে, শুধু তারাই কিছুটা খবর সংগ্রহ করতে পারে। বিস্তারিত জানার জন্য সূরা জ্বীনের তাফসীর পড়া যেতে পারে।

শিকড়ের সন্ধানে-২৫

গত পর্বে আমরা জ্বীনজগতের ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস সংক্রান্ত কিছু মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে এটার সাথে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম অর্থ্যাৎ সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী সেটার কী সম্পর্ক! প্রকৃত সত্য হচ্ছে যে এরা এতটাই ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে মূলনীতিগুলোর ব্যাপারে প্রাথমিক ধারণা না থাকলে উনার শাসনামলের খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনা আমরা বুঝতামই না।

আগের পর্বে আমরা বারবার বলে এসেছি যে মানুষের পক্ষে জ্বীনদের উপর আধিপত্য বিস্তার করা সম্ভব না। এর একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ্ তাঁকে এই বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছিলেন যা আর কাউকে দেননি, এমনকি আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও না। এটা আমরা কিভাবে জানি? নিচের হাদীস থেকে-

Abu Huraira reported that he heard the Messenger of Allah (may peace be upon him) saying: A highly wicked one amongst the Jinn escaped yesterday night to interrupt my prayer, but Allah gave me power over him, so I seized him and intended to tie him to one of the pillars of the mosque in order that you, all together or all, might look at him, but I remembered the supplication of my brother Sulaiman: "My Lord, forgive me, give me such a kingdom as will not be possible for anyone after me" (Qur'an,38: 36).

পক্ষান্তরে সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে আল্লাহ্ বলছেন-

আর সকল শয়তানকে তার অধীন করে দিলাম অর্থৎ, যারা ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী। এবং অন্য আরও অনেককে অধীন করে দিলাম, যারা আবদ্ধ থাকত শৃঙ্খলে। (৩৮:৩৭-৩৮)

কতক জিন তার সামনে কাজ করত তার পালনকর্তার আদেশে। তাদের যে কেউ আমার আদেশ অমান্য করবে, আমি জ্বলন্ত অগ্নির-শাস্তি আস্বাদন করাব। তারা সোলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী দুর্গ, ভাস্কর্য, হাউযসদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং চুল্লির উপর স্থাপিত বিশাল ডেগ নির্মাণ করত। (৩৪:১২-১৩)

আমাদের হয়তবা মনে আছে যে মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে যাদুবিদ্যার প্রচলন খুব বেশী ছিল। উনার সাথে যাদুকরদের ঘটনাও আমরা বিস্তারিত উল্লেখ করেছি। কিন্তু এই যাদুবিদ্যার চর্চা ছিল মিশরের ফেরাউনের অনুসারীদের কাজ। শোনা যায় যে ফিরাউন নিজেও এই কাজ করতো আর সেজন্যই নীল নদের প্রবাহ ওর নির্দেশে (আল্লাহর অনুমতিক্রমে) নিয়ন্ত্রিত হত (৪৩:৫১)। কিন্তু তার কবল থেকে উদ্ধারের পর বনী ইসরাঈলদের জন্য মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে যে শরীয়ত নির্ধারিত হয় তাতে যাদুবিদ্যা নিষিদ্ধ ছিল।

আমরা দেখেছি যে বনী ইসরাঈলদের অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে মিশরীয়দের অধীনে থাকাকালীন অভ্যাসগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে পারছিল না। মূর্তিপূজার মত এক্ষেত্রেও তাদের মাঝে যাদুবিদ্যার চর্চা চলে আসছিল। সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শাসনামলে এটাকে জোরপূর্বক নিষিদ্ধ করে দেন। তিনি একটা বৈপ্লবিক কাজ করেন, যেসব বই পুস্তক যাদুবিদ্যা চর্চা ও শেখানোর কাছে ব্যবহৃত হত সেগুলো সব একসাথে নিয়ে একটি খুব নিরাপদ ভল্টে রেখে দেন যেন এগুলো একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

সেই জায়গাটা কী ছিল আমরা কি জানি? সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সিংহাসনের একদম নিচে সেটাকে মাটিচাপা করে দেন।
কাহিনীর চমকটা এইখানেই। এভাবে যাদুচর্চা বন্ধ করে দেয়ায় যারা এই কাজ করতো তারা উনার উপর খুবই ক্ষুব্ধ ছিল। তারা উনার নামে অপবাদ দেয়া শুরু করে যে সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যকে নিষেধ করলে কী হবে, নিজেই এই কাজ করে জ্বীনদেরকে বশীভূত করেন ও তাদের দিয়ে নানারকম কাজ করিয়ে নেন। কেউ যেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত না হতে পারে সেজন্যই তিনি আসলে জোরপূর্বক এই কাজগুলো বন্ধ করিয়েছেন (আস্তাগফিরুল্লাহ)। আল্লাহ্ যে বিশেষভাবে উনাকে এই ক্ষমতা দিয়েছেন এবং উনি যা কিছু করেন সবই যে আল্লাহর অনুমতিক্রমে সেটা ওরা বিশ্বাস করতে চাইতো না। মোটকথা হচ্ছে যাদু ও আল্লাহর মুযিজার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে ওরা অপরাগ ছিল.....

এখানে উল্লেখ্য যে মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে যাদুকররা উনার মুযিজা দেখার সাথে সাথে ঈমান এনেছিল কারণ এ ফিল্ডে ওদের অসামান্য পারদর্শীতা ছিল এবং সেই জ্ঞান দিয়ে[1] ওরা বুঝতে পেরেছিল যে এটা মুযিজা, যাদু নয়। তাই আল্লাহ্ সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি মানুষকে যাদুবিদ্যা শিক্ষা দিবেন যাতে তারা যাদু ও মুযিজার মাঝে পার্থক্য বুঝতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তিনি হারুত ও মারুত নামে দুইজন ফেরেশতাকে পাঠালেন যারা মানুষকে এটা শেখানোর আগেই বলে

নিত যে এটা তোমাদের জন্য পরীক্ষা। আমরা তোমাদেরকে এটা শিখাচ্ছি[2], কিন্তু যদি তোমরা এটা প্রয়োগ করো তবে তা তোমাদের ইসলামের বাইরে নিয়ে যাবে.....

কিন্তু এই ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে জানা থাকা সত্ত্বেও ওদের মাঝে কেউ কেউ সেটা ঠিকই প্রয়োগ করা শুরু করলো। এই ঘটনাটা সম্পর্কে কুরআন আমাদের জানাচ্ছে-

আর তারা অনুসরণ করেছে, যা শয়তানরা সুলাইমানের রাজত্বে পাঠ করত। আর সুলাইমান কুফরী করেনি; বরং শয়তানরা মানুষকে যাদু শেখানোর মাধ্যমে কুফরী করেছে। আর [তারা অনুসরণ করেছে] যা নাযিল করা হয়েছিল বাবেলের দুই ফেরেশতা হারূত ও মারূতের উপর। আর তারা কাউকে শেখাত না যে পর্যন্ত না বলত যে, "আমরা তো পরীক্ষা, সুতরাং তোমরা [আমাদের কাছ থেকে যাদু শেখার মাধ্যমে] কুফরী করো না। এরপরও তারা এদের কাছ থেকে শিখত, যার মাধ্যমে তারা পুরুষ ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাত। অথচ তারা তার মাধ্যমে কারো কোন ক্ষতি করতে পারত না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। আর তারা শিখত যা তাদের ক্ষতি করত, তাদের উপকার করত না এবং তারা নিশ্চয় জানত যে, যে ব্যক্তি তা ক্রয় করবে, আখিরাতে তার কোন অংশ থাকবে না। আর তা নিশ্চিতরূপে কতই-না মন্দ, যার বিনিময়ে তারা নিজদেরকে বিক্রয় করেছে। যদি তারা বুঝত। আর যদি তারা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে অবশ্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে [তাদের জন্য] প্রতিদান উত্তম হত। যদি তারা জানত। (২: ১০২-০৩)[3]

মজার ব্যাপার হচ্ছে যারা শয়তানের পূজা করে (Illuminati বা free mason) আজ পর্যন্ত তাদের কাজকর্মের একটা মেইন হেড কোয়ার্টার হচ্ছে ব্যবিলিয়ন আর মিশরের পিরামিডের অবস্থানস্থল। অনেক হলিউডের নায়ক নায়িকারা সেখানে গিয়ে বাৎসরিক নানা উৎসব উদযাপন করে থাকেন। নানা ধরণের উৎসর্গ করে থাকে যাদের ওরা বলে Ritual Murder। ফলে ওরা নিজেদেরকে শক্তিশালী মনে করে। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা হয়তো পরিষ্কার হবে। হাদীস থেকে[4] আমরা জানি যে শয়তান মানুষের রক্তের মাঝেও চলাফেরা করতে পারে। ফলে হয়তবা যেটা হয় যে সে কোনো একটা স্নায়ুতে খোঁচা দিয়েছে যার কারণে শয়তানের পূজারীর অস্থির লাগছে। কোনো ওষুধে এটা কাজ হয় না। তখন সে তাকে বলে যে তুমি যদি আমাকে ৮ বছর বয়সী কোনো মেয়ের চোখ এনে দাও, তাহলে এটা ঠিক হয়ে যাবে। বাধ্য হয়ে তখন সে হত্যা করে এবং সেটা উৎসর্গ করে শয়তানকে। তখন শয়তান তার নিজের তৈরি করা শারীরিক সমস্যাটা দূর করে দেয়, ফলে লোকটা সুস্থ বোধ করতে থাকে। এজন্য সে আরো উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে শয়তানের আনুগত্য করতে থাকে কারণ এতে তার কাজ হচ্ছে। [5]

[1] আমরা আগেও বলেছি যে জ্ঞান, সেটা যেই বিষয়েরই হোক না কেন যদি গভীর হয় তবে তা আল্লাহকে চিনতে সাহায্য করে। আবার ইসলামের একটা দারুণ সৌন্দর্য্য হচ্ছে যে কোনো ফিল্ডের জ্ঞানকেই ইসলামীকরণের বা ইসলামের কাজে ব্যয় করার সুযোগ আছে। একবার একজনের কথা শুনেছিলাম যে সাউণ্ড ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন এবং মিউজিক নিয়ে গবেষণা করতেন, সেই উনিই ইসলামকে নতুনভাবে উপলব্ধি করার পর সেই দক্ষতা কাজে লাগানো শুরু করেছিলেন ইসলামিক লেকচারগুলোর শব্দের মান উন্নয়নের কাজে।

[2] এখান থেকে আমরা বুঝি যে 'মন্দ' সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা থাকা উচিৎ যেন আমরা তা থেকে দূরে থাকতে পারি। যেমন মনে করুন অনেক মানুষকে বুঝানোর জন্য টেলিভিশন ব্রেনের কী ক্ষতি করে সেটা নিয়ে মুসলিমদের গবেষণা করা দরকার। এসব বিস্তারিত জ্ঞান না থাকলে আমরা বুঝবো না এটার সমস্যাগুলো কী কী এবং আমাদের ঘরে এটা থাকাকে বিশাল কোনো সমস্যা মনে করবো না...

[3] এই দুই আয়াতে উল্লিখিত যাদুটোনা কুফর হওয়ার ব্যাপারে কয়েকটি দলীল রয়েছে: ১) বরং শয়তানরা মানুষকে যাদু শেখানোর মাধ্যমে কুফরী করেছে - এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে যাদুটোনা শিক্ষা দেয়া কুফর। ২) আর তারা কাউকে শেখাত না যে পর্যন্ত না বলত যে, "আমরা তো পরীক্ষা, সুতরাং তোমরা [আমাদের কাছ থেকে যাদু শেখার মাধ্যমে] কুফরী করো না। - এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে যাদুটোনা শেখা কুফর। ৩) এবং তারা নিশ্চয় জানত যে, যে ব্যক্তি তা ক্রয় করবে, আখিরাতে তার কোন অংশ থাকবে না। - আর আখিরাতে যার কোন অংশই নেই সে হচ্ছে অমুসলিম, কাফির। ৪) যদি তারা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত - অর্থাৎ তাদের ঈমান ছিল না।

[4] "Indeed, Shaytaan flows through the son of Adam like the flow of his blood."
[Al-Bukhaari no.2039 and Muslim no.2175]
এজন্যই রোযা রাখলে শয়তানের প্রভাব কমে যায় কারণ খাদ্য ও পানিয়ের অভাবে রক্তনালী সংকুচিত হয়ে যায় যা শয়তানের চলাচলকে কঠিন করে দেয়।

[5] অনেকেই তাবিজ কবজ ব্যবহার বা মাজার পূজার পক্ষেও এমন সাফাই দেন যে তাদের তো উপকার হয়েছে। এইজন্যই আমাদের জানা দরকার যে আসলে ব্যাপারগুলো কিভাবে ঘটে, যেন আমরা কাজের ফলাফল দেখে বিভ্রান্ত না হয়ে যাই। উপকার হওয়াই কোনো কিছু বৈধ হবার প্রমাণ নয় বরং এজন্য কুরআন সুন্নাহ কী বলে সেটা আমাদের দেখতে হবে। বরং উপকার হলে সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় পরীক্ষা কারণ তাতে সে শিরকের উপর অবিচল থাকে।

শিকড়ের সন্ধানে-২৬

আমরা কথা বলছিলাম সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাসনামলে যাদুবিদ্যা বন্ধ করে দেয়ার পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে। আমরা দেখেছি যে হারুত ও মারুত যাদুবিদ্যা ও মুযিজার মাঝে পার্থক্য বুঝানোর জন্য যে শিক্ষা তৎকালীন বনী ইসরাঈলয়দেরকে দিয়েছিল তা চর্চা করা কুফরি জেনেও তারা নিজেদের মাঝে প্রয়োগ করা শুরু করেছিল।
ইহুদী ধর্মের এই সাথে ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকা জ্ঞানের এই শাখা মূলত Qabbalah নামে পরিচিত। আপনি যদি এই নাম লিখে সার্চ দেন গুগলে তাহলে দেখবেন যে এটা একধরণের Mystic Branch. এর মূল থিম হচ্ছে সংখ্যাতত্ত্ব যা দিয়ে নানা ধরণের যাদুবিদ্যা চর্চা করা হয়...

সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার হচ্ছে ইহুদীদের ষড়যন্ত্র হিসেবে এই ব্যাপারটা খুব সূক্ষ্মভাবে ইসলাম ধর্মের মাঝেও প্রবেশ করেছে। আমাদের অনেকের হয়তো মনে আছে যে ছোটবেলায় আমাদের মুরুব্বীরা চিঠির উপরে লিখতেন ৭৮৬, যেটার অর্থ নাকি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। আমি প্রথম যখন ছোটবেলায় এটা শুনেছিলাম খুব অবাক হয়েছিলাম যে ৭৮৬ র মানে এটা হয় কিভাবে!
মজার ব্যাপার হল আল্লাহর কালাম লেখা আছে ভেবে অনেকে যে তাবিজগুলো ব্যবহার করে সেগুলোতে আসলে এসব শয়তানী বিদ্যার সূত্র লেখা হয়। আর বলা হয় যে এগুলো বিভিন্ন সূরার প্রতীক! আপনি যদি কখনো কোনো তাবিজ আসলে খুলে দেখেন তাহলে দেখবেন যে সেখানে মোটেও আরবীতে কুরআন লেখা নেই বরং দুর্বোধ্য কিছু নকশা লেখা আছে। [1] আদতে সেগুলোর মাধ্যমে কোনো শয়তানের আশ্রয় চাওয়া হয় বা শয়তানের ইবাদাত করা হয়! একবার আল কাউসারের একটা কোর্সে যে শেখ ক্লাস নিচ্ছিলেন (শরীয়াত সম্মতভাবে জ্বীন তাড়ানোর ব্যাপারে যার অভিজ্ঞতা আছে ও এসব ব্যাপারে সুগভীর পড়াশোনা আছে) তিনি উপস্থিত দর্শকদের বললেন কারো সাথে যদি তাবিজ থেকে থাকে তবে সাথে সাথে যেন তা খুলে ফেলা হয় কারণ তা সন্দেহাতীতভাবে শিরক। তারপর বললেন যে সবাই যেন সেগুলো ঊনার কাছে এসে জমা দেয়। জমাকৃত তাবিজগুলো খুলে খুলে ঊনি পড়ছিলেন আর আমাদের বলছিলেন যে সেখানে বিভিন্ন শয়তানের নাম লেখা আছে, তাদের স্তুতি করে তাদের সাহায্য চাওয়া হচ্ছে! [2]

সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে যে অনেক কুরআন শরীফের শুরুতে প্রতিটা সূরার ফযীলাত ও নকশা দেয়া থাকে। আমাদের বাসায় একদম ছোটবেলায় যে কুরআন শরীফটা আমরা রেগুলার পড়তাম, সেটা ছিল এইরকম নকশা ভর্তি।

মজার ব্যাপার হচ্ছে এই বিষয়গুলো অন্য সকল শিরকী ধর্মেরও অবিচ্ছেদ্য অংশ।সাধু সন্ন্যাসী বা মুনী ঋষিরা এইসব তন্ত্র মন্ত্র করতেন।

সুফীবাদের হাত ধরে আমাদের ধর্মেও এগুলোর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এগুলোর ইসলামিক ভার্সন হচ্ছে পীর ফকির যাদের আমরা আল্লাহর আউলিয়া ভেবে বিভ্রান্ত হই। আর আছেন এক শ্রেণীর হুজুর যাদের দ্বীনের জ্ঞান খুবই সামান্য, তাই অধিকাংশ সময়েই এরা এগুলো দেন না বুঝেই দেন। আর অনেকে জানলেও মানতে চান না কারণ তাবিজ বিক্রি একটি অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা। [3] সমস্যা হচ্ছে এগুলোর গ্রাহক কিন্তু শুধু অশিক্ষিতরা না। শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে আমি মানুষকে ধুমায়ে তাবিজ ব্যবহার করতে দেখেছি। এর কারণের মাঝে রয়েছে খুব তুচ্ছ কারণ যেমন বাচ্চারা রাতে বিছানায় বাথরুম করে দেয় কিংবা ভয় পায়...আবার বড় বড় বিপদ থেকে উদ্ধারের আশাও রয়েছে। আমার কাছে মনে হয় যে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হচ্ছে বিপদ আপদের সময় এগুলো না করে থাকা। অনেকে আছেন যে মুখে বলেন যে এসব তাবিজ কবজে তার বিশ্বাস নেই কিন্তু কোনো বিপদে পড়লে ঠিকই এগুলোর আশ্রয় নেন। ঈমানের পরীক্ষাটা এখানেই। অনেকে আছেন যারা দাবী করেন যে শিরকী কিছু লেখা না থাকলে কুরআনের আয়াত দিয়ে তাবিজ দেয়া যাবে স্রেফ একটা চিকিৎসা ব্যবস্থা হিসেবে। এখানে আমাদের কয়েকটা জিনিস বুঝতে হবে-

১। তাবিজ কখনওই স্পষ্ট কুরআনের আয়াত/ আল্লাহর নাম দিয়ে দেয়া হয় না। এটা যারা এসব সমর্থন করেন, তারাও স্বীকার করবেন। কারণ আমরা সবাই জানি যে কুরআনের আয়াত পবিত্র, এটা লেখা তাবিজ টয়লেট বা সব জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় না। তাই তারা যেটা করেন সেটা হচ্ছে সংখ্যা তত্ত্ব ব্যবহার করেন, যেটার কথা আগে উল্লেখ করেছি। তাদের দাবী হচ্ছে এটা স্রেফ একটা সাংকেতিক কোডের মত। আমার প্রশ্ন হচ্ছে বিভিন্ন আরবী হরফের এই যে বিভিন্ন Numerical Value assign করা হচ্ছে, এটার উৎস কী?
আমরা কখনওই এটার কোনো সহীহ উৎস খুঁজে পাবো না, কারণ উৎসটা pagan mythology, kabbalah. [4]
২। আল্লাহ কুরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় বলছেন যে এটা আরবী কুরআন। আমরা যেন ভুলে না যাই যে অমুক তাবিজ পরলে অমুক উপকার হবে-এটা গায়েবের জ্ঞান। তাই কোনো নির্দিষ্ট আমল করলে কোনো উপকার হবে এটা যদি আমরা বলতে চাই, তবে সেটার উৎস অবশ্যই হতে হবে কুরআন এবং সুন্নাহ। তাই তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেই তাবিজ ব্যবহার করা শিরক না, এটা নিঃসন্দেহে বিদআত কারণ এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদের ইচ্ছাকৃত বর্জন।

৩। এটা সর্বাংশে এড়িয়ে চলা উচিৎ কারণ আমাদের জানা নেই যে এই সংখ্যাগুলো দিয়ে কুরআনের আয়াত, আল্লাহর নাম লেখা হচ্ছে নাকি শয়তানকে ডাকা হচ্ছে।

৪। যারা তারপরও এটার উপর অটল থাকতে চান, তাদের জন্য মনে করিয়ে দিতে চাই সূরা বাক্বারার ১০১ নং আয়াতের কথা। এখানে বলা হচ্ছে-
যখন তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রসূল আগমন করলেন-যিনি ঐ কিতাবের সত্যায়ন করেন, যা তাদের কাছে রয়েছে, তখন আহলে কেতাবদের একদল আল্লাহর গ্রন্থকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করল-যেন তারা জানেই না। (২ঃ১০১)
এখানে যে আরবী শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে, সেটার connotation টা হচ্ছে Trash করা, মানে আবর্জনা যেভাবে হেলায় ছুঁড়ে দেয় মানুষ, সেভাবে। এর ঠিক পরের আয়াতেই যাদুবিদ্যা যে কুফরী সেটা বলা হচ্ছে। মানে হচ্ছে যে মানুষ যখন আল্লাহর কিতাবকে Trash করে, তখনই তারা সেগুলোকে এভাবে শয়তানি কাজে ব্যবহার করে। আমি বহু মানুষকে দেখেছি যাদের সূরা নাস মুখস্থ, কিন্তু তারা জ্বীনের অস্তিত্বে, যাদু টোনা এগুলোতে বিশ্বাস করে না। যদি কুরআনকে Trash না করা হয়, তাহলে ছাড়া কিভাবে এটা সম্ভব হতে পারে?

আমার সীমিত অভিজ্ঞতা বলে যে যারা এগুলোর উপরে অনেক ভরসা করেন, তারা আসলে শর্টকাট খোঁজেন। তাদেরকে যদি সুন্নাত উপায়ে নিজে কুরআন/ দুআ তিলাওয়াত করতে বলা হয়, তাহলে তাদের খুবই আলসেমী লাগবে এবং তারা নানা অজুহাত খুঁজবেন। ধৈর্য্যের অভাবটাই আমার কাছে এক্ষেত্রে মুখ্য মনে হয়। সুন্নাহ প্রসেস ঊনাদের কাছে অনেক দীর্ঘমেয়াদী লাগে, ঊনারা চান কুইক সমাধান।

যাই হোক, সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক তাঁর সিংহাসনের নিচে লুকানো যাদুবিদ্যা চর্চার সেইসব আসল বইগুলো আজো শয়তানের পূজারীদের আরাধ্য। এগুলো নিয়ে হলিউডে অনেক মুভি, মেটাল গান, অনেক থিওরী আছে যেগুলো নিয়ে বিস্তারিত জানার আমাদের দরকার নেই বলে আমার কাছে মনে হয়। তবে আজকের ইসরাঈল রাষ্ট্রের অনেক কর্মকাণ্ডের সাথে এটার গভীর সংযোগ আছে, যেটা নিয়ে আমরা পরবর্তী পর্বগুলোতে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ।

সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু ও বাইতুল আকসা নির্মাণঃ

সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের প্রায় শেষ পর্বে এসে ঊনি মসজিদুল আকসা পুনর্নির্মাণ করেন যেটা প্রথম বানিয়েছিলেন ইয়াকূব আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমরা সবাই সম্ভবত এটা সম্পর্কে জানি, এটা ছিল মুসলিমদের প্রথম কিবলা এবং মিরাজের রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ মক্কা থেকে এখানে নিয়ে গিয়েছিলেন, যেটার কথা সূরা বনী ইসরাঈলের প্রথম আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মসজিদুল আকসা পুনর্নির্মাণ ছাড়াও আরো একটি মসজিদ তৈরি করেন যাকে ইহুদীরা Temple of Solomon বা 1st Temple হিসেবে অভিহিত করে থাকে।

এটা তৈরি করা হচ্ছিল জ্বীনদেরকে দিয়ে। কিন্তু এটা নির্মাণের মাঝপথেই সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু জ্বীনরা যেহেতু বাধ্য হয়ে ঊনার আনুগত্য করতো, তাই ঊনি মারা গেছেন জানলে ওরা কাজ করা ছেড়ে দিত। তাই আল্লাহর নির্দেশে ওরা মসজিদের নির্মাণ শেষ না হওয়ার আগ পর্যন্ত ঊনার মৃত্যুর কথা জানতে পারে নি। সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু হয় নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায়। ঊনার ইবাদাতখানার বাইরের দরজা কাঁচের তৈরি ছিল যেটার মাঝ দিয়ে তাকে দেখে জ্বীনরা ভাবছিল যে তিনি নিবিষ্ট মনে ইবাদাতে রত আছেন। যখন কাজ শেষ হয়ে গেল, তখন ঊনি যে লাঠির উপর ভর করে দাঁড়িয়ে ছিলেন, আল্লাহর নির্দেশে উই পোকা এসে সেটা খেয়ে ফেললো, ফলে জ্বীনরা জানতে পারলো যে ঊনি আর বেঁচে নেই। এই ঘটনার কথা আল্লাহ্ আমাদের কুরআনে জানাচ্ছেন-

যখন আমি সোলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন ঘুণ পোকাই জিনদেরকে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কেঅবহিত কর ল। সোলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, তখনজিনেরা বুঝতে পারল যে, অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকলে
তারা এই লাঞ্ছনাপূর্ণ শাস্তিতে আবদ্ধথাকতো না। (৩৪:১২-১৪)

আমরা প্রথমে যে মূলনীতি উল্লেখ করেছিলাম যে জ্বীনরা গায়েব জানে না, এখন সেটার দলীল পেলাম, যেটা আল্লাহ্ আমাদের জানাচ্ছেন সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর ঘটনা

প্রসঙ্গে।তখনকার লোকজনও বিশ্বাস করতো যে জ্বীনরা গায়েব জানে। তাই এই ঘটনার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাদের এই ভুল ধারণারও অবসান ঘটালেন।

এই Temple of Solomon বনী ইসরাঈলয়দের ইতিহাসের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অনুষঙ্গ। যেহেতু এটা খুব জাঁকজমকপূর্ণ ছিল তাই দেখা গেছে পরবর্তীতে যখনই বহিঃশত্রুরা জেরুজালেম আক্রমণ করেছে তখনই এসব ধন সম্পদ লুটের জন্য এটা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু।কেউ কেউ বলেন এটার মূল ভিত্তি ছিল মসজিদুল আকসার পাশে, কেউ বলেন এটার অভ্যন্তরে।কথিত আছে যে Ark of the covenant এখানেই কোথাও আছে। তাই আজো বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ মসজিদুল আকসার আশেপাশে খোঁড়াখুঁড়ি চালাচ্ছে এটা Original Temple of Solomon এর ভিত্তিপ্রস্তর খুঁজে পাওয়ার আশায়। তাদের দাবী তারা Ark of the covenant খুঁজে পেতে চায়। কিন্তু এই প্রক্রিয়ায় তারা মসজিদুল আকসার ক্ষতি করছে।
সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বনী ইসরাঈলয়দের স্বর্ণযুগের সমাপ্তি ঘটে। আগামী পর্ব থেকে আমরা ঊনার মৃত্যু পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ।

[1] আমি নিজে এই কাজ করেছি। আমার এক আত্মীয়ের গলা থেকে তাবিজ খুলে ভেতরের খোলসটা ভেঙ্গে তাকে দেখিয়েছি যে এখানে মোটেও সূরা ইয়াসীন লেখা নেই বরং যে নকশা দেয়া আছে সেটা আসলে শয়তানকে আশ্রয় চাওয়ার তন্ত্র মন্ত্র।
[2] অর্থ্যাৎ আপনি যখন আপনার নিজের বা সন্তানের গায়ে তাবিজ ঝুলিয়ে দিচ্ছেন তখন আদতে আপনি তাকে আল্লাহ্ নয় শয়তানের ভরসায় সমর্পণ করছেন! ভাবা যায়?
[3] আমার শাশুড়ির সাথে এইবার গ্রামের বাড়িগুলোতে এটার অবাধ প্রচলন নিয়ে কথা হচ্ছিল, তখন ঊনি জানালেন যে যারা এগুলো দেয় তাদের এটাই পেশা এবং তারা এর মাধ্যমে হাজার হাজার টাকা ইনকাম করে থাকে। শুনে আমার নিচের আয়াতটার কথা মনে হচ্ছিল খুব যেখানে আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলয়দেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন-
আমার আয়াত সমূহের বিনিময়ে স্বল্পমূল্যে গ্রহণ করো না (৫:৪৪)

[4] খুব সুন্দর একটা রিসোর্স আছে এটার উপরে http://maseeh1.tripod.com/advices7/id152.htm

https://www.youtube.com/watch?v=Uo1mzPVsmak

শিকড়ের সন্ধানে-২৭

আমরা এতদিন ধরে কথা বলছিলাম সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাসনামল নিয়ে। আল্লাহ্ উনাকে অর্ধ পৃথিবীর রাজত্ব দিয়েছিলেন যার সীমানা ছিল নীল নদ থেকে ইউফ্রেটিস নদী পর্যন্ত। এই রাজত্ব Biblical Kingdom নামে পরিচিত। এই সীমানাটা মাথায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমরা সামনের পর্বগুলোতে এটার ব্যাপারে আবারো কথা বলবো ইনশাল্লাহ।

সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর তাঁর এই বিশাল রাজত্ব মূলত দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। উত্তরেরটার নাম ছিল ইসরাঈল (Israil), আর দক্ষিণেরটার নাম ছিল জুডাহ (Judah), আরবীতে যার নাম হচ্ছে ইয়াহুদ। ইসরাঈল কে ছিলেন এটাতো এতদিনে আমরা জেনে গেছি ইনশাল্লাহ কিন্তু জুডাহ কে ছিলেন? উনি ছিলেন ইয়াকূব আলাইহি ওয়াসাল্লামের ১২ জন ছেলের মাঝে একজন। তার বংশের লোকেরা এই গোত্রভুক্ত ছিল। দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লামও ছিলেন এই গোত্রের। এই নামটা আমরা মনে রাখবো, পরে কাজে লাগবে

কিন্তু এভাবে সাম্রাজ্য কেন বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল?

আল্লাহর শাস্তি হিসেবে।

বনী ইসরাঈলয়রা বড্ড বেশী ভোগবাদী হয়ে গিয়েছিল। এটাতো গেল আধ্যাত্মিক কারণ। চর্মচক্ষু দিয়ে আমরা কি দেখি?

আমরা দেখেছি যে বনী ইসরাঈলয়দের যে ১২ টা গোত্র ছিল তাদের মাঝে সবসময়ই একটা বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে তাঁর রাজত্ব সুসংহত করতে পেরেছিলেন যা সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়েও জারি ছিল। কিন্তু উনার মৃত্যুর পর উনার ছেলে রেহোবোম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন যিনি তাঁর বাবার মত এত যোগ্য ও দক্ষ ছিলেন না। তিনি উচ্চ হারে কর আরোপ করেছিলেন যা বনী ইসরাঈলয়দের ১০ টি গোত্রকে বিদ্রোহী করে তোলে এবং ভিন্ন রাজা নিযুক্ত করে ইসরাঈল নামক রাজ্যে তাঁরা আলাদা হয়ে যায়, যার রাজধানী ছিল সামারিয়া। জুডাহ ও বিন ইয়ামিন গোত্র উনার অনুগত থাকে। এই দুটো গোত্র নিয়ে গঠিত হয় জুডাহ রাজ্য, যার রাজধানী ছিল জেরুজালেম।

দুটো রাজ্যের মাঝে তুলনামূলক ভাবে ইসরাঈল রাজ্যের অধিবাসীরা পাপে বেশী নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল। তারা এমনকি মূর্তিপূজাও শুরু করেছিল। সে সময় ধার্মিক লোকদের নিয়ে মানুষ হাসাহাসি করতো। যিনা, ব্যাভিচার, মদ্যপান, নারীদেহের উন্মুক্ত প্রদর্শনী, যাদুচর্চা এগুলো ছিল খুব

সাধারণ বিষয়। তৎকালীন শাসক, যার নাম ছিল আহাব, সে বহু স্কলার ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের হত্যা করে স্রেফ এইজন্য যে তাঁরা একত্ববাদের বাণী প্রচার করতেন।

[1] শয়তানী কর্মকাণ্ড যখন চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়েছিল, এমন সময়ে আল্লাহ্ ইলইয়াস আলাইহি ওয়াসাল্লাম [2] নামক একজন নবী সতর্ককারী হিসেবে তাদের মাঝে প্রেরণ করেন । তিনি মানুষকে এইসব পাপ থেকে বিরত রাখার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। তখনকার বনী ইসরাঈলয়রা 'বাল' নামক মূল যে মূর্তির পূজা করতো, তার অন্তঃসারশূন্যতা মানুষকে নানাভাবে বুঝাতে থাকেন। যখন কিছুতেই কোনো কাজ হল না, তখন তিনি রাজার সামনে উপস্থিত হয়ে ভবিষ্যৎ বাণী করেন যে খুব শীঘ্রই এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ও খরা তার সাম্রাজ্যকে গ্রাস করবে
[3] আর তাদের পূজনীয় মূর্তি সেটা কিছুতেই ঠেকাতে পারবে না। কিন্তু কেউ তাঁর কথাকে কোনো পাত্তা দিলো না এবং তাদের জীবন যাত্রার ধরণে কোনো পরিবর্তন আনলো না। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ কুরআনে বলছেন যে-

নিশ্চয়ই ইলিয়াস ছিল রসূল। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বললঃ তোমরা কি ভয় কর না ? তোমরা কি বা'আল দেবতার এবাদত করবে এবং সর্বোত্তম স্রষ্টাকে পরিত্যাগ করবে। যিনি আল্লাহ তোমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের পালনকর্তা? অতঃপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। অতএব তারা অবশ্যই গ্রেফতার হয়ে আসবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার খাঁটি বান্দাগণ নয়। আমি তার জন্যে পরবর্তীদের মধ্যে এ বিষয়ে রেখে দিয়েছি যে, ইলিয়াসের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক! এভাবেই আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। সে ছিল আমার বিশ্বাসী বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত। (৩৭:১২৩-১৩২)

কিছুদিনের মধ্যে উনার কথাই সত্যি হল, মানুষ না খেয়ে মৃতপ্রায় হবার দশা হল। ইলইয়াস আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকেদের ব্যঙ্গ করে বলেন যে তারা যেন তাদের মূর্তির সামনে নাচ গান করে এই দুর্দশা থেকে মুক্তির জন্য তাকে আহ্বান জানায়। লোকেরা আসলেই সেটা করতে থাকে, তবু কোনো ফল হয় না।
তখন ওরা কী করে আন্দাজ করতে পারি আমরা কেউ?
ওরা উল্টা ইলইয়াস আলাইহি ওয়াসাল্লামকেই জনসম্মুখে এনে অপমান করলো এবং উল্টা উনাকেই দোষী সাব্যস্ত করলো এই বলে যে উনার দ্বারা করা যাদুর কারণেই নাকি এই দুর্ভিক্ষ!
এমনকি তারা উনাকে হত্যা করারও ষড়যন্ত্র শুরু করলো। তখন আল্লাহর নির্দেশে উনি ইয়াসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উনার পরবর্তী নবী হিসেবে নিযুক্ত করলেন এবং নিজে রহস্যজনকভাবে

উধাও হয়ে গেলেন। [4] আল্লাহ্ এনাদের দুজনের কথাই আল কুরআনে উল্লেখ করেছেন নিম্নোক্ত আয়াতে-

আর ও যাকারিয়া, ইয়াহিয়া, ঈসা এবং ইলিয়াসকে। তারা সবাই পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এবং ইসরাঈল, ইয়াসা, ইউনূস, লূতকে প্রত্যেককেই আমি সারা বিশ্বের উপর গৌরবান্বিত করেছি। (৬:৮৫-৮৬)

আল্লাহর নবীর সাথে এরূপ ধৃষ্টতা করার শাস্তি স্বরূপ এইবার আল্লাহ্ বহিঃ শত্রুদেরকে বনী ইসরাঈলয়দের উপর শক্তিশালী করে দিলেন। [5] তখনকার সুপার পাওয়ার ছিল আসিরীয়রা, মিশরীয়রা এবং ব্যবিলনীয়রা। আল্লাহ্র ইচ্ছায় আসিরীয়রা ইসরাঈল আক্রমণ করে এবং একদম নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এই ১০টি গোত্রের নাম নিশানাই আর পাওয়া যায় না।

প্রথমদিকে ইসরাঈল রাজ্যের সাথে নিয়মিত আধিপত্য বিস্তারের যুদ্ধে লিপ্ত থাকলেও জুডাহ রাজ্যের লোকেরা বেশ কিছুদিন যাবত তুলনামুলকভাবে আল্লাহ্ ভীরু জীবন যাপন করেছিল। ৭২২ খ্রিষ্ট পূর্বে ইসরাঈল রাজ্যের পতনের পর তারাই হয় একমাত্র টিকে থাকা বনী ইসরাঈলয়। তাদের মাঝে ছিল বেশ কিছু সৎ ও ন্যায়বিচারক শাসক যেমন হেজেকিয়াহ। এ সময় আল্লাহ্ যুলকিফল আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামে একজন নবী প্রেরণ করেন। আল্লাহ্ তাঁর কথা কুরআনে দুইবার উল্লেখ করেছেন-

এবং ইসমাঈল, ইদ্রীস ও যুলকিফলের কথা স্মরণ করুন, তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সবরকারী। (২১:৮৫)

স্মরণ করুণ, ইসমাঈল, আল ইয়াসা ও যুলকিফলের কথা। তারা প্রত্যেকেই গুনীজন। (৩৮:৪৮)

যুলকিফল আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেজেকিয়াহ অনেক মানতেন। তিনিও হেজেকিয়াহর অনেক প্রশংসা করতেন। মূলত হেজেকিয়াহর তাকওয়ার জন্যই জুডাহ আসিরীয়দের আক্রমণ থেকে বিস্ময়করভাবে বেঁচে যায়। একবার হেজেকিয়াহর খুব অসুস্থ হয়ে গিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন আল্লাহ্ যুলকিফল আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে ওনাকে জানান যে আসিরীয়দের আক্রমণে তাঁর সাম্রাজ্য ধ্বংস হতে চলেছে। তখন সে সিজদায় পড়ে গিয়ে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য আল্লাহ্র কাছে আন্তরিকভাবে করতে থাকেন। আল্লাহ্ তাঁর দুআ কবুল করেন, তাকে সুস্থতা দান করেন এবং তাদের আক্রমণ করতে আসা আসীরীয় সৈন্যবাহিনীকে আকাশ থেকে পাঠানো সাহায্য দিয়ে

ধ্বংস করে দেন। হেজেকিয়াহ তাঁর রাজ্যকে রক্ষার জন্য কিছু কৌশলগত পদক্ষেপও গ্রহণ করেন, যেমন মিশরীয়দের সাথে জোট করে নিজের শক্তি বৃদ্ধি করা।

কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর যারা জুডাহর শাসনভার গ্রহণ করে তারা কেউই তেমন একটা আল্লাহ্ ভীরু ছিল না, বরং অনেকেই ফিরে যায় মূর্তিপূজার মত জঘন্য কার্যাদিতে.....তাদের মধ্যে দাওয়াতী কাজ করতে গিয়ে যুলকিফল আলাইহি ওয়াসাল্লাম তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হন। এমনকি তারা তাকে হত্যা করতেও উদ্যত হয়। যুলকিফল আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের হাত থেকে পালানোর জন্য বেরিয়ে যান, একটি গাছ তাঁর জন্য ফাঁক হয়ে যায়, তিনি তার মধ্যে লুকিয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর পোশাকের সামান্য অংশ বের হয়ে থাকে ফলে বিবেকশূন্য বনী ইসরাঈলীয়রা গাছটাকেই করাত দিয়ে কেটে দুই টুকরা করে ফেলে, ফলে যুলকিফল আলাইহি ওয়াসাল্লামও মারা যান।[6] এভাবে বনী ইসরাঈলীয়রা নবীদেরকে হত্যা করার প্রথার প্রচলন ঘটায়। আল্লাহ্ তাদের ধিক্কার দিয়ে কুরআনে বলেন-

আর তাদের উপর আরোপ করা হল লাঞ্ছনা ও পরমুখাপেক্ষিতা। তারা আল্লাহর রোষানলে পতিত হয়ে ঘুরতে থাকল। এমন হলো এ জন্য যে, তারা আল্লাহর বিধি বিধান মানতো না এবং নবীগণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করত। তার কারণ, তারা ছিল নাফরমান সীমালংঘকারী। (২:৬১)

[1] চেনা চেনা লাগে?

[2] মুসলিম ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে বাইবেলে বর্ণিত Elias বা Elijah আর আমাদের নবী ইলিয়াস একই ব্যক্তিত্ব যার কথা ওল্ড টেস্টামেন্টের 1 Kings 17–19 and 2 Kings 1–2 তে বলা হয়েছে।

[3] আমাদের উপর যেসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ আপতিত হয় সেগুলো অনেকাংশেই আমাদের পাপের ফল।

[4] এজন্য ইহুদীরা Elijah র 2nd coming এ বিশ্বাস করে ও মনে করে যে শেষ সময়ে এসে তিনি God's kingdom প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করবেন। এ ব্যাপারে আমরা পরে আরো বিস্তারিত কথা বলবো ইনশাল্লাহ।

[5] আমরা বনী ইসরাঈলয়দের কাহিনী থেকে বারবার দেখছি যে কখন আল্লাহ্ বহিঃ শত্রুদেরকে আমাদের উপর বিজয়ী করে দেন! এরপর ইরাক, আফগানিস্তান, সিরিয়ার ঘটনায় হা হুতাশ না করে আমাদের উচিৎ এটার আসল কারণ অনুধাবন করা এবং সেই অনুযায়ী কাজে ঝাপিয়ে পড়া। আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলদের কাহিনীতো আমাদেরকে এমনি এমনি জানান নি, তাই না?

[6] http://www.a2youth.com/ebooks/stories_of_the_prophets/the_story_of_dhul-kifl/

শিকড়ের সন্ধানে-২৮

আমরা বনী ইসরাঈলীয়দের যে প্রজন্মের কথা বলছি, স্কলাররা বলেন যে এদের কথাই আল্লাহ্ কুরআনে বলেছেন-

অতঃপর তাদের পরে এল অপদার্থ পরবর্তীরা। তারা নামায নষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হল। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে।(১৯:৫৯)

এখানে লক্ষণীয় যে আল্লাহ্ বলেননি নামায ত্যাগ করলো, বরং বলেছেন নামায নষ্ট করলো। এর অর্থ হচ্ছে তারা একদম শেষ সময়ে নামায পড়তো এবং দুই ওয়াক্তের নামায একসাথে পড়তো, যেটা বৈধ ছিলো না। তাহলে আমরা একবার চিন্তা করি যে আমরা যারা নামায পড়ি না, তাদের অবস্থান আল্লাহর দৃষ্টিতে কোথায়? তিনি আরো বলেছেন-

যাদেরকে তওরাত দেয়া হয়েছিল, অতঃপর তারা তার অনুসরণ করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধা, যে পুস্তক বহন করে, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে, তাদের দৃষ্টান্ত কত নিকৃষ্ট। আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না। (৬২:৫) [1]

আমাদের মধ্যে কি হুবহু একই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান না? আমরা কি পড়ি কুরআন? আমি যে লেকচারটার আলোকে এই নোটটা লিখছি, সেখানে উস্তাদ ঊমার সুলাইমান এ প্রসঙ্গে খুব সুন্দর একটা কথা বলেছেন স্কলারদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপারে। তিনি বলছিলেন যে ইসলামে কোনো পুরোহিত তন্ত্র নেই। আমরা স্কলারদের বিশেষভাবে সম্মান করি ঠিকই, আল্লাহ্ ও রাসূল স্কলারদের সুমহান মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছেন ঠিকই, কিন্তু সেই সাথে আমরা কোনো স্কলারকেই ভুলের ঊর্ধ্বে ভাবি না বা অন্ধভাবে বিশ্বাস করি না। তাঁরা কোন দলীলের ভিত্তিতে একটি নিয়ম জানালেন সেটা জানার অধিকার আমাদের আছে, তবে অবশ্যই সেটা যথাযথ আদবের সাথে। পক্ষান্তরে আমরা যদি অন্যান্য ধর্মের মাঝে প্রচলন লক্ষ করি তাহলে দেখবো যে এখানে স্কলারদের আল্লাহর সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে ধরা হয়। তাদের স্থান অনেকটা হিন্দুদের দেবতার মত। তারা যা বলে সেটাকে প্রশ্ন করার ধৃষ্টতাও সাধারণ মানুষ দেখাতে পারে না। বনী ইসরাঈলীয়দের এই স্বভাবকে তিরষ্কার করে আল্লাহ্ কুরআনে বলছেন যে,

তারা তাদের পন্ডিত ও সংসার-বিরাগীদিগকে তাদের পালনকর্তারূপে গ্রহণ করেছে আল্লাহ ব্যতীত এবং মরিয়মের পুত্রকেও। অথচ তারা আদিষ্ট ছিল একমাত্র মাবুদের এবাদতের জন্য। তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই, তারা তাঁর শরীক সাব্যস্ত করে, তার থেকে তিনি পবিত্র। (৯:৩১)

একজন সাহাবী যিনি আগে ইহুদী ছিলেন, তিনি এই আয়াত শুনে প্রতিবাদ করে উঠে বলেছিলেন যে ইহুদীরা মোটেও তাদের রাব্বীদের ইবাদাত করতো না। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে তাঁরা কি হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল বানিয়ে দিতো না? তখন উনি তা স্বীকার করলেন যে এটা হত। এখন এই জায়গায় চিন্তার অবকাশ আছে...কেন রাব্বীরা এই কাজ করতে পারতো? কারণ সাধারণ মানুষের তাদের ধর্ম গ্রন্থ নিয়ে কোনো ধারণাই ছিল না। এমনকি তারা পড়তেও জানতো না তাদের আসমানী গ্রন্থগুলো। তারা শুধু তিলাওয়াত করতে জানতো বা ঠিক তাও জানতো না.....

এই অবস্থা থেকে ওরা যে আজো খুব পরিবর্তন হয়েছে তা কিন্তু না...আজকের ক্রিস্টানরা কিন্তু ওদের ধর্মগ্রন্থ থেকে একটা আয়াত দেখাতে পারবে না যেখানে যীশু ক্রিষ্ট সরাসরি নিজেকে আল্লাহ্ বা আল্লাহর ছেলে বলে দাবী করেছেন (আস্তাগফিরুল্লাহ), ওরা ওদের বই পড়ে না বলেই এটা জানে না।

এই জায়গায় এসে উমার সুলাইমান খুব মজার একটা কাহিনী উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন যে একবার একটা প্রেজেন্টেশনে তিনি কয়েকটি আয়াত উপস্থাপন করেছিলেন রেফারেন্স ছাড়াই। উপস্থিত সবাই ছিলেন ক্রিস্টান, তারা মিডিয়া দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আয়াতগুলো দেখেই ভাবলেন এগুলো নিশ্চয়ই কুরআনের আয়াত কারণ সেখানে হত্যার বদলে হত্যা, যুদ্ধ ইত্যাদির কথা ছিল। এরপর উস্তাদ একটু হেসে সবগুলোর রেফারেন্স দেখালেন যে সবগুলো আসলে ওল্ড টেস্টামেন্টের আয়াত!! অথচ ওরা প্রচার করে বেড়ায় যে ক্রিস্টান ধর্ম শুধুই ভালোবাসার কথা বলে! ওরা জানেই না ওদের বই এ কী আছে! এই কথাটা আমরা এবার IOU এর Comparative Religion কোর্সেও পড়েছি যে আজকাল শোনা যায় যে ধর্ম নাকি অনেক সমস্যার মূল.....কিন্তু আসলে সব সমস্যার গোঁড়াতে রয়েছে যার যার ধর্মের ব্যাপারে আমাদের অজ্ঞতা।

এই অবস্থার কথা শুনলে আমার খুব ভয় লাগতে থাকে। আমরা কয়জন জানি যে কুরআনে কি আছে? আমাদের সমাজেও এ কথাটা বহুল পরিচিত যে সাধারণ মানুষদের কুরআন পড়তে নেই। এই কথাটা যেমন ভুল, সেরকম আমরা নিজেরা কুরআনের তাফসীর পড়ে, ফতোয়ার ওয়েবসাইট ঘাঁটাঘাঁটি করে ইসলাম শিখে যাবো এই কথাটাও ভুল। আমাদের উচিৎ আলিমদের অধীনে দ্বীন

শিক্ষায় ব্যাপৃত হওয়া, দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে আদব শেখা ও সেটাকে জীবনে প্রয়োগ করার ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া।

যাই হোক, ফিরে আসছি আমাদের কাহিনীতে.....যখন জুডাহবাসীর কার্যক্রম ইসরাঈলয়দের মত হয়ে গেল, তখন ওদের পরিণতিও ইসরাঈল রাজ্যের মতই হল। আল্লাহ্ তাঁর রহমতের ছায়া উঠিয়ে নিলেন, আবারো বহিঃশত্রুদের দ্বারা পর্যুদস্ত হল জুডাহবাসী। তবে ততদিনে পৃথিবীর সুপার পাওয়ারগুলোর মাঝে পরিবর্তন এসেছে। অ্যাসিরীয়রা নিজেরাই এখন দুর্বল হয়ে গেছে, তার জায়গায় শক্তিশালী হয়েছে [2] ব্যবিলিয়নীয়রা। জুডাহর অধিবাসীরা এইসময় নিজেদের কুটনৈতিক কৌশলের উপর খুব বেশী আস্থাবান হয়ে গিয়েছিল, তারা ভেবেছিল মিশরীয়দের সাথে জোট করাতে তারা বেঁচে যাবে। কিন্তু মিশরীয়রা তাদের দেয়া সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছিল। এভাবে যখনই আমরা সমস্যার মূল বুঝতে ব্যর্থ হই, তখনই আমরা এভাবে ভুল জিনিসের উপর ভরসা করি। আল্লাহ্ আমাদের উপর বহিঃশত্রু চাপান আমাদের পাপের কারণে, আরেক অমুসলিমদের সাহায্যের আশা করে সেখান থেকে পার পাবার কোনো সুযোগ নেই। [3]

ইসরাঈলের মত জুডাহবাসীর জন্যও আল্লাহ্ সতর্ককারী হিসেবে একজন নবী পাঠিয়েছিলেন, যার নাম ছিল জেরেমিয়াহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি তাদেরকে এই ঘটনার ব্যাপারে সাবধানও করেছিলেন। কিন্তু শয়তান যখন পাপকাজকে সুশোভিত করে দেখায় তখন বুদ্ধি আর বিবেক বলে কিছুই কাজ করে না। তাই এক্ষেত্রেও, চোখের সামনে ইসরাঈল রাজ্যের পরিণতি দেখার পরও বিস্ময়করভাবে জুডাহবাসীর মনে হল যে ওদের কিছু হবে না! [4]

ব্যবিলনীয়রা যখন জুডাহবাসীকে আক্রমণ করলো, সেটা তার ভয়াবহতার জন্য পৃথিবীর ইতিহাসে আজো এক বিশিষ্ট ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন জুডাহ প্রথমে আসীরীয়দের, পরে ব্যবিলনীয়দের অঙ্গরাজ্য হিসেবে ছিল। কিন্তু এই সময়ে ওরাই ব্যবিলনীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, যা দমন করতে তৎকালীন ব্যবিলনীয় রাজা Nebuchadnezzar II [5] ৫৮৭ খ্রিষ্ট পূর্বে জুডাহ আক্রমণ করেন এবং জেরুজালেমকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেন। সে তাওরাত পুড়িয়ে দেয়। [6] সে নির্বিচারে বনী ইসরাঈলিয়দেরকে হত্যা করে, বাকিদেরকে দাস হিসেবে নিয়ে যায় ব্যবিলনে। অল্প সখ্যক ইহুদী মিশরে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। [7] এসময়েই সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্মিত মসজিদটা ভেঙ্গে চুড়ে দেয়া হয়, আবারো হারিয়ে যায় বনী ইসরাঈলীয়দের কাছে অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত Ark of the covenant। এই ঘটনার কথা আল্লাহ্ কুরআনে উল্লেখ করছেন-

আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাবে পরিষ্কার বলে দিয়েছি যে, তোমরা পৃথিবীর বুকে দুবার অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং অত্যন্ত বড় ধরনের অবাধ্যতায় লিপ্ত হবে। অতঃপর যখন প্রতিশ্রুতি সেই প্রথম সময়টি এল, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমার কঠোর যোদ্ধা বান্দাদেরকে। অতঃপর তারা প্রতিটি জনপদের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল। (১৭:৪-৫)

[1] এই আয়াটতা ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে খুবই ভয়ের লাগে। সারাক্ষণ নিজেকে প্রশ্ন করি যে আমার IOU (Islamic Online University, www.islamiconlineuniversity.com) এর জ্ঞান আমার জন্য স্রেফ Intellectual Exercise হয়ে যাচ্ছে নাতো, যা আমার আমলের উপর কোনো প্রভাব ফেলছে না?

[2] কে আমাদের উপর আক্রমণ করবে সেটা বড় কথা না, আমাদের শত্রুরা আমাদের উপর শক্তিশালী হবে এটাই মূল কথা।

[3] সমস্যা সমাধানের প্রথম ধাপ হল সমস্যা ও তার কারণ সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পারা

[4] ব্যাপারটা যেন অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত মানুষের মত। পত্র পত্রিকায় প্রেমিক কর্তৃক শ্লীলতাহানির খবর যতই চোখে পড়ুক, প্রতিটা মেয়ের মনে হয় 'আমার ও' এমন করবে না। সে বোঝে না যে মেয়ের সাথে এমন হয়েছিল, সেও নিজের কেসটাকে আলাদাই ভাবতো!

[5] অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন এই সেই রাজা যে পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের একটা- ব্যবিলনের শূন্য উদ্যান নির্মাণ করেছিলেন।

[6] আল্লাহ্ কুরআনের কথা যেমন বলেছেন যে এটা তাঁর ওয়াদা যে তিনি এটা সংরক্ষণ করবেন, অন্য কিতাবের ক্ষেত্রে এটা বলেননি, তাই এটার পুড়ে যাওয়া তাঁর অনুমতিক্রমেই হয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে আজকে আমরা যে তাওরাত পাই, ওল্ড টেস্টামেন্ট হিসেবে, সেটা ইহুদী রাব্বিদের নিজের হাতে লেখা, যেটা মূলত লেখা হয়েছে এই ঘটনার পরে। আর সেজন্যই ওল্ড টেস্টামেন্টকে বলা যায় ইতিহাস গ্রন্থ, যেখানে মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর ঘটনাও আছে। যে তাওরাত মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হয়েছিল, সেটাতে উনার মৃত্যুর ঘটনা কিভাবে থাকবে!

[7] এ সময়েই প্রথমবারের মত ইহুদীরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় যা ইতিহাসে First Jews Diaspora হিসেবে পরিচিত।

শিকড়ের সন্ধানে-২৯

আমরা আগের পর্বে উল্লেখ করেছি যে আল্লাহ্ কুরআনে উল্লেখ করেছেন বনী ইসরাঈলীয়দেরকে শাস্তি দেয়ার কথা। মজার ব্যাপার হল যে এটা ওদের নিজেদের ধর্ম গ্রন্থেও আছে.....আজো, বিকৃত হয়ে যাবার পরও। [1]

25 After you have had children and grandchildren and have lived in the land a long time—if you then become corrupt and make any kind of idol, doing evil in the eyes of the Lord your God and arousing his anger, **26** I call the heavens and the earth as witnesses against you this day that you will quickly perish from the land that you are crossing the Jordan to possess. You will not live there long but will certainly be destroyed. **27** The Lord wills scatter you among the peoples, and only a few of you will survive among the nations to which the Lord will drive you. (Deuteronomy 4:25-27, New International Version)

শুধু তাই না, ওদের নিজেদের ইতিহাস গ্রন্থেই ওরা লিপিবদ্ধ করে রেখেছে যে Three cardinal sins [2] এর জন্য আল্লাহ্ শাস্তি স্বরূপ Temple Mount ধ্বংস করে দিয়েছিল। এই ঘটনাটা ওদের আধ্যাত্মিক জগতে এক বিশাল ধাক্কা ছিল যার মূল ভিত্তি ছিল যে ওরা আল্লাহর chosen people এবং আজীবন এই রাজত্ব তাদের দখলেই থাকবে!

আবারো ফিরে আসছি আমাদের কাহিনীর পরিক্রমাতে। Nebuchadnezzar II যখন বনী ইসরাঈলীয়দের ধরে নিয়ে যায় তখন তাদের মাঝে জেরেমিয়াহ আলাইহি ওয়াসাল্লামও ছিলেন। সেখানে বন্দীরা নিজেদের মাঝে বলাবলি করতো যে কিভাবে উনার ভবিষ্যৎ বাণী সত্যি পরিণত হল, যদি ওরা উনার কথা শুনতো তাহলে তাদের এই দুর্গতি হত না ইত্যাদি। এই কথা যখন Nebuchadnezzar II এর কানে যায় তখন উনি জেরেমিয়াহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডেকে পাঠান এবং ঘটনার সত্যতা জানতে চান। যখন জানতে পারেন যে আসলেই উনি আল্লাহর নবী, তখন বনী ইসরাঈলীয়দের উপর উনার ক্ষোভ আরো বেড়ে যায় যে ওরা আল্লাহর নবীকে এভাবে অসম্মান করেছে। তিনি জেরেমিয়াহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুক্তি দিতে চান এবং তার মন্ত্রী বা এই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণে পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার প্রস্তাব দেন। কিন্তু জেরেমিয়াহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেন যে তিনি জেরুজালেমে ফিরে যেতে চান, Nebuchadnezzar II সেই প্রস্তাবও গ্রহণ করেন। ফলে তিনি মুক্তি পান।

বাইবেলের কাহিনী অনুসারে এই সময়ে আরো একজন নবী ছিলেন যার নাম ছিল ড্যানিয়েল আলাইহি ওয়াসাল্লাম। Nebuchadnezzar II যেটা করতো সেটা হচ্ছে যে সে বনী ইসরাঈলীয়দেরকে গর্তে ফেলে দিতো, তারপর সেখানে সিংহকে সেখানে ছেড়ে দিত, ক্ষুধার্ত সিংহ। এভাবেই সে তাদের অমানুষিক নির্যাতন করতো। এমনকি সে যেখানেই খোঁজ পেত যে বনী ইসরাঈলীয়দেররা পালিয়ে গেছে, সেখানেই সে তাদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য আক্রমণ করতো। এভাবে সে মিশরে একাধিকবার আক্রমণ করেছে।
ড্যানিয়েল আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেও অনুরূপ আচরণ করা হয়, কিন্তু তাকে সিংহ খায় নাই। এমনকি আল্লাহ্ ওই গুহার মধ্যে তাঁর খাবার ও পানির ব্যবস্থা করেন আলৌকিক উপায়ে। আল্লাহ্ জেরেমিয়াহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেন উনার জন্য খাবার তৈরি করতে, তারপর সেটা এক পাখি জেরুজালেম থেকে উনার জন্য ব্যবিলনে নিয়ে আসতো।

মুসলিমরা যখন উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর সময়ে ইরাক জয় করে তখন ওনারা একটা কবরের সন্ধান পায় যেটার পাশে একটা বই ছিল যা ছিল হিব্রুতে লেখা। স্থানীয়রা জানায় যে বহুদিন হয়ে গেলেও এই শরীর এখনো পচেনি, এরা মাঝে মাঝে এই শরীরের রহমতের উসীলাতে দুআ করে, ফলে বৃষ্টি হয় ও অন্যান্য উপকার হয়। এই কথা শুনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু উবাই ইবনে কাবকে ডেকে পাঠান কারণ তিনি হিব্রু পড়তে জানতেন। উনি বইটা পড়ে জানান যে এটা ড্যানিয়েল আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর। আর নবীর কবর হওয়ার কারণেরই মাটি এটে খেয়ে ফেলেনি।

এটা বুঝতে পেরে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবীদের নির্দেশ দেন যে রাতের অন্ধকারে যেন অনেকগুলো কবর খোঁড়া হয় এবং দৈব চয়ন ভিত্তিতে যে কোনো একটাতে উনার শরীর আবার সমাহিত করে সবগুলো কবরকে একদম মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয় যেন কোনটা উনার কবর এটা বোঝাও না যায়।
আমরা কি বুঝতে পারছি উনি এটা কেন করেছিলেন?

হ্যাঁ, ইসলাম শিরকের সকল দরজা বন্ধ করে দেয়, যদি কোনো কাজের মাধ্যমে শিরকের দূরতম সম্ভাবনাও থাকে তবে সেটার পথ বন্ধ করে দেয়াই ইসলামের মূলনীতি.....

জুডাহ রাজ্য এভাবে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর বনী ইসরাঈলীয়দের এই করুণ অবস্থা বেশ কিছুদিন অব্যাহত থাকে। এইসময় আল্লাহ্ ঊযাইর আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামে একজন নবীকে পাঠান। তিনি একদিন জেরুজালেম শহর যা কী না তখন ছিল শুধুই এক ধ্বংসাবশেষ, সেটার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেটা দেখে তাঁর কাছে মনে হল যে এই শহরের যে অবস্থা তা যে কোনোদিনও প্রাণ ফিরে পাবে এটা অসম্ভব। আল্লাহ্ তাঁর মনের কথা জানতে পেরে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন ১০০ বছরের জন্য। এই ঘটনার বিবরণ কুরআন আমাদের জানাচ্ছে.....

তুমি কি সে লোককে দেখনি যে এমন এক জনপদ দিয়ে যাচ্ছিল যার বাড়ীঘরগুলো ভেঙ্গে ছাদের উপর পড়ে ছিল? বলল, কেমন করে আল্লাহ মরনের পর একে জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ তাকে মৃত অবস্থায় রাখলেন একশ বছর। তারপর তাকে উঠালেন। বললেন, কত কাল এভাবে ছিলে? বলল আমি ছিলাম, একদিন কিংবা একদিনের কিছু কম সময়। বললেন, তা নয়; বরং তুমি তো একশ বছর ছিলে। এবার চেয়ে দেখ নিজের খাবার ও পানীয়ের দিকে-সেগুলো পচে যায়নি এবং দেখ নিজের গাধাটির দিকে। আর আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চেয়েছি। আর হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ যে, আমি এগুলোকে কেমন করে জুড়ে দেই এবং সেগুলোর উপর মাংসের আবরণ পরিয়ে দেই। অতঃপর যখন তার উপর এ অবস্থা প্রকাশিত হল, তখন বলে উঠল-আমি জানি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। (২:২৫৯)

১০০ বছর পর উনি যখন জেরুজালেমে ফিরে আসলেন তখন তা আবার এক প্রাণ চঞ্চল শহরে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ্ বলছেন,

অতঃপর আমি তোমাদের জন্যে তাদের বিরুদ্ধে পালা ঘুরিয়ে দিলাম, তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও পুত্রসন্তান দ্বারা সাহায্য করলাম এবং তোমাদেরকে জনসংখ্যার দিক দিয়ে একটা বিরাট বাহিনীতে পরিণত করলাম। (১৭:৬)

কিন্তু কিভাবে?

৫৩৯ খ্রিষ্ট পূর্বে পারসিয়ানদের আল্লাহ্ ব্যবিলনীয়দের উপরে শক্তিশালী করে দেন এবং পারসিয়ান রাজা সাইরাস ব্যবিলীয়ন দখল করে নেন। তিনি ইহুদীদের প্রতি যথেষ্ট দয়াশীল ছিলেন এবং তাদেরকে জেরুজালেমে ফিরে যাওয়ার সুযোগ করে দেন। তখন থেকে জুডাহ রাজ্যটা ছিল পারসিয়ানদের একটা অঙ্গরাজ্য। তাঁরা ফিরে এসে আবার একই জায়গাতে আরেকটি স্থাপনা নির্মাণ করে যা ইতিহাসে 2nd temple নামে সমধিক পরিচিত। কিন্তু এটার একটা বড় সীমাবদ্ধতা হচ্ছে অনেক ঐতিহাসিক সম্পদই তখন হারিয়ে গেছে, যেমন Ark of the covenant ইত্যাদি।

১০০ বছর পরে উযাইর আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জেরুজালেমে ফিরে আসেন, তখন তিনি সেখানে সংস্কারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। প্রথমে উনার আত্মীয় স্বজনরাও উনাকে চিনতে পারেনি। কিন্তু উনার তাওরাত মুখস্থ ছিল এবং এটার একটা কপি একজন লুকিয়ে রেখেছিল যেটা কোথায় তা উযাইর আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কেউ জানতো না। তাই ওরা ওনাকে বললো যে উনি যদি সত্যিই উযাইর আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়ে থাকেন, তবে যেন সেটা খুঁজে বের করেন। উনি তা করেন। এভাবে তাওরাত পুড়িয়ে ফেলার পর যখন তা প্রায় হারিয়ে গিয়েছিল, তখন আল্লাহ্ তাঁর মাধ্যমে এটাকে আবারো ফিরিয়ে দেন কারণ উনার তাওরাত মুখস্থ ছিল। তাছাড়া উনি জুডাহ রাজ্যে আবারো তাওরাতে বর্ণিত আইন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং সমাজ থেকে অনেক কুপ্রথার অবসান ঘটান। তাই ওদের ইতিহাসে অনেকেই প্রশংসার ছলে তাকে 'দ্বিতীয় মুসা' হিসেবে অভিহিত করে থাকে।

এভাবে বহু বছর পর বিস্ময়করভাবে আবির্ভুত হবার পর এবং বিশেষ করে তাওরাত পুনরুদ্ধার করায় ইহুদীদের একটা ছোট্ট দল (ইয়েমেনে বসবাসরত) তাকে আল্লাহর ছেলে হিসেবে অভিহিত করা শুরু করে। আল্লাহ্ বলছেন-

ইহুদীরা বলে ওযাইর আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা বলে 'মসীহ আল্লাহর পুত্র'। এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা। এরা পূর্ববর্তী কাফেরদের মত কথা বলে। আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন, এরা কোন উল্টা পথে চলে যাচ্ছে। (৩০:৯)

এই আয়াতটা ইহুদীরা কুরআনকে ভুল প্রমাণ করতে ব্যবহার করে থাকে।তাঁরা বলে যে ইহুদীদের ধর্মবিশ্বাসে এমন কিছু নেই। এইখানে এসে আমাদের অ্যারাবিক কুরআন জানার প্রয়োজনীয়তা প্রতিভাত হয়ে ওঠে। কারণ আমরা যদি আরবীতে কুরআন পড়তে জানতাম তাহলে বুঝতাম যে আল্লাহ্ এখানে বলেন নি যে সব ইহুদীরা বলতো, বরং বলেছেন যে 'قَالَتِ' যেটার মানে হচ্ছে একজন বা ছোট একটা দল [3]

[1] আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে একবার মদিনার কিছু ইহুদীরা এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লামকে বললো যে আমরা কিভাবে তোমাকে মানতে পারি যখন তুমি আমাদের কিবলা পরিত্যাগ করেছো এবং উযাইরকে আল্লাহর ছেলে মনে করো না?

সুবহানাল্লাহ! নিশ্চয়ই আল্লাহর বই সকল ত্রুটি বিচ্যুতির উর্ধ্বে!

[1] আমরা ইনশাল্লাহ সামনের পর্বগুলোতে বারবার দেখানোর চেষ্টা করবো যে আল্লাহ্ ওদের ধর্ম গ্রন্থ গুলোতে ততটুকু বিকৃতিই অনুমোদন দিয়েছেন যা থেকে আজো কুরআন ও ইসলাম যে সত্য সেটা বোঝার অবকাশ থাকে।

[2] Paganism, murder and adultery

[3] আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে একবার মদিনার কিছু ইহুদীরা এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লামকে বললো যে আমরা কিভাবে তোমাকে মানতে পারি যখন তুমি আমাদের কিব্লা পরিত্যাগ করেছো এবং উযাইরকে আল্লাহর ছেলে মনে করো না?

শিকড়ের সন্ধানে-৩০

আমরা পড়ছিলাম পারসিয়ান রাজার শাসনামলে ব্যবিলনে নির্বাসিত বনী ইসরাঈলীয়দের একটা অংশের জেরুজালেমে ফিরে আসা ও উযাইর আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে তাওরাতের আলোকে জীবন যাপন। কিন্তু এই ঘটনা প্রবাহের মাঝে একটা বিশাল ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটে গেছে যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কী সেটা?

বনী ইসরাঈলীয়রা নিজেদেরকে ও তাদেরকে তাদের শাসকরা 'ইহুদী' হিসেবে অভিহিত করা শুরু করেছে। ইয়াহুদ কে আমাদের মনে আছে? আমরা বলেছি যে ইয়াকূব আলাইহি ওয়াসাল্লামের ১২ জন ছেলের নাম থেকে উদ্ভূত ১২ টি গোত্রের মাঝে একটি ছিল জুডাহ? এই জুডাহর আরবী নাম হচ্ছে ইয়াহুদ, ইংরেজীতে যাকে বলে Jews! আসিরীয়রা যখন ইসরাঈল রাজ্যটা ধ্বংস করে দিয়েছিল তখন ১০ টি গোত্রের নাম নিশানাই আর পাওয়া যায় না। বাকি ছিল শুধু জুডাহ রাজ্য যা ব্যবিলনীয়দের আক্রমণের শিকার হয় ৫৮৭ খ্রিঃ পূর্বে এবং অধিকাংশ বনী ইসরাঈলীয়দের ব্যবিলনে নির্বাসিত করা হয় দাস হিসেবে। এই Exile এর ঘটনার পর থেকেই মূলত পরিচয়ের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন সাধিত হয়।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে এই নাম দিয়ে কী এসে যায়। কিন্তু এই পরিবর্তনটা আদতে খুব তাৎপর্যপূর্ণ। কেন?

কারণ হিব্রু ভাষা অনুযায়ী ইসরাঈল শব্দের অর্থ আরবীতে আব্দুল্লাহ শব্দের মত, যার মানে আল্লাহর দাস। তাই বনী ইসরাঈল এই শব্দ চয়ন এর মাধ্যমে তাদের ধর্মীয় পরিচয় ফুটে উঠতো। কিন্তু যখন তারা নিজেদেরকে ইহুদী হিসেবে পরিচয় দেয়া শুরু করলো, তখন সেটা ছিল একটা জাতিগত বা গোত্রীয় পরিচয়! তাই এই পরিবর্তন শুধু নামে ছিল না, এটা ছিল ইহুদীদের মন-মানসিকতা, জীবন নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গী ও আচার ব্যবহারে পরিবর্তন। ওরা বনী ইসরাঈলীয় হিসেবে আল্লাহ্ ওদেরকে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, সেটার প্রতিও উদাসীনতা দেখানো শুরু করলো.....

তাহলে আমরা কি দেখলাম যে বনী ইসরাঈলীয়রা কবে থেকে নিজেদের ইহুদী হিসেবে পরিচয় দেয়া শুরু করেছে? ব্যবিলনে নির্বাসিত হবার পর থেকে.....

বিস্ময়করভাবে কুরআন এই বিষয়টাকে তাঁর অসামান্য ভাষাগত শৈলী দিয়ে আমাদের মাঝে উপস্থাপন করেছে। আমরা যদি খুব ভালো করে লক্ষ করি তাহলে দেখবো যে কুরআন 'ইহুদী' শব্দটা ব্যবহার করেছে মদীনার ইহুদীদের ব্যাপারে, আর ইহুদী-নাসারা এই দুই শব্দ একসাথে (নাসারা হল ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীরা, কুরআন কেন তাদের ক্রিস্টান না বলে

নাসারা বলেছে সেটাও আমরা সামনে উল্লেখ করবো ইনশাল্লাহ)। কখনোই মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ের কোনো ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহ্ ইহুদী শব্দটি উল্লেখ করেননি, তখন বনী ইসরাঈল বলেছেন! শব্দ চয়নের এই সূক্ষ্ম পরিবর্তনের ঐতিহাসিক পটভূমি কুরআন ধারণ করেছে বিস্ময়কর নির্ভুলতায়! [1]
আরো তাৎপর্যপূর্ণ হচ্ছে কুরআন যখন ওদের ইহুদী হিসেবে অভিহিত করেছে, তখনই তাদের ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। যেভাবে শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী সেটার অর্থ হচ্ছে- 'তোমরা যারা ইয়াহুদী হয়ে গেছো' অর্থ্যাৎ আল্লাহ্ তাদেরকে এইভাবে সম্বোধন করেননি, তারাই নিজেদেরকে এইভাবে পরিচিত করা শুরু করেছে.....কী দারুণ তাই না?

আমরা এতদিন ধরে যে ইতিহাস পড়ছি তাকে যদি এক-দুই লাইনে প্রকাশ করা যেত তবে সম্ভবত ব্যাপারটা এমন দাঁড়াতো যে-এটা হচ্ছে বনী ইসরাঈলীয়দের চরম অবাধ্যতা প্রদর্শন, তারপর আল্লাহ্ কর্তৃক তাদের মাঝে সতর্ককারী প্রেরণ, যখন তাঁরা সেটাতে কান দিয়েছে তখন উন্নতি সাধন, আর যখন কথা গ্রাহ্যই করেনি, তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তি লাভ.....এই ঘটনাগুলোর একটা চক্র, যার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বারবার।
এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে বনী ইসরাঈলীয়দের যে অধঃপতনের কথা আমরা বলছি, সেটা মূলত আসলে কী ছিল? কারণ পাপের প্রশ্ন যদি উঠে তবে সেটাতো মানুষের স্বভাবের অংশ, তাই না? তবে?
তাই বনী ইসরাঈলীয়দের করা অপরাধের প্রশ্ন যদি আসে, তাহলে সম্ভবত সবচেয়ে মারাত্মক কাজটা ছিল আল্লাহর পাঠানো দ্বীনের তাত্ত্বিক ভিত্তিটাকেই ভঙ্গুর ও বিকৃত করে ফেলা। কিসের কথা বলছি আমি?
আল্লাহ্ আসমানী কিতাব পাঠানোর মাধ্যমে বনী ইসরাঈলীয়দেরকে যে বিশাল সম্মান এবং অনুগ্রহ দান করেছিলেন, সেটাকে তারা একটা 'জাতিগত' তথা পৈত্রিক সম্পত্তি বানিয়ে ফেলেছিল যা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায়.....তারা এটাকে জন্ম পরিচয় অর্থ্যাৎ গোত্রের নামের সাথে জুড়ে দিয়েছিল-ইহুদী! তারা মনে করতো, এবং আজো করে যে তারা আল্লাহর chosen people বা বিশেষভাবে বেছে নেয়া জাতি। তাদের লেখা দেখুন যে কাকে এরা ইহুদী হিসেবে অভিহিত করছে- 'It is important to note that being a Jew has nothing to do with what you believe or what you do. A person born to non-Jewish parents who believes everything that Jews believe and observes every law and custom of Judaism is still a non-Jew, even in the eyes of the most liberal reformists of Judaism,

and a person born to a Jewish mother who is an atheist and never practices the Jewish religion is still a Jew, even in the eyes of the ultra-Orthodox. In this sense, Judaism is more like a nationality than like a religion, and being Jewish is like a citizenship.'

অর্থ্যাৎ ইহুদীবাদ এখন আর কোনো ধর্মের নাম নয়, এটা একটা গোত্রের নাম! যে কেউ তাদের এই লেখাটা পড়লেই বুঝবে যে এটা বর্ণবাদিতা। কিন্তু তারা বলে যে এটা আসলে জাতীয়তাবাদীতা, যেটাকে তারা খুব ইতিবাচকভাবে তুলে ধরে। [2] মজার ব্যাপার হচ্ছে সেই ওরাই আবার ইসরাঈল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কিছু বললে সেটাকে বলে Anti semetic!!

পবিত্র ভূমি (প্যালেস্টাইনের) প্রতি তাদের যে দাবী, সেটার উৎস হচ্ছে বাইবেলের একটা আয়াত, যেখানে আল্লাহ্ ইব্রাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বংশধরদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে উনি তাদেরকে এই জায়গার নিয়ন্ত্রণ দিবেন-

"And I will give unto thee and to thy seed after thee, the land where in thou art a stranger, all the land of Canaan, for an everlasting possession; and I will be their God. And God said unto Abraham, Thou shalt keep my covenant therefore, thou, and thy seed after thee in their generations."[Genesis 17, verses 8 -9]

এখন, তারা মনে করে যে বিবি হাজেরা ইবরাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈধ স্ত্রী ছিলেন না, দাসী ছিলেন, তাই তাঁর গর্ভে জন্ম নেয়া ইসমাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবরাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপযুক্ত বংশধর হওয়ার যোগ্যতা রাখেন না...তাই উপরের আয়াতে যে Seed এর কথা বলা হয়েছে, সেটা শুধুই ইসহাক্ব আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধর, ইসমাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম নয়।

আমরা আগেই বলেছি যে ওদের বইয়ের লেখাই ওদের বিপক্ষে যায়, আজো বিকৃতি সাধনের পরও-

"If a man has two wives, one beloved, and another hated, and they have borne him children, both the beloved and the hated; and if the firstborn son be hers that was hated: then it shall be, when he maketh his sons to inherit that which he hath, that he may not make the son of the beloved firstborn before the son of the hated, which is indeed the firstborn: but he shall

acknowledge the son of the hated for the firstborn, by giving him a double portion of all that he hath: for he is the beginning of his strength; the right of the firstborn is his." [Deuteronomy, 21:15-17]

এখান থেকে আমরা বুঝি যে স্ত্রীর মর্যাদা বংশধর নির্ধারণে কোনো প্রভাব ফেলে না। বাইবেলে আরো একটি আয়াত আছে যেখানে বলা হয়েছে যে ইব্রাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লাম father of multiple nations, শুধু একটা না-

Then Abram fell on his face; and God said to him, "Behold, my covenant is with you, and you shall be the father of a multitude of nations. No longer shall your name be Abram, but your name shall be Abraham; for I have made you the father of a multitude of nations. I will make you exceedingly fruitful; and I will make nations of you, and kings shall come forth from you." (Genesis 17:3-6)

তারপরও তর্কের খাতিরে আমরা যদি ধরেও নেই যে ওরাই শুধু ইব্রাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লামের আসল বংশধর, তবেও ওদের যুক্তি ধোপে টেকে না। কেন? কারণ ওরাতো নিজেদের এখন ইহুদী বলে পরিচয় দেয়! আল্লাহ্ কী বলছেন দেখুন-

ইব্রাহীম ইহুদী ছিলেন না এবং নাসারাও ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন 'হানীফ' অর্থাৎ, সব মিথ্যা ধর্মের প্রতি বিমুখ এবং আত্নসমর্পণকারী, এবং তিনি মুশরিক ছিলেন না। (৩:৬৭)

অথবা তোমরা কি বলছ যে, নিশ্চয়ই ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব (আঃ) ও তাদের সন্তানগন ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান ছিলেন? আপনি বলে দিন, তোমরা বেশী জান, না আল্লাহ বেশী জানেন? (২:১৪০)

[1] কেউ যদি আসলেই আগ্রহী হন তাহলে এই সাইটে গিয়ে **Jews** লিখে **search** দিতে পারেন, যেসব আয়াতে আরবী ইয়াহুদ শব্দটা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো চেক করে আসতে পারেন। http://quran.com/search?q=jews&page=3

[2] এটার উপর একটা নোট লিখেছিলাম- http://on.fb.me/1vQkvRY

শিকড়ের সন্ধানে-৩১

আমরা পড়ছিলাম পবিত্র ভূমির উপর অধিকার সংক্রান্ত ইহুদীদের দাবীর অসারতা যে ওদের ধর্মগ্রন্থ থেকেই প্রমাণ করা যায় সেটা। কিন্তু এখন যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেই যে নিজেদের আজকাল ইহুদী হিসেবে পরিচয় দিলেও জুডাহ যেহেতু বনী ইসরাঈলই ছিলেন তাই ওরা আদতে বনী ইসরাঈলই হচ্ছে এবং ওরাই ইব্রাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লামের একমাত্র বৈধ বংশধর, তাহলেও কি ওদের দাবী যুক্তিযুক্ত হয়ে যায়? প্যালেস্টাইনের অধিবাসীদের সরিয়ে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আল্লাহ্ ওদের সাথে আছেন, ওরা যত অন্যায়ই করুক না কেন... মেনে নেয়া যায় এই দাবী?

প্রশ্ন উঠতে পারে যে আল্লাহ্ নিজেইতো কুরআনে উল্লেখ করেছেন যে ওদেরকে তিনি নির্বাচিত করেছিলেন chosen people হিসেবে এবং পবিত্র ভূমি তাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। (আগে এটা আমরা উল্লেখ করেছি, ৭ম পর্বে, লিংকঃ http://on.fb.me/1kh9gNP)। তাহলে?

আমাদেরকে আসলে জানতে হবে যে আল্লাহ্ ওদেরকে নির্বাচিত করেছিলেন তো অবশ্যই, কিন্তু কিসের জন্য?

সেটা বোঝার জন্য আমাদের কুরআনের নিচের আয়াতটা পড়তে হবে-

তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যানের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। (৩:১১০)

এখানে আল্লাহ্ আমাদের, তথা মুসলিমদের শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে অভিহিত করেছেন। কিন্তু কেন? কারণ আমরা মানবজাতির কল্যাণ করবো, সৎ কাজের নির্দেশ দিবো, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবো এবং অন্যায় কাজে বাঁধা দিবো।

তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে?

ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই শ্রেষ্ঠত্বটা আসলে কাজের সাথে সম্পর্কিত, কোনো গোত্র বা বর্ণ নয়। আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলীয়দেরকেও ঠিক এইভাবে 'choose' করেছিলেন, শ্রেষ্ঠ জাতির মর্যাদা দিয়েছিলেন কিন্তু সেটা ছিল একটা মিশনের জন্য, যেন তাঁরা উপর্যুক্ত কাজগুলো করে...

কিন্তু বনী ইসরাঈলীয়রা এই chosen people এর কন্সেপ্টটা এমনভাবে উপস্থাপন করে যেন আল্লাহ্ তাদের জাতিটাকে choose করেছেন, কাজের জন্য না। তা তাদের জন্মগত

অধিকার.....তারা যাই করুক না কেন এটা স্থায়ীভাবে তাদের জিম্মাতেই থাকবে। আল্লাহর কাজই যেন শুধু ইহুদীদের serve করা (আস্তাগফিরুল্লাহ) ।

একটা কথা আমি প্রায়ই বলি যে এই পৃথিবীতে যত অন্যায়, পদস্খলন, শিরক, সব কিছুর মূলে রয়েছে আল্লাহ্ সম্পর্কে সম্যকভাবে অভিহিত না থাকা, আল্লাহকে না চেনা। এখন বলুন, আমাদের রাব্ব কি এমন হতে পারেন যে একটা জাতিকে সব সময় ক্ষমা করে দেবেন তা তারা যত অন্যায়ই করুক না কেন?

আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন ভুল ধারণার বশবর্তী হয়েই তারা আল্লাহর যে রূপ চিত্রিত করেছে তাতে মনে হবে তিনি একজন বর্ণবাদী, পক্ষপাতদুষ্ট God (আস্তাগফিরুল্লাহ)। শুধু তাই না, আল্লাহকে এইভাবে তুলে ধরতে গিয়ে তারা আল্লাহর বইকে বিকৃত করেছে। যেমনঃ তাদের মতে ইসমাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূর্তিপূজা শুরু করেছিলেনইবরাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকে কুরবানী , করতে চেয়েছিলেন সে ইসমাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন না, ছিলেন ইসহাক্ব আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারা আরো বলে যে ইসমাইল আলাইহি ওয়াসাল্লামর প্রভাবে ইসহাক্ব আলাইহি ওয়াসাল্লাম নষ্ট হয়ে যেতে পারে দেখেই বিবি সারাহ চেয়েছিলেন যে বিবি হাজেরা সহ ইসমাইল আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যেন মক্কায় নির্বাসিত করা হয়। এজন্যই আল্লাহ্ তাদের কথা বলছেন-

হে মুসলমানগণ, তোমরা কি আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? তাদের মধ্যে একদল ছিল, যারা আল্লাহর বাণী শ্রবণ করত; অতঃপর বুঝে-শুনে তা পরিবর্তন করে দিত এবং তারা তা অবগত ছিল। (২:৭৫)

তারা আসলে আল্লাহকে চিনতে পারেনি, আর সে জন্যই এমন মনগড়া ধারণা নিয়ে বসে আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে যারা ইহুদী ছিল, তাদের অনেকগুলো বক্তব্য থেকে আমরা এর উদাহরণ পাই। আল্লাহ্ এমন অনেকগুলো ঘটনা আমাদের শেখার জন্য কুরআনে উল্লেখ করেছেন। যেমন-

আর ইহুদীরা বলেঃ আল্লাহর হাত বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরই হাত বন্ধ হোক। এ কথা বলার জন্যে তাদের প্রতি অভিসম্পাত। বরং তাঁর উভয় হস্ত উন্মুক্ত। (৫:৬৪)

তারা বলেঃ আগুন আমাদিগকে কখনও স্পর্শ করবে না; কিন্তু গণাগনতি কয়েকদিন। (২:৮০)

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে যে, আল্লাহ হচ্ছেন অভাবগ্রস্ত আর আমরা বিত্তবান! এখন আমি তাদের কথা এবং যেসব নবীকে তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে তা লিখে রাখব, অতঃপর বলব, আস্বাদন কর জ্বলন্ত আগুনের আযাব। (৩:১৮১)

তাদের ভুলটা এক কথায় আল্লাহ্ বলে দিচ্ছেন নিচের আয়াতে-
তারা আল্লাহকে যথার্থরূপে বোঝেনি। কেয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আসমান সমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে। তিনি পবিত্র। আর এরা যাকে শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে। (৩৯:৬৭) [1]

আমি যত এই বিষয়গুলো নিয়ে পড়ি, তত কুরআন কিভাবে সব বিভ্রান্তি দূর করে দিয়েছে সেটা উপলব্ধি করি আর আমার রাব্বের প্রতি কৃতজ্ঞতায় বুকটা ভরে যায়। দেখুন আমাদের রাব্ব, যিনি কী না ন্যায় বিচারক, তিনি ইবরাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুআতে কি উত্তর দিচ্ছেন-

যখন ইব্রাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করে দিলেন, তখন পালনকর্তা বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করব। তিনি বললেন, আমার বংশধর থেকেও! তিনি বললেন আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের পর্যন্ত পৌঁছাবে না।(২:১২৪)

অর্থ্যাৎ আল্লাহ্ সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছেন যে ইবরাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরদের মাঝে কেউ যদি অত্যাচারী হয়ে যায়, তবে তিনি তাদের সাথে থাকবেন না! কী দারুণ, তাই না? আমাদের রাব্ব অবশ্যই বর্ণবাদী নন, তাই একজন মানুষ যে পরিবারেই জন্ম নিক না কেন, সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে সে স্বাগতম। একটা ব্যাপার হয়তো আমরা অনেকেই লক্ষ্য করিনি যে আমাদের দ্বীনের নাম কোনো মানুষের নাম দিয়ে নয়। যেমনটা দেখুন বৌদ্ধ ধর্ম, ক্রিস্টান বা ইহুদী ধর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য! মুসলিম অর্থ আত্মসমর্পণকারী! এজন্যই আল্লাহ্ বলছেন-

নিঃসন্দেহে যারা মুসলমান হয়েছে এবং যারা ইহুদী, নাসারা ও সাবেঈন, (তাদের মধ্য থেকে) যারা ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে তার সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে। (২:৬২) [2]

Chosen people এর আসল, নিগূঢ় অর্থটা কি আমাদের বোধগম্য হয়েছে এখন? কেউ যদি আমাদের কুরআন থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দাবী করে যে[3] প্যালেস্টাইনকে আল্লাহই পবিত্র ভূমি হিসেবে উল্লেখ করেছেন এবং সেটা বনী ইসরাঈলীয়দেরকে দিয়েছেন তবে আমরা কি বুঝাতে পারবো তাদের আসল ব্যাপারটা? আমরা কি তাদের বলতে পারবো যে হ্যাঁ, দিয়েছিলেন এই

প্রতিশ্রুতি, কিন্তু তা unconditional ছিল না, বরং শর্তযুক্ত ছিল, যখনই ওরা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা (একত্ববাদ নিজেদের জীবনে ধারণ ও সেটা প্রচার) রক্ষা করেছে তখন আল্লাহ সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন, যখন তারা সেটা ভংগ করেছে, তখনই সেখান থেকে তাদের বিতাড়িত করেছেন। আর ২৯তম পর্বেই উল্লেখ করেছি যে এই ব্যাপারটা ওদের নিজেদের বইতে আজো আছে, বিকৃতির পরও... (Deuteronomy 4:25-27, New International Version)

কখনো যদি আসলেই জীবনে এমন পরিস্থিতি আসে যে আমাদের ওদের যুক্তি খণ্ডন করতে হবে, তাহলে আমাদের প্রথমে তাদের জিজ্ঞেস করা উচিৎ যে Is you claim unconditional? Does your God support violence and oppression? What kind of Baised God you have?
আর সবচেয়ে ভালো হয় যদি আল্লাহর দেয়া যুক্তি প্রদর্শন করতে পারি-

বলুন হে ইহুদীগণ, যদি তোমরা দাবী কর যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু-অন্য কোন মানব নয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৬২:৬) [4]

আল্লাহ্ নিজেই অবশ্য উত্তর দিয়ে দিচ্ছেন যে-
তারা নিজেদের কৃতকর্মের কারণে কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। আল্লাহ জালেমদের সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন। (৬২:৭)
বিঃদ্রঃ আমাদের মনে হতে পারে যে গত দুই পর্ব ধরে আমরা কাহিনীর বর্ণনা থেকে সরে এসেছি। কিন্তু আসলে আমাদের যেটা উদ্দেশ্য ছিল- শিকড় সন্ধান করা, আমরা সেটার কাছাকাছি চলে এসেছি আলহামদুলিল্লাহ। আগামী পর্ব থেকে ইনশাল্লাহ আমরা সেইসব ঘটনা প্রবাহ বর্ণনা করা শুরু করবো যা তৎকালীন মুসলিমদের ইহুদী তথা কাফিরে পরিণত করেছিল। কিভাবে আমরা ৩টা ধর্মে ভাগ হয়ে গেলাম- ইহুদী, ক্রিস্টান এবং ইসলাম..... ওই ঘটনাগুলো বোঝার জন্য এই পটভূমির দরকার ছিল।

[1] Al-Bukhari recorded that `Abdullah bin Mas`ud, May Allah be pleased with him, said, "One of the rabbis came to the Messenger of Allah and said, `O Muhammad! We learn that Allah will put the heavens on one finger, the earths on one finger, the trees on one finger, the water and dust on one

finger, and the rest of creation on one finger, then He will say: I am the King.' The Messenger of Allah smiled so broadly that his molars could be seen, in confirmation of what the rabbi had said. Then the Messenger of Allah recited this verse

[2] আমি অনেকদিন পর্যন্ত এই আয়াতটা পড়ে আমি কফিউজড হয়ে যেতাম-------তাহলে কি অমুসলিমরাও জান্নাতে যাবে? এখন বুঝি যে এই আয়াতের মানে হচ্ছে কোন পরিবারে জন্ম নিয়েছে সেটা বড় কথা না, ঈমান ও আমলই বড় কথা। গত শতাব্দীতে মুসলিমরা যখন পশ্চিমা দেশগুলোতে সেটল করলো এবং অ্যাপোলোজেটিক হয়ে গেল নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে, তখনই তারা এই আয়াতটার অপব্যাখ্যা দেয়া শুরু করে এবং এমন কনফিউশনের জন্ম নেয় যেটা আগে কখনো ছিল না। আরো বিস্তারিত জানতে -
http://podcast.bayyinah.com/2012/04/26/surah-al-baqarah-ayah-62/
এটা শুনে দেখতে পারেন।

[3] কিছু মুসলিম নামধারী ব্যক্তিকে আমরা দেখবো যে ইহুদীদের দালালি করতে। তারা মুসলিম নাম ধরে কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা দেয় এবং বলে যে কুরআনেই আছে যে প্যালেস্টাইনের আসল দাবীদার ইহুদীরাও। এমন একজন লোক হচ্ছে তথাকথিত SHAYKH PROF. PALAZZI। তার এলখা আপনি পাবেন ইহুদী সাইটগুলোতে! যেমন-http://www.templemount.org/quranland.html

[4] কারণ তারা মনে করে যে আগুন তাদের স্পর্শ করবে না!

শিকড়ের সন্ধানে-৩২

আমরা কথা বলছিলাম কিভাবে বনী ইসরাঈলয়রা আল্লাহর নির্বাচিত বান্দা হিসেবে তাওহীদ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব থেকে সরে গিয়ে 'ইহুদী 'নামক একটা গোত্রে পরিণত হল এবং আল্লাহর দেয়া সমস্ত অনুগ্রহ সমূহকে নিজেদের জন্মগত অধিকার হিসেবে বিবেচনা করা শুরু করলো।

আমরা আরো দেখেছি যে ওরা যখন বিভিন্ন পাপকাজে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিল, তখন আল্লাহ্ ওদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিলেন এবং ব্যবিলনীয়দের মাধ্যমে ওদের রাজত্ব ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন। তারপর জেনেছি যে ব্যবিলনে নির্বাসিত বনী ইসরাঈলীয়দের একটা অংশ পারসিয়ান রাজার শাসনামলে জেরুজালেমে ফিরে আসে ও উযাইর আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে তাওরাতের আলোকে জীবন যাপন শুরু করে। এই সময়েই তাঁরা ফিরে এসে 1st temple এর ধ্বংসাবশেষের উপর আরেকটি স্থাপনা নির্মাণ করে যা ইতিহাসে 2nd temple নামে সমধিক পরিচিত। এই সময়ের পরিক্রমায় বনী ইসরাঈলয়দের ১২ গোত্রের মাঝে শুধু জুডাহ গোত্রটি টিকে থেকেছে, বাকি সবগুলোই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

আজকের পর্বে আমরা কয়েক শতাব্দী Fast forward করে কাহিনী বর্ণনা শুরু করবো। এই সময়ের মাঝে ক্ষমতার পালাবদল হয়ে জুডাহ রাজ্য রোমানদের অঙ্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে (আগে এটা ছিল পারসিয়ানদের অঙ্গরাজ্য)। এখন আমরা যে ঘটনাগুলো জানবো সেখানে কয়েকটা নাম ঘুরে ফিরে বারবার আসবে। তাই এদের মাঝে পারস্পরিক সম্পর্কগুলো জেনে নেয়া জরুরি।

ইমরান-মারঈয়াম বিনতে ইমরান- ঈসা ইবনে মারঈয়াম
যাকারিয়্যা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়্যা আলাইহি ওয়াসাল্লাম

এর অর্থ হল মারঈয়াম ছিলেন ইমরানের মেয়ে, ইমরান ছিলেন বনী ইসরাঈলয়দের মাঝে একজন অত্যন্ত নেক বান্দা (তবে নবী নয়)। আল্লাহ্ উনাকে এতটাই সম্মানিত করেছেন যে উনার নামে কুরআনের একটি পূর্ণ সূরা নাযিল করেছেন। বলেন তো সেই সূরাটা কী?

আর যাকারিয়্যা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন একজন নবী, তাঁর ছেলে ছিলেন ইয়াহইয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনিও একজন নবী ছিলেন।

এখন মারঈয়ামের মা এবং ইয়াহইয়া আলাইহি ওয়াসাল্লামের মা ছিলেন দুই বোন। অর্থ্যাৎ মারঈয়াম বিনতে ইমরান ও ইয়াহইয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন কাজিন।

আমরা আমাদের কাহিনী শুরু করবো মারঈয়ামের জন্ম কাহিনী দিয়ে। তার আগে এটা বলে নেয়া ভালো যে কুরআনে মারঈয়ামকে যতটা সম্মান দেয়া হয়েছে আর কোনো নারীকে এতটা মর্যাদা দেয়া হয়নি।[1] কুরআনে তাকে উপস্থাপন করেছে সমগ্র মানবজাতির জন্য দৃষ্টান্ত ও অনুসরণীয় হিসেবে। In fact মারঈয়ামই একমাত্র নারী কুরআনে যার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর নামে কুরআনের একটি পূর্ণ সূরার নামকরণও করা হয়েছে। সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে-

Many men reached the level of perfection, but no woman reached such a level except Mary, the daughter of Imran and Asia, the wife of Pharaoh." (Al Bukhari).

মজার ব্যাপার হল যে কুরআনে যতবার ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম নেয়া হয়েছে, ততবার তাকে উল্লেখ করা হয়েছে মারঈয়ামের পুত্র হিসেবে। যে Jesus, Jesus বলে চিল্লায়ে ক্রিস্টানরা গলা ফাটিয়ে ফেলছে, সেই ব্যক্তিত্বকে আল্লাহ্ পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন মারঈয়ামের পুত্র হিসেবে। কী দারুণ সম্মান, তাই না?

কুরআনে মারঈয়ামের কাহিনী শুরু হয়েছে উনি মায়ের গর্ভে থাকাকালীন সময়ে। ইমরান ও তাঁর স্ত্রী সুদীর্ঘসময় ধরে নিঃসন্তান ছিলেন। এরপর আল্লাহ্ যখন তাকে সন্তানের নিয়ামত দান করলেন তখন উনার প্রতিক্রিয়া কী ছিল? আল্লাহ্ কুরআনে সেটা আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছেন-

ইমরানের স্ত্রী যখন বললো-হে আমার পালনকর্তা! আমার গর্ভে যা রয়েছে আমি তাকে তোমার নামে উৎসর্গ করলাম সবার কাছ থেকে মুক্ত রেখে। আমার পক্ষ থেকে তুমি তাকে কবুল করে নাও, নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞাত। (৩:৩৫)

আমি ব্যক্তিগতভাবে এই আয়াতটা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছি। আমরা সবাই জানি যে সন্তান আল্লাহর এক দারুণ নিয়ামত, 'মা' অথবা 'বাবা' ডাকটা পৃথিবীর মধুরতম শব্দের একটি, কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে আসলে সন্তান লালন-পালনের উদ্দেশ্য কী হওয়া উচিৎ সেটা যেন আল্লাহ্ আমাদেরকে এই আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছেন-সেটা হল আল্লাহর রাস্তায় সৈনিকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা.....পৃথিবীতে আল্লাহর একজন বান্দা তৈরি করা। আর এটা একটা বিশাল দায়িত্ব।

চারপাশে তাকালে ভুরি ভুরি উদাহরণ পাওয়া যাবে যেখানে সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীরা ভুল প্যারেন্টিং এর ফসল.... আমাদের মাঝে যারা সন্তানের মা-বাবা হতে চাইছেন তাদের এই আয়াত থেকে বিশাল শিক্ষণীয় আছে- আমরা কেন মা-বাবা হতে চাই?

আর যারা already মা-বাবা হয়ে গিয়েছেন, তাদেরও এই নিয়ামতের ব্যাপারে আরেকটু সতর্ক হওয়া উচিৎ, তাঁরা কি নিয়ামতের মোড়কে সাজানো দায়িত্বগুলোর ব্যাপারে আদৌ সচেতন? আমাদের আজকাল খুব করে দরকার প্যারেন্টিং এর উপরে পড়াশোনা করা [2] যেন আমরা আল্লাহর দরবারে দাঁড়িয়ে অন্তত বলতে পারি যে আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি।

এই আয়াতের আরেকটি অনন্য দিক হচ্ছে humility র শিক্ষা। যদিও ইমরানের স্ত্রী আল্লাহর রাস্তায় নিজের গর্ভস্থ সন্তানকে উৎসর্গ করেছিলেন, তবু সেটা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে নাকি সে ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন। এটা থেকে আমরা বুঝি যে আমাদের কখনোই আমাদের ইবাদাত কবুল হয়েছে এ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না বা এটা নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভোগা যাবে না। এটা নিয়েও দুআ করতে হবে যেন আল্লাহ্ আমাদের সকল ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাসমূহ কবুল করে নেন।

ফিরে আসছি কাহিনীতে। মারঈয়ামের মা ভেবেছিলেন যে তাঁর একটা ছেলে হবে যাকে তিনি নির্দ্বিধায় আল্লাহর রাস্তায় কাজে লাগাতে পারবেন। তাই মারঈয়ামের জন্মের পর যখন তিনি দেখলেন যে তাঁর মেয়ে হয়েছে, তখন তিনি তাঁর বিষণ্ণতা লুকাতে পারলেন না, বলে উঠলেন-

হে আমার পালনকর্তা! আমি এক কন্যা প্রসব করেছি। (৩:৩৬)

দেখুন আল্লাহ্ উত্তরে কী অসাধারণ একটা কথা বলছেন-

বস্তুতঃ কী সে প্রসব করেছে আল্লাহ তা ভালই জানেন। সেই কন্যার মত কোন পুত্রই যে নেই। আর আমি তার নাম রাখলাম মারইয়াম। আর আমি তাকে ও তার সন্তানদেরকে তোমার আশ্রয়ে সমর্পণ করছি। অভিশপ্ত শয়তানের কবল থেকে। অতঃপর তাঁর পালনকর্তা তাঁকে উত্তমভাবে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাঁকে প্রবৃদ্ধি দান করলেন-অত্যন্ত সুন্দর প্রবৃদ্ধি। (৩:৩৬-৬৭)

সেই কন্যার মত কোন পুত্রই যে নেই- কথাটা পড়লেই বুকটা ভরে যায় এক অব্যক্ত ভালো লাগায়...তাই না?

ইমরানের স্ত্রী কী ভেবেছিলেন? উনার একটা ছেলে হবে যে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকবে, তাঁর চাওয়াটা ছিল এতটুকুই। কিন্তু সম্ভবত উনার নিয়্যতটা ছিল নির্ভেজাল, তাই আল্লাহ্ উনাকে এমন একজন সন্তান দিয়েছিলেন যিনি হয়ে গেছেন সারা মানবজাতির আদর্শ! এভাবেই আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় বান্দাদের দুআ কবুল করেন, কিন্তু সেটা কবুল করেন ভিন্ন কোনো পন্থায়, যার ফলাফল হয় এমন, যা যেন আমরা চাইতেও ভয় পাই, তাই না? [3]

এখান থেকে আমরা আবারো কী শিক্ষা পাই? আমাদের দুআর ফলাফল সবসময় যে আমাদের পরিকল্পনা মাফিক হবে তা নয়, কিন্তু আমাদের ভরসা রাখতে হবে আল্লাহর পরিকল্পনায়। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কুশলী।

[1] আমরা যারা কোনো পশ্চিমা দেশে বাস করছি, তাদের যদি কখনো কোনো ক্রিস্টানকে দাওয়াহ দেয়ার সুযোগ হয় তবে কুরআনে মারঈয়াম ও ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সংক্রান্ত আয়াতগুলো হতে পারে একটা দারুণ Starting point। কারণ ওরা যখন দেখবে যে ওদের ধর্মের central figure কে আমরাও খুব সম্মান করি তখন ওরা ইসলামের ব্যাপারে আগ্রহী হবে ইনশাল্লাহ।

[2] প্যারেন্টিং এর উপর কিছু রিসোর্স আছে এখানে
https://www.youtube.com/watch?v=TcO4QeJDvcU
http://www.yawarbaig.org/yawarbaig/articles/59-bringing-up-a-muslim-child-owning-a-sacred-responsibility
http://productivemuslim.com/raising-productive-and-confident-muslim-kids-part-2/
https://www.youtube.com/watch?v=cyG_WhAyttQ
http://www.kalamullah.com/nurturing-eeman-in-children.html
Kalamullah.Com | Nurturing Eeman in Children | Dr. Aisha Hamdan
www.kalamullah.com
http://productivemuslim.com/interview-sharifah-aljifri/#ixzz3OpUCmedS&f
http://www.ilmfruits.com/2015/10-examples-of-how-rasulullah-treated-children/

[3] আলহামদুলিল্লাহ, আমার নিজের জীবনে আমি একাধিকবার এটা উপলব্ধি করেছি, আল্লাহর কাছে যা চেয়েছি, তার চেয়ে বহুগুণ বেশী সুযোগ দিয়ে আল্লাহ্ ধন্য করেছেন, যতটা চাওয়ার সাহসই বা হয়নি কখনো!

শিকড়ের সন্ধানে-৩৩

মারঈয়াম যখন তাঁর মায়ের পেটে তখন তাঁর বাবা মারা যান। উনার জন্মের পর সবাই বুঝতে পেরেছিল যে উনি আর দশটা সাধারণ শিশুর মত নয়, তাই ইহুদীদের মাঝে যারা নেতৃস্থানীয় ছিল, তাদের মাঝে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল যে কে উনার দেখাশোনার দায়িত্ব নিবে। যেহেতু যাকারিয়্যা আলাইহি ওয়াসাল্লাম উনার খালু ছিলেন, তাই স্বাভাবিকভাবেই উনার অধিকার বেশী হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সবাই উনার দেখাশোনার দায়িত্ব পাওয়াটাকে একটা সৌভাগ্যের বিষয় মনে করছিল, তাই উনাকে অগ্রাধিকার দেয়ার ব্যাপারটা ওরা মেনে নিতে পারছিল না...সমাধান স্বরূপ ওরা চিন্তা করলো যে ওরা লটারি করবে। আল্লাহর ইচ্ছা ছিল যে যাকারিয়্যা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন দায়িত্বটা নেন, তাই বারবার ফলাফল যাকারিয়্যা আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুকূলেই আসছিল। ফলে ওরা বাধ্য হয় উনার কাছে মারঈয়ামের অভিভাবকত্বের দায়িত্ব অর্পণ করতে।

এ হলো গায়েবী সংবাদ, যা আমি আপনাকে পাঠিয়ে থাকি। আর আপনি তো তাদের কাছে ছিলেন না, যখন প্রতিযোগিতা করছিল যে, কে প্রতিপালন করবে মারইয়ামকে এবং আপনি তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা ঝগড়া করছিলো। (৩:৪৪)

আল্লাহ্ আরো জানাচ্ছেন-

অতঃপর তাঁর পালনকর্তা তাঁকে উত্তম ভাবে গ্রহণ করে নিলেন এবং তাঁকে প্রবৃদ্ধি দান করলেন- অত্যন্ত সুন্দর প্রবৃদ্ধি। আর তাঁকে যাকারিয়ার তত্ত্বাবধানে সমর্পন করলেন। (৩:৩৭)

এই ঘটনাটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে- আমরা যদি আমাদের জীবনটা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় করি তাহলে আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের অসমাপ্ত দায়িত্বগুলো সুন্দরভাবে সম্পাদনের দায়িত্ব নিবেন আল্লাহ্ সুবহানুওয়াতালা নিজে। আমরা সূরাহ কাহফেও দেখতে পাই যে আল্লাহ্ ইয়াতীম বালকদ্বয়ের সম্পদ রক্ষা করেছিলেন কারণ তাদের বাবা ছিলেন দ্বীনদার। এই উপলব্ধিটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ দেখা যায় আমাদের জীবনের একটা বিরাট অংশ কাটে সন্তানদের জীবনটাকে নিশ্চিন্ত আর আরামদায়ক করার প্রচেষ্টায়। এই কাজে ব্যস্ত থাকতে গিয়ে আমাদের হয়তো দ্বীন শিক্ষাই করার সময় হয় না। অবশ্যই এই কাজগুলোও ইবাদাত যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়, কিন্তু আমাদের এটা ভুলে গেলেও চলবে না যে সম্পদ ও সন্তান সন্ততিদের আল্লাহ্ কুরআনে পরীক্ষা স্বরূপ উল্লেখ করেছেন। এই নিয়ামতগুলো

যদি আমাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ করে দেয়, তবে এগুলো বিশাল পরীক্ষা বৈকি! আমাদের আশেপাশে যদি কেউ ছোট্ট বাচ্চা রেখে মারা যায় তাহলে আমাদের সবার আগে মনে হয় যে এখন এই বাচ্চাগুলোর কী হবে। তখন আমাদের এই বিষয়টা মাথায় রাখা উচিৎ যে আমাদের আমল যদি ভালো হয় তাহলে আল্লাহই সুব্যবস্থা করবেন ইনশাল্লাহ।

ফিরে আসছি মারঈয়ামের কাহিনীতে। খুব ছোট্টবেলা থেকেই উনি আল্লাহর ইবাদাতে অধিকাংশ সময় কাটাতেন। তাঁর সাথে কিছু অলৌকিক ঘটনাও ঘটতো। যখনই যাকারিয়্যা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর খোঁজ খবর নেয়ার জন্য যেতেন, তিনি দেখতেন যে ঐ মৌসুমে পাওয়া যায় না এমন ফল, খাবার উনার কাছে। একদিন উনি কৌতূহল সংবরণ করার জন্য জানতে চাইলেন যে এগুলো কোথা থেকে আসে। কুরআন এই কথোপকথনটা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন-

যখনই যাকারিয়া মেহরাবের মধ্যে তার কছে আসতেন তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন। জিজ্ঞেস করতেন "মারইয়াম! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো?" তিনি বলতেন, "এসব আল্লাহর নিকট থেকে আসে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন।" (৩:৩৭)

মারঈয়ামের এই উত্তরটা যাকারিয়্যা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুব নাড়া দিল। হঠাৎ করেই যেন তিনি আবার উপলব্ধি করলেন যে আল্লাহর অসাধ্য কিছু নেই। তখন ওই স্থানে দাঁড়িয়েই তিনি আল্লাহর দরবারে একজন সন্তানের জন্য দুআ করলেন, কারণ তিনি নিজেও ছিলেন নিঃসন্তান-

সেখানেই যাকারিয়া তাঁর পালনকর্তার নিকট প্রার্থনা করলেন। বললেন, হে, আমার পালনকর্তা! তোমার নিকট থেকে আমাকে পুত-পবিত্র সন্তান দান কর-নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী। (৩:৩৮)

কুরআনের অন্যত্র আল্লাহ্ তাঁর এই দুআর আরো বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছেন-

এটা আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহের বিবরণ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি। যখন সে তাঁর পালনকর্তাকে আহবান করেছিল নিভৃতে। সে বললঃ হে আমার পালনকর্তা আমার অস্থি বয়স-ভারাবনত হয়েছে; বার্ধক্যে মস্তক সুশুভ্র হয়েছে; হে আমার পালনকর্তা! আপনাকে ডেকে আমি কখনও বিফল মনোরথ হইনি। আমি ভয় করি আমার পর আমার স্বগোত্রকে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা; কাজেই আপনি নিজের পক্ষ থেকে আমাকে একজন কর্তব্য পালনকারী দান করুন। সে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে ইয়াকুব বংশের এবং হে আমার পালনকর্তা, তাকে করুন সন্তোষজনক। (১৯:২-৬)

এবং যাকারিয়ার কথা স্মরণ করুন, যখন সে তার পালনকর্তাকে আহবান করেছিল; হে আমার পালনকর্তা আমাকে একা রেখো না। তুমি তো উত্তম ওয়ারিস। (২১:৮৯)

উনার এই দুআ থেকে আমরা দুআ করার আদবগুলো শিখতে পারি। [1]আমাদের একটা খুব পরিচিত অভিযোগ হচ্ছে যে আমাদের দুআ কেন কবুল হয় না। আমরা ভুলে যাই যে হয়তো আমরা নিজেরাই দুআ কবুল না হওয়ার পেছনে কারণ! হয়তো আমরা যথার্থ আদবগুলো মেনে চলছি না?

প্রথমত, আল্লাহর সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলী দিয়ে চাওয়া, যেমনটা যাকারিয়্যা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।

দ্বিতীয়ত, নিজের অসহায়ত্ব ও দুর্বলতার কথা তুলে ধরা, যেমনটা যাকারিয়্যা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে আমার অস্থি বয়স-ভারাবনত হয়েছে; বার্ধক্যে মস্তক সুশুভ্র হয়েছে, ইত্যাদি।

তৃতীয়ত, দুআ কবুল হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত থাকা, যেমনটা যাকারিয়্যা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে আপনাকে ডেকে আমি কখনও বিফল মনোরথ হইনি। এক্ষেত্রে একটা প্রাসঙ্গিক হাদীস জানাটা খুব জরুরী-

The Prophet sallallahu alaihi wa salaam said: *"When one of you makes dua he should not say, 'O Allah, forgive me if you wish, have mercy on me if you wish, give me provision if you wish', but he should ask with resolve because he oes what He likes; no one can force Him."* (Bukhari)

The Prophet sallallahu alahi wa salaam also said: *"Ask Allah when you are sure of His response, and remember that Allah does not accept the dua of the unmindful and negletful heart."*

(Declared hasan by our Sheikh Al-Albani in "Silsilah al-Ahadith al-Sahihah" #594)

The Prophet sallallahu alaihi wa salaam said: *"The servant's dua will be answered provided he does not ask for what is sinful or for the breaking off of relations, and also if he does not show impatience."* He was asked, 'O Messenger of Allah, what is impatience?' And he replied, *"That the servant says: I invoked, but I do not think it (my invocation) was answered, and he becomes disappointed and abandons dua."* (Muslim from Abu Hurairah)

চতুর্থত, নিজের প্রয়োজনের কথা বলতে হবে, যেমনটা যাকারিয়্যা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে উনি উনার গোত্রের লোকদের ভয় পান যে হয়তো তারা আল্লাহর পথ থেকে সরে যাবে, আল্লাহ্ যেন উনাকে সন্তানবিহীন না রাখেন ইত্যাদি।

পঞ্চমত, দুআ করতে হবে নিভৃতে, দুআ হওয়া উচিৎ আল্লাহর সাথে একান্ত কথোপকথন। আমাদের দেশে যেভাবে জনসম্মুখে চিল্লায়ে চিল্লায়ে দুআ করা হয় সেটাতে আদব কতটুকু রক্ষিত হয় আল্লাহ্ ভালো জানেন।

আমরা এখানেও দেখছি যে যাকারিয়্যা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন সন্তান চাচ্ছেন, আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের জন্য, নিজে বাবা ডাক শোনার জন্য নয়, যেটা নিয়ে আমরা আগের পর্বে বিস্তারিত আলাপ করেছি।

আমাদের এই আলোচনা থেকে আরো একটা বিষয় লক্ষণীয় যে আল্লাহর অনেক নৈকট্যশীল বান্দাদেরই আল্লাহ্ পরীক্ষা করেছেন দীর্ঘদিন নিঃসন্তান রেখে। আমরা ইব্রাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে এটা দেখেছি, এখানেও এমন দুইটা কেস দেখলাম। আবার এটাও দেখলাম যে একনিষ্ঠভাবে দুআ করার ফলে যে সন্তান আল্লাহ দিয়েছেন তাঁরা একেকজন ছিলেন একেবারে রত্ন! তাই আমাদের কখনো আশা ছাড়া উচিৎ না, আল্লাহর নবীরা যেভাবে দুআ করেছেন সেভাবে দুআ করে যাওয়া উচিৎ। [2]

[1] দুআ কবুলের আদবের উপরে একটা অসাধারণ লিংক রয়েছে এখানে-
https://www.facebook.com/notes/iloveallaahcom/the-etiquette-of-dua-20-tips/10150105074867963
http://www.islamicfinder.org/articles/article.php?id=182&lang=english

[2] এখানে সব দুআগুলো একসাথে আছে। http://islamqa.info/en/2910

শিকড়ের সন্ধানে-৩৪

যাকারিয়্যা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আন্তরিক দুআর জবাব আল্লাহ দিয়েছিলেন একদম সাথে সাথেই-
যখন তিনি কামরার ভেতরে নামাযে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন ফেরেশতারা তাঁকে ডেকে বললেন যে, আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহইয়া সম্পর্কে, যিনি সাক্ষ্য দেবেন আল্লাহর নির্দেশের সত্যতা সম্পর্কে, যিনি নেতা হবেন এবং নারীদের সংস্পর্শে যাবেন না, তিনি অত্যন্ত সৎকর্মশীল নবী হবেন। (৩:৩৯)

এমন তাৎক্ষণিক উত্তরে যাকারিয়্যা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও মনে হয় হতবিহবল হয়ে গিয়েছিলেন, তাই আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা সত্বেও অভিভূত তিনি বলে উঠেছিলেন-

হে পালনকর্তা! কেমন করে আমার পুত্র সন্তান হবে, আমার যে বার্ধক্য এসে গেছে, আমার স্ত্রীও যে বন্ধ্যা। (৩:৪০)
আল্লাহ উত্তরে বললেন-
আল্লাহ এমনি ভাবেই যা ইচ্ছা করে থাকেন। (৩:৪০)

যাকারিয়্যা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে পালনকর্তা আমার জন্য কিছু নিদর্শন দাও। (৩:৪১)
আল্লাহ বললেন,
তোমার জন্য নিদর্শন হলো এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত কারও সাথে কথা বলবে না। তবে ইশারা ইঙ্গিতে করতে পারবে এবং তোমার পালনকর্তাকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে আর সকাল-সন্ধ্যা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করবে। (৩:৪১) *[1]*
আল্লাহ কুরআনে এই পুত্র তথা ইয়াহইয়া আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেশ কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন-
১) এই নাম আগে আর কাউকে রাখা হয়নি-

হে যাকারিয়া, আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তার নাম হবে ইয়াহইয়া। ইতিপূর্বে এই নামে আমি কারও নাম করণ করিনি। (১৯:৭)

২) তিনি নারীদের সংস্পর্শে যাবেন না (৩:৩৯)

৩) আল্লাহ তাঁকে শৈশবেই বিচার বুদ্ধি দিয়েছিলেন- (১৯:১২)

৪) তিনি ছিলেন মা-বাবার প্রতি বিশেষভাবে অনুগত **(১৯:১৪)**

৫) তিনি ছিলেন নিরহংকার, পরহেযগার **(১৯:১২-১৩)** তাঁর ব্যাপারে সবচেয়ে সুন্দর আয়াত সম্ভবত নিচের আয়াতটি-

তার প্রতি শান্তি-যে দিন সে জন্মগ্রহণ করে এবং যেদিন মৃত্যুবরণ করবে এবং যে দিন জীবিতাবস্থায় পুনরুত্থিত হবে। **(১৯:১৫)**
ইয়াহইয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম খ্রিস্টানদের ধর্ম গ্রন্থেও খুব পরিচিত একজন ব্যক্তিত্ব। তাদের কাছে তিনি "John the Baptist" হিসেবে সমধিক পরিচিত। তাদের প্রথা অনুসারে Baptism একটা প্রতীকী শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া। ওদের ব্যাখ্যা অনুসারে যখন কেউ পানিতে ব্যাপ্টাইজড হয়, তখন আদতে সে যীশুর রক্তের মাঝে অবগাহন করছে এবং তার সাথে মারা যাচ্ছে, তারপর পুনর্জীবন লাভ করছে। (Romans 6:3-4, Colossians 2:12)

আমরা অনেকেই হয়তো জানি যে ক্রিস্টানরা বিশ্বাস করে যে যীশু খ্রিস্ট, Son of God সকল মানবজাতির পাপের প্রায়শ্চিত্য স্বরূপ ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন। তাদের বিশ্বাস মতে প্রতিটা মানব শিশুই 'পাপী' হয়ে জন্মায়, সেই 'আদি পাপ' যা আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও বিবি হাওয়া করেছিলেন নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে। তাই যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে, ব্যাপ্টিজমের মাধ্যমে একজন নবজাতক ক্রিস্টান হয়, তথা পাপমুক্ত হয়, যেমনটা আগে উল্লেখ করেছি। তাদের এই প্রথার উৎস তাদের ধর্ম গ্রন্থ, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে যীশুর জীবদ্দশায় তাঁকে এই ব্যাপ্টিজমের কাজটা করেছিলেন John, আর সেজন্যই মূলত তিনি "John the Baptist" হিসেবে তাদের কাছে পরিচিত।

আমরা জানি যে ক্রিস্টান বা ইহুদীদের ধর্ম গ্রন্থ থেকে আমরা তখনই কোনো তথ্য বা উপাত্ত গ্রহণ করতে পারবো যখন তা ইসলামের কোনো মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক হবে না। এখন আমরা দেখছি যে ব্যাপ্টিজমের এই পুরো ধারণাটাই ইসলামের ভিত্তিমূলে কুঠারাঘাত করে। তাই আমরা কুরআন বা সহীহ হাদীসে এই সম্পর্কিত কিছু জানতে পারি না। তবে আমরা যদি কখনো Comparitive Religion নিয়ে পড়াশোনা করি তাহলে দেখবো যে, আজকের ক্রিস্টান ধর্মের অধিকাংশ বিশ্বাস, প্রথাগুলোর উদ্ভাবক হচ্ছেন Paul, যিনি মূলত এই ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐশ্বরিক রূপের সূচনাকারক। আমরা এতটুকু শুধু বলতে পারি যে যেহেতু ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইয়াহইয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুজনেই মুসলিম ছিলেন তাই তাঁরা নিঃসন্দেহে নামায

ও অন্যান্য ইবাদাতের জন্য নিজেদের পবিত্র করতেন, যেমনটা আমরা আজো করি গোসল ও ওযূর মাধ্যমে। এমন ঘটনার উল্লেখ রয়েছে ওদের ধর্ম গ্রন্থে এবং তৎকালীন ইহুদীদের মাঝেও পানির দ্বারা পবিত্র হবার প্রথা বিদ্যমান ছিল (Mark 1:9-11, Numbers 19:1-22; Leviticus 14-15-16:24-28)। সেরকম ঘটনাকেই পল অপব্যাখ্যা করে আজকের ব্যাপ্টিজম প্রথার প্রচলন ঘটিয়েছে যেটা আজ পরিণত হয়েছে যীশু ক্রিস্টের তথাকথিত মৃত্যু ও এর মাধ্যমে পাপ মোচনের প্রতীকে।

কাহিনীর ধারাবাহিকতার সুবিধার্থে আমরা আজকে যাকারিয়্যা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইয়াহইয়া আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী বর্ণনা শেষ করে দিবো, যদিও এর মাঝে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে গেছে।
ইয়াহইয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়সে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে কয়েক বছরের বড় ছিলেন। আমরা যখন আগামী পর্বগুলোতে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে বিস্তারিত জানবো ইনশাল্লাহ, তখন দেখবো যে যখন অধিকাংশ ইহুদীরা উনাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, উনি ছিলেন তাদের মাঝে একজন যারা উনার উপর এবং উনার বিস্ময়কর জন্মের উপর ঈমান এনেছিলেন ও অকুণ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করেছিলেন। দুজনে প্রায় একই সময়ে তৎকালীন ইহুদীদের কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন।[2]

ইয়াহইয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনকার ইহুদীদেরকে আবার আল্লাহর পথে ফিরে আসার জন্য আহবান জানাচ্ছিলেন। তিনি খুব অল্প সময়ের মাঝে খুব জনপ্রিয় হয়ে যান মানুষের মাঝে। তখনকার অন্যান্য অধিকাংশ স্কলাররা শাসক বাহিনীর পদলেহী হয়ে গিয়েছিলেন এবং ওরা যে ফতওয়া শুনতে চাইতো, অপব্যাখ্যা করে হলেও তাদের মনের মত নিয়ম কানুন প্রচার করতো। এমন সময়ে আল্লাহর প্রকৃত বিধান মানুষের কাছে তুলে ধরার ব্যাপারে ইয়াহইয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আপোষহীন।

ইয়াহইয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মানুষের কাছে আল্লাহর বাণী প্রচার করছিলেন, তখন কিছু ইহুদীরা বিস্মিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল যে কোন অধিকারে তিনি এমনটা করছিলেন। তাদের বক্তব্য তারা তাদের ধর্মগ্রন্থে রেকর্ড করে রেখেছে এইভাবে-

“And this is the record of John when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, ‘Who are you?’ And he confessed, and denied not; but

confessed, 'I am not the Christ.' And they asked him, 'What then? Are you Elijah? And he said, 'I am not.' 'Are you that Prophet?' And he answered, 'No.'" (John, 1: 19-21).

এই উদ্ধৃতিটা আমরা এখানে শুধু কাহিনীর প্রাসঙ্গিকতার খাতিরে উল্লেখ করবো, কিন্তু এখন এটার কোনো বিশ্লেষণে যাবো না, সামনের পর্বে এটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত কথা বলবো ইনশাল্লাহ।

ইয়াহইয়া আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু কিভাবে হয়েছিল সেটার ব্যাপারেও কুরআন ও হাদীসকে আমরা নিরবতা অবলম্বন করতে দেখি। তবে আহলে কিতাবদের উৎস থেকে বর্ণিত ঘটনা তাফসীরকারকরা উল্লেখ করেছেন। সেটা হল তৎকালীন ইহুদীদের রাজা Herod Anitpas একজন নারীকে বিয়ে করতে চেয়েছিল [3] যার সাথে ইহুদী ধর্ম মতে বিয়ে নিষিদ্ধ ছিল। তখনকার সকল স্কলাররা যারা শাসকদের দ্বারা সুবিধা ভোগী ছিল তারা ঠিকই এই নিষিদ্ধ কাজের অনুমোদন দিয়ে ফতওয়া দিয়ে দেয়। কিন্তু আগেই বলেছি যে ইয়াহইয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন আপোষহীন। তিনি সত্যের পথে ছিলেন অবিচল আর এজন্য স্বাভাবিকভাবেই তিনি রাজার চক্ষুশূল হন। কিন্তু যে নারীর প্রেমে তিনি পড়েছিলেন সেও রাজার স্ত্রী হবার স্বপ্ন পূরণে দেরী সহ্য করতে পারছিল না, তাই একদিন রাজাকে মোহাবিষ্ট করে সে আবদার করে যে তার ইয়াহইয়া আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্তিত মস্তক 'উপহার' হিসেবে চাই। রাজাও ঘোরের মাঝে এই নির্দেশ অনতিবিলম্বে পালন করতে বলেন তার অনুচরদের, ফলে তারা ইয়াহইয়া আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করে।

কথিত আছে যে তাঁকে মাসজিদুল আকসাতে হত্যা করা হয়। এ সময় যাকারিয়্যা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছেলেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন, তখন তারা তাঁকেও হত্যা করতে উদ্যত হয়। তিনি জীবন বাঁচানোর জন্য একটা গাছের মধ্যে আশ্রয় নেন, কিন্তু রাজার অনুগত বাহিনী তাতেও ক্ষান্ত না হয়ে গাছটাকেই অর্ধেক করে ফেলে, ফলে যাকারিয়্যা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীরও দু টুকরা হয়ে যায়।

আগেই বলেছি যে এই ঘটনার বর্ণনা সহীহ হাদীস বা কুরআনে পাওয়া যায় না। তবে আল্লাহ কুরআনে ইহুদীদের তিরস্কার করেছেন তাদের 'নবীদের হত্যা' করার স্বভাবের জন্য। সেই সব আয়াতের তাফসীরে অনেক তাফসীরকারক এই ঘটনাদ্বয় উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

[1] সূরা মারঈয়ামের ৭-১১ আয়াতে এই ঘটনা আবারো উল্লেখ করা হয়েছে।

[2] সহীহ হাদীসে (যেমন আহমাদ, তিরমিযী ও অন্যান্য) এমন ঘটনার বর্ণনা এসেছে যেখানে এনারা দুজন আলোচনা করছিলেন যে কিভাবে তৎকালীন ইহুদীদের আবার আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনা যায় ইত্যাদি।

[3] আমাদের ভাষায় মাহরাম নারী। তাদের মাঝে সম্পর্কের স্বরূপ নিয়ে একাধিক মত আছে, কেউ বলে ভাস্তি, কেউ বলেন ভাইয়ের স্ত্রী ইত্যাদি।

শিকড়ের সন্ধানে-৩৫

গত পর্বে বলেছি, আবারো বলছি যে কাহিনীর ধারাবাহিকতা রক্ষার্থে আমরা এক পর্বেই যাকারিয়্যা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইয়াহইয়া আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী শেষ করে ফেলেছি। কিন্তু ঘটনার ক্রম চিন্তা করলে ইয়াহইয়া আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের কিছুদিন পরেই ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের ঐতিহাসিক ঘটনাটা ঘটে।

আজকের পর্ব থেকে আমরা যে ঘটনা প্রবাহ উল্লেখ করবো সেগুলো এমন বিষয় যেগুলোর ব্যাপারে কুরআন কী বলে তা আমাদের বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরা উচিৎ। এই ঘটনাগুলো প্রকৃত চিত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকার কারণে দুনিয়াতে কত মানুষ যে ভ্রান্তির বেড়াজালে আটকে আছে তা ভাবলেও অবাক লাগে। এই বিষয়গুলো নিয়ে লিখবো বলে আমি যখন পড়াশোনা করছিলাম তখন আমার রাবের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমি যেন ন্যুজপৃষ্ঠ হয়ে যাচ্ছিলাম! ইসলাম কত পরিষ্কারভাবে আমাদের সত্য জানিয়ে দিয়েছে, যে সত্য জানার জন্য কত কোটি মানুষ উন্মুখ হয়ে আছে! অথচ আমরা সেই ইসলামকেই ত্যাগ করছি। What an irony!

যাই হোক, আমরা কথা বলেছিলাম মারঈয়ামকে নিয়ে যিনি ছিলেন আল্লাহর অত্যন্ত নৈকট্যশীল বান্দা, মসজিদের এক নিভৃত অংশ বেছে নিয়ে তিনি নিয়মিত আল্লাহর ইবাদাতে নিমগ্ন থাকতেন। তাঁর খোজখবর নিতে গিয়ে প্রতিবারই যাকারিয়্যা আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতে পেতেন এমন সব খাবার যা ওই ঋতুতে পাওয়া যায় না।

এভাবেই দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু মারঈয়ামকে নিয়ে আল্লাহর পরিকল্পনা ছিল পুরোই অন্যরকম। উনাকে আল্লাহ নির্বাচিত করেছিলেন এমন এক ঘটনা সংগঠনের জন্য যা পৃথিবীর ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায়।

যখন ফেরেশতা বলল হে মারইয়াম! আল্লাহ তোমাকে পছন্দ করেছেন এবং তোমাকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করে দিয়েছেন। আর তোমাকে বিশ্ব নারী সমাজের উর্ধ্বে মনোনীত করেছেন। (৩:৪২)
আল্লাহ আমাদেরকে এই কাহিনী জানাচ্ছেন এভাবে-

এই কিতাবে মারইয়ামের কথা বর্ণনা করুন, যখন সে তার পরিবারের লোকজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্বদিকে এক স্থানে আশ্রয় নিল। অতঃপর তাদের থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্যে সে পর্দা

করলো। অতঃপর আমি তার কাছে আমার রূহ প্রেরণ করলাম, সে তার নিকট পুর্ণ মানবাকৃতিতে আত্নপ্রকাশ করল। মারইয়াম বললঃ আমি তোমা থেকে দয়াময়ের আশ্রয় প্রার্থনা করি যদি তুমি আল্লাহভীরু হও। (১৯:১৬-১৮)

এই আয়াতে উল্লেখিত 'আমার রুহ' অংশটুকু নিয়ে অনেক ধরণের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়। বলা হয় যে আল্লাহই বলেছেন যে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রুহের অংশ ইত্যাদি। তাই এই বিষয়ের উপর আমরা একটু বিস্তারিত আলোকপাত করবো।
এই বিষয়গুলো বোঝার জন্য আমাদের প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে কুরআনকে আরবী ভাষায় নাযিল করা হয়েছে, তাই অনুবাদ থেকে কুরআনের ব্যাপারে কোনো উপসংহারে পৌঁছানো যাবে না। কুরআনের ভাষা শৈলী বোঝার জন্য আরবী ভাষার নিয়ম-কানুন ও অলংকরণ সম্পর্কেও সম্যক ধারণা রাখতে হবে। সর্বোপরি কুরআনের কোন আয়াতকে বিচ্ছিন্নভাবে তুলে এনে out of the context ব্যাখ্যা করা যাবে না। তাফসীর শাস্ত্রের কিছু মূলনীতি রয়েছে একমাত্র যার আলোকেই কুরআনের আয়াত ব্যাখ্যা করতে হবে। এই মূলনীতিগুলোর মাঝে প্রথম হচ্ছে কুরআনের আয়াত ব্যাখ্যা করতে হবে অপর আয়াতের দ্বারা।

এর প্রেক্ষিতে যদি এখন আমরা 'রুহুল্লাহ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে তা বুঝতে চাই, তাহলে দেখবো যে এর দ্বারা আসলে জিব্রাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বোঝানো হয়েছে। কুরআনের আরো একাধিক জায়গায় তাঁকে এভাবে সম্বোধন করা হয়েছে, যেমন সূরা নাহলের ২ নং আয়াতে, সূরা ক্বাদরে ইত্যাদি।

এছাড়াও আরেকটি বিষয় এখানে লক্ষণীয়। কোনো কিছু আমার বলার অর্থ নয় যে সেটা আমার শরীরের অংশ। যেমন আমার হাত, সেটা আমার শরীরের অংশ, কিন্তু আমার বই বা আমার শার্ট আমার শরীরের অংশ নয়। আমরা কুরআনে দেখি যে সালিহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রেরিত উটকে আল্লাহ আল্লাহর উট হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তখন কিন্তু আমরা মনে করি না যে এই উটটা আল্লাহর অংশ। (নাঊযুবিল্লাহ)

ইসলামের সাথে অন্য সব ধর্মের একটা মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে এখানে স্রষ্টা আর সৃষ্টি সম্পূর্ণ ভিন্ন সত্ত্বা। আমি এবার IOU তে Comparitive Religion নিয়ে পড়ছি, সেখানে এমন সব ধর্ম নিয়ে পড়েছি আগে যার নামও শোনা হয়নি। সব ধর্মেই কিভাবে যেন সৃষ্টি আর স্রষ্টা একীভূত হয়ে গেছে। আপনি হিন্দু ধর্মের পুনর্জীবন চক্র নিয়ে যদি পড়েন তাহলে দেখবেন এই অন্তহীন চক্র

শেষ হয় যখন আত্মা ঐশ্বরিক শক্তি (ব্রাহ্মার) সাথে একাত্ম হয়ে যায় তখন। আরেকটা খুব সাধারণ বিচ্যুতি হচ্ছে Incarnation এর কন্সেপ্ট, যার মানে হচ্ছে God মানুষের রূপ ধরে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। অর্থ্যাৎ সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ছাড়া স্রষ্টাকে এরা কল্পনাই করতে পারে না। অনেক সুফী মতবাদেও কুরআনের এই আয়াতটাকে দলীল হিসেবে দেখানো হয় যে এখানে বলা হয়েছে আল্লাহ মানুষের মাঝে তাঁর আত্মা ফুঁকে দিয়েছেন, মানে মানুষের আত্মা আসলে আল্লাহর অংশ ইত্যাদি। (নাঊযুবিল্লাহ)

ফিরে আসছি আমাদের কাহিনীতে। জিবরাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারঈয়ামের কাছে এসেছিলেন পূর্ণ মানব আকৃতিতে। নিজের নিভৃত ইবাদাতের স্থানে একজন পুরুষকে এভাবে আসতে দেখে প্রথমেই তিনি তাঁকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন যেন তিনি কোনো খারাপ কাজ করার আগে চিন্তা করেন। আল্লাহর নাম শুনে জিবরাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু পিছু হটে গেলেন এবং তাঁকে আশ্বস্ত করে জানালেন-

আমি তো শুধু তোমার পালনকর্তা প্রেরিত, যাতে তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করে যাব।(১৯:১৯)

স্বাভাবিকভাবেই বিস্মিত মারঈয়াম বলে উঠলেন-

কিরূপে আমার পুত্র হবে, যখন কোন মানব আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ব্যভিচারিণীও কখনও ছিলাম না? (১৯:২০)

মানবজন্মের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ছাড়া আর কোনো কিছু সেই মুহূর্তে উনার মাথায় আসেনি। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে আবার জানালেন যে আল্লাহ যখন কোনো কিছু করতে চান তবে সেটার জন্য কোনো পূর্ব প্রক্রিয়ার দরকার হয় না, আল্লাহর ইচ্ছাই যথেষ্ট-

সে বললঃ এমনিতেই হবে। তোমার পালনকর্তা বলেছেন, এটা আমার জন্যে সহজ সাধ্য এবং আমি তাকে মানুষের জন্যে একটি নিদর্শন ও আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ করতে চাই। এটা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার। (১৯:২১)

কুরআনের অন্যত্র একই কথা বলা হয়েছে একটু অন্য আঙ্গিকে-

যখন ফেরেশতাগণ বললো, হে মারইয়াম আল্লাহ তোমাকে তাঁর এক বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হলো মসীহ-মারইয়াম-তনয় ঈসা, দুনিয়া ও আখেরাতে তিনি মহাসম্মানের অধিকারী এবং আল্লাহর ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত। (৩:৪৫)

তাফসীরকারকরা এই আয়াতে উল্লেখিত 'কালিমা' বা আল্লাহর বাণীর ব্যাখ্যা করেছেন যে এই বাণী হচ্ছে 'কুন', ফা ইয়া কুন- মানে হও, আর হয়ে যায়। কারণ সূরা আল ইমরানে আল্লাহ বলছেন-

এভাবেই আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যখন কোন কাজ করার জন্য ইচ্ছা করেন তখন বলেন যে, 'হয়ে যাও' অমনি তা হয়ে যায়। (৩:৪৭)

এরপরের কাহিনীও আমরা কুরআন থেকেই জানতে পারি।

শিকড়ের সন্ধানে-৩৬

জিবরাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের বেশে এসে মারঈয়ামের ব্যাপারে আল্লাহর পরিকল্পনা জানানোর পরের কাহিনীও আমরা কুরআন থেকে জানতে পারি-

অতঃপর তিনি গর্ভে সন্তান ধারণ করলেন এবং তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলে গেলেন। প্রসব বেদনা তাঁকে এক খেজুর বৃক্ষ-মূলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করল। তিনি বললেনঃ হায়, আমি যদি কোনরূপে এর পূর্বে মরে যেতাম এবং মানুষের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত হয়ে, যেতাম! (১৯:২২-২৩)

এই আয়াতটা খুব আবেগপূর্ণ লাগে আমার কাছে। আমরা যখন কুরআনে এই সব কাহিনীগুলো পড়ি, তখন আমাদের অধিকাংশের মাথায় যে ধারণাটা কাজ করে সেটা হল আরে উনারাতো মহামানব/ মহীয়সী ছিলেন। এটা একটা বিশাল ভুল কন্সপেট। এই ধারণা নিয়ে কুরআন পড়ি বলেই আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একে প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হই। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে যদি এগুলো অতি মানবীয় ঘটনা হত, তাহলে আল্লাহ শিক্ষা নেয়ার জন্য এগুলো আমাদেরকে জানাতেন না। উনারাও আমাদের মতই মানুষ ছিলেন, তাদের কষ্টের তীব্রতা আমাদের মতই ছিল। তাই আসুন একবার আমরা মানুষ মারঈয়ামকে অনুভব করার চেষ্টা করি!

অধিকাংশ মেয়েরাই তাদের প্রথম গর্ভ ধারণের সময়টা মায়েদের বাড়িতে কাটাতে চায়। এই সময়টা প্রতিটা মেয়ের জন্যই খুব নাজুক একটা সময়। ইমোশোনাল এবং নৈতিক সমর্থন এই সময় তাদের সবচেয়ে বেশী দরকার হয়। অথচ মারঈয়ামের কথা ভাবুন! তিনি কাউকে এই ঘটনা জানাতে পারছেন না, একদম একা এই সময়টা পার করছেন এবং এই কষ্টের সহসা লাঘব হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। কারণ সন্তান জন্মের পর তাঁকে নিয়ে গেলেও তাঁকে রাজ্যের কুকথা শুনতে হবে, তাঁর এতদিন ধরে অর্জিত সুনাম এক নিমিষে ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে! অথচ এই পুরো ঘটনাটাতে তাঁর কোনো ভূমিকা নেই, আল্লাহ ঠিক করেছেন যে তাঁর মাধ্যমে এমন অস্বাভাবিক একটি জন্ম হবে! আমরা কি বুঝতে পারছি তাঁর কষ্টের মাত্রাটুকু?

মারঈয়াম মানুষ ছিলেন বলেই হয়তো বা সেই প্রচণ্ড কষ্টের সময় মৃত্যু কামনা করেছিলেন! আর আমাদের রাব্ব, তাঁর এই মানবীয় দুর্বলতাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তিনি উত্তরে বলেননি যে How come you are praying for death! How come you can not remain patient!

না, আল্লাহ সেটা বলেননি। তিনি কী বলেছিলেন?

অতঃপর ফেরেশতা তাকে নিম্নদিক থেকে আওয়ায দিলেন যে, তুমি দুঃখ করো না। তোমার পালনকর্তা তোমার পায়ের তলায় একটি নহর জারি করেছেন। আর তুমি নিজের দিকে খেজুর গাছের কান্ডে নাড়া দাও, তা থেকে তোমার উপর সুপক্ক খেজুর পতিত হবে। যখন আহার কর, পান কর এবং চক্ষু শীতল কর। (১৯:২৪-২৬)

আল্লাহ তাঁকে বলেছিলেন তুমি দুঃখ করোনা। কী অসাধারণ একটা লাইন, তাই না? আজকের পর থেকে, জীবনের দুঃখ কষ্ট আর হতাশাগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে আমরা কি মারঈয়ামের কথা মনে করে সান্ত্বনা পাবো? কল্পনা করতে পারবো যে আল্লাহ আমাদের বলছেন, দুঃখ করো না?

আমরা যদি খেজুর গাছ দেখে থাকি তাহলে জানবো যে এটার কাণ্ড ধরে ঝাঁকা দিলে কিছুই হয় না। তাহলে আল্লাহ কেন উনাকে বলেছিলেন এই কাজ করতে?

আমাদের মনে আছে মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে যখন লোহিত সাগর আর পিছনে ফিরাঊন ধেয়ে আসছিল, তখন নিজের লোকেদের তিরষ্কারে হতবিহবল, কিন্তু আল্লাহর উপর অবিচল ভরসাকারী মুসার কাছে কী নির্দেশ এসেছিল?

সাগরে লাঠি দিয়ে আঘাত করো!

লাঠি দিয়ে সাগরে হাজারবার আঘাত করলেও যেমন তা দু ফাঁক হয় না, খেজুর গাছের কাণ্ড হাজারবার ধাক্কালেও সেটা থেকে ফল পড়ে না। কিন্তু মারঈয়ামের ক্ষেত্রে এটা ছিল একটা মুযিজা। আগেই আমরা ব্যাখ্যা করেছি যে এটা থেকে বোঝা যায় যে আল্লাহ অলৌকিকভাবে আমাদের সমস্যার সমাধান করে দিতে পারেন ঠিকই, কিন্তু আমাদেরকে আমাদের সাধ্যের সবটুকু ঢেলে দিয়ে চেষ্টা করতে হবে, সেটা আপাত দৃষ্টিতে সাগরে লাঠি দিয়ে আঘাত বা খেজুর গাছের কাণ্ড ধরে ঝাঁকানোর মত অর্থহীন বা তুচ্ছ কাজ মনে হলেও। আমাদের চেষ্টার বদৌলতেই হয়তো আল্লাহর সাহায্য আসবে!

ফিরে আসছি আমাদের কাহিনীতে। সন্তান জন্মদানের অমানুষিক কষ্ট ভোগের পরও পরীক্ষার এখনই শেষ নয়, এই সন্তানকে নিয়ে এখন ফিরে যেতে হবে লোকালয়ে, যেখানে মানুষ জানতে চাইবে সন্তানের পিতৃ পরিচয়। তখন কী বলবেন মারঈয়াম? আল্লাহই জানিয়ে দিলেন যে কী করতে হবে-

যদি মানুষের মধ্যে কাউকে তুমি দেখ, তবে বলে দিওঃ আমি আল্লাহর উদ্দেশে রোযা মানত করছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সাথে কথা বলব না। (১৯:২৬)

এরপরের কাহিনীও আমরা কুরআন থেকে জানতে পারছি-

অতঃপর তিনি সন্তানকে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে উপস্থিত হলেন। তারা বললঃ হে মারইয়াম, তুমি একটি অঘটন ঘটিয়ে বসেছ। হে হারূণ-ভাগিনী, তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিলেন না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিনী। অতঃপর তিনি হাতে সন্তানের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তারা বললঃ যে কোলের শিশু তার সাথে আমরা কেমন করে কথা বলব? (১৯:২৭-২৯)

অর্থ্যাৎ মারঈয়ামকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ না দিয়েই তারা ধারণা করে বসলো যে এই সন্তান অনৈতিক সম্পর্কের ফসল!

এই খানে এসে অমুসলিমরা অনেকেই কুরআনের ভুল ধরতে চায় এই মর্মে যে এখানে মারঈয়ামকে 'হারুণের বোন' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে যেটা একটা ঐতিহাসিক ভুল, কারণ হারুণ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মারঈয়াম সমসাময়িক ছিলেন না। তাফসীরকারকরা এটা খণ্ডন করেছেন এইভাবে যে এখানে বোন আক্ষরিক অর্থে নয় বরং দ্বীনী অর্থে। অবশ্যই কুরআন সকল ভুল ত্রুটির ঊর্ধ্বে, আলহামদুলিল্লাহ্।

যাই হোক, মারঈয়ামের সদ্যজাত ঈসার দিকে ইঙ্গিত করার সাথে সাথে ঈসা বলে উঠলেন-

আমি তো আল্লাহর দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে। এবং জননীর অনুগত থাকতে এবং আমাকে তিনি উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি। আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মগ্রহণ করেছি, যেদিন মৃত্যুবরণ করব এবং যেদিন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উত্থিত হব। (১৯:৩০-৩৩)

এইভাবে মায়ের কোল থেকে কথা বলা ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেয়া আল্লাহর মুযিজা সমূহের একটা। উনার এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি বেশ কয়েকটি কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণঃ

১) এখানে উনি নিজের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরেছেন যে উনি আদতে আল্লাহর দাস ও নবী ছাড়া আর কিছুই নয়।

২) এর মাধ্যমে উনার মায়ের প্রতি আরোপিত সম্ভাব্য অপবাদের দ্বার রুদ্ধ হয়ে গেছে।

কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এই ঘটনার পরও যা কী না সত্যকে দিবালোকের মত পরিষ্কার করে দেয়, তৎকালীন ইহুদীরা ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মেনে নেয়নি। তারা মারঈয়ামের চরিত্র নিয়ে কুৎসা রটানো অব্যাহত রাখে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে কেন?

কারণটা অতি সামান্য! আমরা ইয়াহইয়া আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাহিনী বর্ণনা করার সময় বলেছি যে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইয়াহইয়া আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমসাময়িক এবং উনাদের সময়ের স্কলাররা দুনিয়ার বিনিময়ে পরকাল বেঁচে দিয়েছিল এবং শাসক শ্রেণীর পদলেহী হয়ে গিয়েছিল, তাই ওরা সঠিকভাবেই ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে চিহ্নিত করেছিল ওদের প্রভাব আর প্রতিপত্তির উপর ভবিষ্যৎ হুমকি হিসেবে। তাই তারা তার এই অলৌকিক জন্ম ও কথা বলার বিষয়টা বেমালুম অস্বীকার করে গিয়েছিল।

ব্যাপারটা আজকে আমাদের কাছে অবাক লাগলেও এটা আসলে নতুন কিছু নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় এমন বহু মুযিজা দেখেও মক্কার মুশরিকরা ঈমান আনে নি, আমাদের সময়েও আল্লাহর শত কোটি নিদর্শন, কুরআনের জীবন্ত মুযিজা দেখেও আমরা আল্লাহ বিমুখ জীবনই যাপন করি, তাই না?
খুব কি দোষ দেয়া যায় ওদের?

শিকড়ের সন্ধানে-৩৭

ঈসা আলাইহিস সালামকে নিয়ে আলোচনার এই পর্বে এসে আমরা ঊনার অলৌকিক জন্মের ব্যাপারে আরো একটু বিস্তারিত আলোকপাত করব ।

আমরা যদি আল্লাহর অসামান্য ক্ষমতার কথা চিন্তা করি, তাহলে এইভাবে বাবা ছাড়া কারো জন্ম নেয়াটা কোনো ব্যাপারই না । তাই এই সিরিজের আগের পর্বগুলোতে বনী ইসরাঈলদের আল্লাহর সাথে কথোপকথন সম্পর্কে মন্তব্য করার সময়ে আমরা একটা কথা বলেছিলাম যে পৃথিবীতে যত বিচ্যুতি, পথভ্রষ্টতা সব কিছুর মূলে রয়েছে আল্লাহ সম্পর্কে সঠিক ধারণার অভাব । আমরা যদি খ্রিস্টানদের বিশ্বাসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখবো যে:

প্রথমত ওরা আল্লাহর ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করে দিচ্ছে

দ্বিতীয়ত ওরা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য আল্লাহর মাঝে আরোপ করছে ।

সেজন্য কুরআনে আল্লাহ সুস্পষ্ট ভাষায় ওদের দাবীকে প্রত্যাখ্যান করছেন ।

আমরা যদি ঈসা আলাইহিস সালামের এই অলৌকিক জন্মের ব্যাপারটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করি তাহলে দেখবো যে এর মাধ্যমে আসলে একটা চক্র সমাপ্ত হয়েছে । কী সেটা?

১) আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন কোনো পুরুষ ও নারী ব্যতিরেকেই

২) আল্লাহ বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন কোনো নারী ছাড়াই, শুধু পুরুষ থেকে

৩) আল্লাহ আমাদের সবাইকে সৃষ্টি করেছেন একজন পুরুষ ও নারীর মাধ্যমে

৪) আল্লাহ ঈসা আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন কোনো পুরুষ ছাড়াই, শুধু নারী থেকে

কী দারুণ ব্যাপারটা, তাই না? আল্লাহ কুরআনে দ্যর্থহীণ ভাষায় একথা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন:

নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত হচ্ছে আদমেরই মতো । তাকে মাটি দিয়ে তৈরী করেছিলেন এবং তারপর তাকে বলেছিলেন হয়ে যাও, সঙ্গে সঙ্গে হয়ে গেলেন । (৩:৫৯)

পক্ষান্তরে আমরা যদি খ্রিস্টানদের ট্রিনিটি কন্সেপ্টটা নিয়ে চিন্তা করি যে God is 1, yet 3 তাহলে মাথা গুলিয়ে যেতে বাধ্য । তারা মনে করে যে Father God, Son God, Holy

spirit, এই তিন সত্ত্বার সমন্বয়ে God এর কন্সেপ্ট । এটা কিভাবে সম্ভব, সেটা নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনার সীমা নেই । কিন্তু সত্যিটা এই যে অধিকাংশ খ্রিস্টানই এই কন্সপেটের মর্মার্থ বোঝে না, তারা এটাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে । আর এখানেই ইসলামের সাথে অন্যান্য ধর্মের একটা কাঠামোগত পার্থক্য । ইসলাম আমাদের থেকে চিন্তাশীলতা, বুদ্ধিবৃত্তিক পরিপক্কতা আশা করে, আর অন্য সব ধর্ম তাদের অনুসারীদের থেকে অন্ধ, নিঃস্বার্থ আনুগত্য আশা করে । তাই না বুঝেই কোটি কোটি মানুষ আজকের পৃথিবীতে ঈসা আলাইহিস সালামকে ঈশ্বরপুত্র হিসেবে উপাসনা করছে। Religion means Blind faith, এই কথাটা ইসলামের ক্ষেত্রে একেবারেই প্রযোজ্য না। বরং ইসলাম মনে হয় একমাত্র ধর্ম যেটা অবিশ্বাসীদের সামনে খোলা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয় কুরআনের ভুল বের করার জন্য। তাই বলা যায় আমরা বিশ্বাস করি with eyes open.

আমরা যদি ঈসা আলাইহিস সালামের জন্ম সংক্রান্ত কুরআনের এই বর্ণনা পড়ি, তখন মনে হয় কত সহজ আর যৌক্তিক! কিন্তু যদি ওদের বিশ্বাস নিয়ে চিন্তা করতে শুরু করি, তাহলে মাথা গুলিয়ে যেতে বাধ্য! কারণ ওদের ধর্মগ্রন্থের বিকৃতি সাধনের পরও ওরা একটা আয়াত দেখাতে পারবে না যেখান থেকে বোঝা যায় যে ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর ছেলে কিংবা ঊনি নিজেকে আল্লাহর ছেলে হিসেবে দাবী করেছেন। এই বিষয়টি প্রমাণের জন্য ওদেরকে ওদের ধর্মগ্রন্থের লাইনগুলোকে অনেক ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে ব্যাখ্যা করতে হয় । (আমরা পরে এই টপিকের উপর কয়েকটা পর্ব উৎসর্গ করবো ইনশাল্লাহ।)

ওদের এই ট্রিনিটির কন্সেপ্টটা নিয়ে অনেক কনফিউশনও আছে। একেতো বিষয়টা আধ্যাত্বিকভাবে জটিল, তার উপর এটার একটা দুনিয়াবী ভার্সন আছে। মানে ওদের নিউ টেস্টামেন্টে Joseph নামে একটা চরিত্র আছে যেটা ওদের ভাষায় Jesus এর earthly father ছিলো যিনি দুনিয়াতে ঊনার বাবার দায়িত্ব পালন করেছেন। কাহিনীটার এরকম যে মারইয়ামের ঊনার সাথে বিয়ে ঠিক হয়েছিল এমন সময়ে তিনি অন্তঃস্বত্ত্বা হয়ে পড়েন। জোসেফ ধরে নিয়েছিলো মারইয়াম বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, তিনি বিয়ে ভেঙ্গে দিতে ধরেছিলেন, কিন্তু আল্লাহর ওহী পেয়ে তা করেন নি। Jesus এর জন্মের সময়ে ঊনি মারইয়ামের পাশে ছিলেন ইত্যাদি.....পরে ঊনাদের সংসারে আরেকটি সন্তানও হয় যার নাম হচ্ছে জেমস, তাকে ওরা jesus এর একজন শিষ্য বা Alleged Brother হিসেবে উপস্থাপন করে। [1]যাই হোক, কুরআনের উপস্থাপনা থেকে জেনেছি যে এটা একেবারেই কাল্পনিক কাহিনী।

[1] যদি ইন্টারনেটে Joseph of the New Testament দিয়ে সার্চ দেন, তাহলে নিচের কাহিনী পাবেনঃ

ট্রিনিটি কন্সেপ্টটার এই জটিল এবং অবোধ্য সমীকরণ বহু খ্রিস্টানকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাই আমাদের সবার উচিৎ খ্রিস্টানদের এই বিশ্বাসের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা। সকল বিভ্রান্তি নিরসন করে আল্লাহ বলছেন:

এই মারইয়ামের পুত্র ঈসা। সত্যকথা, যে সম্পর্কে লোকেরা বিতর্ক করে। আল্লাহ এমন নন যে, সন্তান গ্রহণ করবেন, তিনি পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা, তিনি যখন কোন কাজ করা সিদ্ধান্ত করেন, তখন একথাই বলেন: হও এবং তা হয়ে যায়। তিনি আরও বললেন: নিশ্চয় আল্লাহ আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা। অতএব, তোমরা তার এবাদত কর। এটা সরল পথ। (১৯:৩৪-৩৬)

হে আহলে-কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর শানে নিতান্ত সঙ্গত বিষয় ছাড়া কোন কথা বলো না। নিঃসন্দেহে মরিয়মপুত্র মসীহ ঈসা আল্লাহর রসূল এবং তাঁর বাণী যা তিনি প্রেরণ করেছেন মরিয়মের নিকট এবং রূহ, তাঁরই কাছ থেকে আগত। অতএব, তোমরা আল্লাহকে এবং তার রসূলগণকে মান্য কর। আর একথা বলো না যে, আল্লাহ তিনের এক, একথা পরিহার কর; তোমাদের মঙ্গল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ একক উপাস্য। সন্তান-সন্ততি হওয়াটা তাঁর যোগ্য বিষয় নয়। যা কিছু আসমান সমূহ ও যমীনে রয়েছে সবই তার। আর কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট। (৪:১৭১)

এই সম্পর্কিত নিচের আয়াতটা পড়লে আমার বুকের মাঝে একধরণের কাঁপুনি সৃষ্টি হয়:

Joseph, best known as the husband of Mary and earthly father of Jesus, is found in the New Testament books of Matthew and Luke. Joseph was a man of strong beliefs. He not only strived to do what was right but also to do it the right way. When his betrothed Mary came to him with the news of her pregnancy, he knew the child could not be his. Joseph decided he would break the engagement but determined to do it in such a way that it would not bring shame to Mary. He wanted to be just, acting with fairness and love. He had great respect for Mary's character but her story of being miraculously impregnated by God's Holy Spirit was difficult to believe. During this time of consideration, he was visited by a messenger from God confirming Mary's story and convincing Joseph that Mary had not been unfaithful. God instructed Joseph to marry the young woman and honor her virginity until the baby was born. Joseph obeyed the Lord.

তারা বলে: দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন । নিশ্চয় তোমরা তো এক অদ্ভুত কান্ড করেছ । হয়ত এর কারণেই এখনই নভোমন্ডল ফেটে পড়বে, পৃথিবী খন্ড-বিখন্ড হবে এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচুর্ণ হবে । এ কারণে যে, তারা দয়াময় আল্লাহর জন্যে সন্তান আহবান করে । অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয় । নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে কেউ নেই যে, দয়াময় আল্লাহর কাছে দাস হয়ে উপস্থিত হবে না । (১৯:৮৮-৯৩)

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে ঈসা আলাইহিস সালাম নিজে কখনো দাবী করেননি যে আল্লাহর ছেলে। একজন রাসূল হিসেবে সেটা আসলে করার প্রশ্নই ওঠে না । তবু এই প্রসঙ্গে কুরআনে একটা অসাধারণ আয়াত আছে:

হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! তুমি কি লোকদেরকে বলে দিয়েছিলে যে, আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর? ঈসা বলবেন: আপনি পবিত্র! আমার জন্যে শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি যা বলার কোন অধিকার আমার নেই । যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই পরিজ্ঞাত; আপনি তো আমার মনের কথাও জানেন এবং আমি জানি না যা আপনার মনে আছে । নিশ্চয় আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত । আমি তো তাদেরকে কিছুই বলিনি, শুধু সে কথাই বলেছি যা আপনি বলতে আদেশ করেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব অবলম্বন কর যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা । আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম । অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন । আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ পরিজ্ঞাত । যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ । (৫:১১৬-১১৮)

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে আল্লাহ তো জানেনই যে ঈসা আলাইহিস সালাম কী বলেছেন আর না বলেছেন, তাই না? তাহলে কিয়ামতের দিন এটা তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করার কী মানে ।

এ ব্যাপারে মুফাসসিরদের ব্যাখ্যাটা আমাদের কাছে খুব হৃদয়গ্রাহী লেগেছে ।

কিয়ামতের দিন আসলে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার দিন । এইদিন কথা বলতে দেয়া হবে তাদের সবাইকে দুনিয়াতে যাদের কোন say ছিল না । আমরা যদি গভীরভাবে চিন্তা করি তাহলে দেখবো যে ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র হিসেবে উপাসনা করা আসলে ঊনার প্রতি এক ধরনের জুলুম । ওনাকে যে এইভাবে বিকৃত করা হয়েছে, সেটাতে ওনার কোনো ভূমিকা বা নিয়ন্ত্রণ ছিল না । তাই কিয়ামতের দিন ঊনাকে ঊনার বক্তব্য উপস্থাপনের সুযোগ দেয়া হবে ।

অন্যদিকে যারা ঈসা আলাইহিস সালামের মর্যাদা এভাবে বিকৃত করেছে, ঈসা আলাইহিস সালামের এই উক্তি তাদের জন্য হবে চরম বেদনাদায়ক । ভালোবাসার নামে তারা যে তার অবমাননা করেছে সেটার এক ধরনের শাস্তি এটা ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে খ্রিস্টানদের ট্রিনিটি কন্সেপ্টের অংশ Holy spirit আসলে কে সেটা কি আমরা বুঝতে পারছি এখন?

জ্বী, সেটা আর কেউই না, আমাদের অতি পরিচিত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম ।

যা আমাদের জন্য খুব সহজ আর সাধারণ, সেটাই ওদের কাছে কত জটিল, তাই না? আমরা কি আজকের পর থেকে কৃতজ্ঞ হব আল্লাহর কাছে যে ঊনি আমাদের এমন এক দ্বীন দিয়েছেন যা সহজবোধ্য, যৌক্তিক ও বুদ্ধিদীপ্ত? আলহামদুলিল্লাহ্!

শিকড়ের সন্ধানে-৩৮

আজকের পর্বে আমরা কথা বলবো ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর যে মুযিজা দিয়েছিলেন সেগুলো নিয়ে। জন্মের পরপরই কথা বলতে পারার সক্ষমতা ছাড়াও মানুষ যেন ঊনার উপর ঈমান আনে, সেজন্য আল্লাহ ঈসা আলাইহিস সালামকে আরো কিছু মুজিযা দিয়েছিলেন । আমরা এই সিরিজে আগেও উল্লেখ করেছি যে আল্লাহ কোনো নবীকে সেই বিষয় সংক্রান্ত মুজিযা দেন যে বিষয়ে ওই সময়ের মানুষেরা সবচেয়ে পারদর্শী থাকে, যেন তারা বুঝতে পারে যে এই নিদর্শন আল্লাহর পক্ষ থেকে । ঈসা আলাইহিস সালামের সময় তৎকালীন ইহুদীরা চিকিৎসা বিদ্যায় খুবই পারদর্শী ছিল । তাই আল্লাহ ঊনাকে কী কী মুজিযা দিয়ে পাঠিয়েছিলেন সেটা আমরা কুরআন থেকেই জানতে পারি:

তিনি বললেন নিশ্চয়ই আমি তোমাদের নিকট তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এসেছি নিদর্শনসমূহ নিয়ে । আমি তোমাদের জন্য মাটির দ্বারা পাখীর আকৃতি তৈরী করে দেই । তারপর তাতে যখন ফুৎকার প্রদান করি, তখন তা উড়ন্ত পাখীতে পরিণত হয়ে যায় আল্লাহর হুকুমে । আর আমি সুস্থ করে তুলি জন্মান্ধকে এবং শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে । আর আমি জীবিত করে দেই মৃতকে আল্লাহর হুকুমে । আর আমি তোমাদেরকে বলে দেই যা তোমরা খেয়ে আস এবং যা তোমরা ঘরে রেখে আস । এতে প্রকৃষ্ট নিদর্শন রয়েছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও । (৩:৪৯)

আমরা যদি এই মুজিযার লিস্টের দিকে চোখ বুলাই, তাহলে দেখবো যে প্রতিটার শেষে তিনি বলে দিচ্ছেন যে 'আল্লাহর হুকুমে' । এটাতো জানা কথাই যে মুজিযা ঘটে আল্লাহর হুকুমে। তাহলে?

কারণ খ্রিস্টানরা এগুলোকে প্রমাণ হিসেবে দাখিল করে যে ঈসা আলাইহিস সালাম ছিলেন আল্লাহর পুত্র, ঐশ্বরিক ক্ষমতাবলেই তিনি এগুলো করতে সক্ষম হয়েছিলেন (নাঊযুবিল্লাহ) । তবে মজার ব্যাপার হল ওদের বাইবেলেই এমন কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে যা ওদের এহেন দাবীর বিরুদ্ধে যায়। কী সেটা? নিউ টেস্টামেন্টেও উল্লেখিত আছে যে-

Once when Jesus tried to heal a blind man, he was not healed after the first attempt, and Jesus had to try a second time (Mark 8: 22-26). In another instance, "He could not do any miracles there, except lay his hands on a few sick people and heal them."(Mark 6:5)

অন্যত্র এটা বলা হচ্ছে যে মুযিজাগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকেই ছিলো-

"A man attested to you by God with miracles and wonders and signs which God performed through him in your midst." (Acts 2:22)

ওদের বইয়ের এই অংশগুলো নিঃসন্দেহে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের divinity র claim এর বিরুদ্ধে যায়। যদি উনি God (আস্তাগফিরুল্লাহ) ই হবেন, তাহলে কোনো সময় পারবেন, আর কোনো সময় পারবেন না এমন হবে কেন! উনি মানুষ ছিলেন বলেই এমনটা হত, তাই না?

Dr Lawrence Brown এর Misgoded বইটাতে আরো সুন্দর কিছু উদাহরণ আছে। উনি দেখিয়েছেন যে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেসব মুযিজার কথা বাইবেলে এসেছে, সেইসবগুলো মুযিজাই আবার অন্য নবীদের দ্বারা হয়েছে এমনটা বাইবেলেই আছে। তাহলে এইসব মুযিজা কিভাবে উনার Divinity র প্রমাণ হতে পারে!

আরো একটা বড় মুযিজা ছিল,

টেবিল সমৃদ্ধ খাবার যে ঘটনার কথা সূরা মায়িদাতে আছে। ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিষ্যরা আল্লাহর একটা নিদর্শন দেখতে চান। প্রথমে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন অনুরোধ রাখতে চান নাই। কারণ বনী ইসরাঈলের ইতিহাস বলে যে এমন অসংখ্য মুযিজা স্বচক্ষে দেখেও ওরা আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে বলে নেয়া ভালো যে আল্লাহর সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখার পরও ঈমান না আনলে তখন আল্লাহর শাস্তি অবধারিত হয়ে যায়। তাই অনেক সময়ই আল্লাহ্ মানুষের আকাংখিত মুযিজা দেখান না কারণ তিনি জানতেন যে এটা দেখেও তারা ঈমান আনবে না। সেক্ষেত্রে মুযিজা না দেখানোটাই আল্লাহর রহমত কারণ উনি ওই গোষ্ঠীকে ধ্বংস করতে চান না। এটা জানা প্রয়োজন কারণ আমরা কুরআনে দেখবো যে একাধিক জায়গায় আল্লাহ্ মক্কার কুরাইশদের আবদার মেনে নেন নাই। [2]

[2] এবং তারা বলেঃ আমরা কখনও আপনাকে বিশ্বাস করব না, যে পর্যন্ত না আপনি ভূপৃষ্ঠ থেকে আমাদের জন্যে একটি ঝরণা প্রবাহিত করে দিন।অথবা আপনার জন্যে খেজুরের ও আঙ্গুরের একটি বাগান হবে, অতঃপর আপনি তার মধ্যে নির্ঝরিনীসমূহ প্রবাহিত করে দেবেন। অথবা আপনি যেমন বলে থাকেন, তেমনিভাবে আমাদের উপর আসমানকে খন্ড-বিখন্ড করে ফেলে দেবেন অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাদেরকে আমাদের সামনে নিয়ে আসবেন।অথবা আপনার কোন সোনার তৈরী গৃহ হবে অথবা আপনি আকাশে আরোহণ করবেন এবং আমরা আপনার আকাশে আরোহণকে কখনও বিশ্বাস করবনা, যে

যাই হোক, কুরআন ঘটনাটা বর্ণনা করছে এভাবেঃ

যখন হাওয়ারীরা বললঃ হে মরিয়ম তনয় ঈসা, আপনার পালনকর্তা কি এরূপ করতে পারেন যে, আমাদের জন্যে আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করে দেবেন? তিনি বললেনঃ যদি তোমরা ঈমানদার হও, তবে আল্লাহকে ভয় কর। তারা বললঃ আমরা তা থেকে খেতে চাই; আমাদের অন্তর পরিতৃপ্ত হবে; আমরা জেনে নেব যে, আপনি সত্য বলেছেন এবং আমরা সাক্ষ্যদাতা হয়ে যাব। ঈসা ইবনে মরিয়ম বললেনঃ হে আল্লাহ আমাদের পালনকর্তা আমাদের প্রতি আকাশ থেকে খাদ্যভর্তি খাঞ্চা অবতরণ করুন। তা আমাদের জন্যে অর্থাৎ, আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্যে আনন্দোৎসব হবে এবং আপনার পক্ষ থেকে একটি নিদর্শন হবে। আপনি আমাদের রুযী দিন। আপনিই শ্রেষ্ট রুযীদাতা। (114)আল্লাহ বললেনঃ নিশ্চয় আমি সে খাঞ্চা তোমাদের প্রতি অবতরণ করব। অতঃপর যে ব্যাক্তি এর পরেও অকৃতজ্ঞ হবে, আমি তাকে এমন শাস্তি দেব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাউকে দেব না। (5:112-114)

" আমাদের প্রথম ও পরবর্তী সবার জন্যে আনন্দোৎসব হবে' এই অংশটুকু গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা বোঝায় যে আজ অবধি এটা উদযাপিত হয়ে আসছে। কেউ কি বলতে পারবেন যে আজকের সময়ে ক্রিস্টানদের উদযাপিত এই উৎসবটা কী? এটার নাম হচ্ছে Eucharist, or Communion বা The last supper.[3] এটা খ্রিস্টানদের উৎসবের একটা কেন্দ্রবিন্দু সবসময়ই।

কিন্তু মজার ব্যাপার হল যে ওরা ঈসা আলাইহিস সালামের আর সব মুজিযাকে স্বীকার করলেও ওদের কোনো ধর্মগ্রন্থে আপনি একটা মুজিযার ব্যাপারে কিছু জানতে পারবেন না । কেউ কি আন্দাজ করতে পারছেন যে সেটা কোন মুজিযা?

ঈসা আলাইহিস সালাম যে মায়ের কোলেই কথা বলেছিলেন, সেটা । কেন, সেটা কারো মাথায় আসছে?

আমাদের কি মনে আছে যে ঈসা আলাইহিস সালাম কী বলেছিলেন?

পর্যন্ত না আপনি অবতীর্ণ করেন আমাদের প্রতি এক গ্রন্থ, যা আমরা পাঠ করব। বলুনঃ পবিত্র মহান আমার পালনকর্তা, একজন মানব, একজন রসূল বৈ আমি কে? (১৭ঃ৯০-৯২)

[3] Matt. 26:17–29; Mark 14:12–25; Luke 22:7–38; I Cor. 11:23–25

“আমি তো আল্লাহর দাস । তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন ।”[4]

এই কথা যদি ওরা ওদের ধর্মগ্রন্থে রাখে, তাহলে তো ওদের ধর্মের পুরো ভিত্তিমূলেই কুঠারাঘাত করা হবে যে! In fact, এটা ইহুদীদের ধর্মের ভিত্তিরও বিরুদ্ধে যায়। কেন সেটা আমরা পরে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ।

তবে ঈসা আলাইহিস সালামের মুযিজা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এই সম্পর্কিত কুরআনের একটা ভাষাগত মুযিজা নিয়ে কথা বলার লোভ সামলাতে পারলাম না। এর আগের একটা পর্বে আমরা দেখেছি আজকের jews রা তাদের পরিচয় দেয় মায়ের বংশ ধারা থেকে, মানে মা ইহুদী হলে সন্তানও ইহুদী হবে। কিন্তু আমরা জানি যে এটা ঐতিহাসিক ভাবে সত্য না। সবসময়ই তাঁদের পরিচয়ের ধারা ছিল বাবার দিক থেকে, বনী ইসরাইল, ইহুদী ইত্যাদি নামগুলোই এটার জ্বলন্ত প্রমাণ। এখন আমরা যদি কুরআনের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো যে মুসা আলাইহিস সালাম সবসময় বনী ইসরাইলয়দেরকে সম্বোধন করেছেন ইয়া ক্বওমী অর্থ্যাৎ O my people হিসেবে। কিন্তু কুরআনের কোথাও পাওয়া যাবে না যেখানে ঈসা আলাইহিস সালাম একই সম্বোধন করেছেন। ঊনি সবসময় ডেকেছেন ইয়া বনী ইসরাইল হিসেবে.....

---

[4] আমরা পরের একটা পর্বে বর্তমান বাইবেল কেন নির্ভরযোগ্য না সেটা ওদের দেয়া রেফারেন্স থেকে বোঝার চেষ্টা করবো। এখন শুধু আলোচনার খাতিরে বলছি যে ওদের বাইবেলের অসংখ্য ভার্সন আছে। অনেকগুলো গসপেলও (Gospels are a genre of Early Christian literature claiming to recount the life of Jesus, to preserve his teachings, or to reveal aspects of God's nature.) আছে। তার মাঝে চারটাকে ওরা canonical ভাবে, মানে ওদের কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত। এর বাইরে আরো আছে, যেমন জোসেফের গসপেল। সেখানে এই মুযিজার কথা আছে।

The following accounts we found in the book of Joseph the high-priest, He relates that Jesus spoke even when he was in the cradle and said to his mother:

3. Mary, I am Jesus the Son of God, that word which you brought forth according to the declaration of the angel Gabriel to you, and my Father has sent me for the salvation of the world

অর্থ্যাৎ এখানেও ওরা বিকৃতি সাধন করেছে।

কেন? এটা একটা কুরআনিক পদ্ধতি এটা প্রতিষ্ঠিত করার যে ঊনার কোনো বাবা ছিলো না। সেজন্যই তিনি ডাকতেন ইয়া বনী ইসরাইল। উদাহরণ দেখতে পারি সূরা সফের ৫ ও ৬ নং আয়াত থেকে।

আমার বুকটা ভরে যায় এসব ব্যাপারে জানলে। আপনার?

শিকড়ের সন্ধানে-৩৯

আমরা আগের পর্বগুলোতে দেখেছি যে কিভাবে মায়ের কোলে থাকা অবস্থা থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নানা মুযিজার মাধ্যমে নিজের নবুয়্যতের সত্যতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করলেও তৎকালীন ইহুদী স্কলাররা তা মেনে নেয় নি, কেন নেয় নি সেটাও আমরা এখন খুব ভালোভাবেই বুঝি। ঊনার ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা তাদের জন্য হুমকি হয়ে যাচ্ছিলো। এখন ওদের কিতাব অনুযায়ী 'মাসীহ'র এসে kingdom of david পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার কথা(এই বিষয়টি যেন আমরা মনে রাখি, পরে কাজে লাগবে ইনশাল্লাহ)। কিন্তু ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভূমিকাটা মূলত ছিল ধর্ম সংস্কারকের। ঊনি তৎকালীন ইহুদী স্কলারদের পথভ্রষ্টতার কঠোর সমালোচক ছিলেন। উপায়ন্তর না দেখে তাই তারা এই ব্যাপারটাকেই প্রধান ইস্যু হিসেবে প্রচার করতে লাগলো- যেহেতু ঊনি রাষ্ট্র ক্ষমতায় যাওয়ার কোনো চেষ্টা চালাচ্ছেন না, ঊনি kingdom of david পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবেন না,অতএব ঊনি ওদের কিতাবে উল্লেখিত মাসীহ না। ওদের line of thought টা ছিল এমন- ঊনাকে হত্যার চেষ্টা করা হোক। যদি ঊনাকে হত্যা করা যায় তাহলে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করা যাবে যে ঊনি মাসীহ না।

যেমন ভাবনা, তেমন কাজ। তৎকালীন ইহুদী রাব্বীরা রোমান শাসক (যারা তখন তাদের নিয়ন্ত্রণ করছিল), তাদের কাছে গিয়ে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে অভিযোগ করলো যে ঊনি রোমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উস্কে দিচ্ছেন। মূলত ওদের ষড়যন্ত্রেই রোমান সৈন্যরা ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যার উদ্যোগ নিয়েছিল।

আশা করি আমরা সবাই জানি যে আদতে ঊনাকে হত্যা করা সম্ভব হয় নি। আমাদের, তথা মুসলিমদের বিশ্বাস অনুসারে আল্লাহ ঊনাকে তুলে নিয়েছেন এবং কিয়ামতের আগে ঊনার আবারো ফিরে আসবেন দুনিয়াতে। আমরা কিভাবে জানি এটা?

অবশ্যই কুরআন থেকে, সূরা নিসাতে বনী ইসরাইলীয়দেরকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ্ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে-

..... কুফরীর কারণে স্বয়ং আল্লাহ তাদের অন্তরের উপর মোহর এঁটে দিয়েছেন। ফলে এরা ঈমান আনে না কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক। ***(155)***আর তাদের কুফরী এবং মরিয়মের প্রতি মহা অপবাদ আরোপ করার কারণে। ***(156)***আর তাদের একথা বলার কারণে যে, আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহর রসূল। অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছে, আর না

শুলীতে চড়িয়েছে, বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুতঃ তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধুমাত্র অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোন খবরই রাখে না। আর নিশ্চয়ই তাঁকে তারা হত্যা করেনি। *(157)* বরং তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা নিজের কাছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (সূরা নিসাঃ ১৫৫-১৫৭)

আর ঊনার 2nd coming এর ব্যাপারে আমরা জানতে পারি নিচের সহীহ হাদীস থেকে-

"By the One in Whose hand is my soul, definitely the son of Maryam will soon descend among you as a just judge, and he will break the cross, kill the pig, and abolish the *jizyah* (tribute), and wealth will be so abundant that no one will accept it, until a single prostration will be better than the world and everything in it" (Al-Bukhari).

আমরা সামনের পর্বগুলোতে ক্রিস্টানদের বিশ্বাসের মূল ভিত্তিগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ যেভাবে আমরা ঊনার জন্মের ঘটনার আদ্যপান্ত বিশ্লেষণ করেছি। কিন্তু তার আগে ইহুদী ধর্মটার ব্যাপারে একটা সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরতে চাই যেহেতু আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিকড়ের সন্ধানে গিয়ে বোঝার চেষ্টা করা যে কিভাবে আমরা ইহুদী, ক্রিস্টান এবং ইসলাম- এই তিনটা ধর্মে বিভক্ত হয়ে গেলাম।

রোমানদের মাধ্যমে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা প্রচেষ্টা আপাত দৃষ্টিতে সফল হবার পর ওরা নিশ্চিত হয়ে গেলো যে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসীহের ভণ্ড দাবীদার ছিলেন। (আস্তাগফিরুল্লাহ)। এই ঘটনার পরপরই ওদের জাতীয় জীবনে বিশাল দুর্যোগ নেমে আসে, যাকে কুরআন আখ্যায়িত করেছে দ্বিতীয় বিপর্যয় হিসেবে। মনে আছে সূরা বনী ইসরাঈলের সেই আয়াতের কথা? এখন আমরা সবগুলো আয়াত একসাথে দেখতে পারি-

আমি বনী ইসরাঈলকে কিতাবে পরিষ্কার বলে দিয়েছি যে, তোমরা পৃথিবীর বুকে দুবার অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং অত্যন্ত বড় ধরনের অবাধ্যতায় লিপ্ত হবে। *(4)* অতঃপর যখন প্রতিশ্রুতি সেই প্রথম সময়টি এল, তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করলাম আমার কঠোর যোদ্ধা বান্দাদেরকে। অতঃপর তারা প্রতিটি জনপদের আনাচে-কানাচে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। এ ওয়াদা পূর্ণ হওয়ারই ছিল। *(5)* অতঃপর আমি তোমাদের জন্যে তাদের বিরুদ্ধে পালা ঘুরিয়ে দিলাম, তোমাদেরকে ধন-

সম্পদ ও পুত্রসন্তান দ্বারা সাহায্য করলাম এবং তোমাদেরকে জনসংখ্যার দিক দিয়ে একটা বিরাট বাহিনীতে পরিণত করলাম। *(6)* তোমরা যদি ভাল কর, তবে নিজেদেরই ভাল করবে এবং যদি মন্দ কর তবে তাও নিজেদের জন্যেই। এরপর যখন দ্বিতীয় সে সময়টি এল, তখন অন্য বান্দাদেরকে প্রেরণ করলাম, যাতে তোমাদের মুখমন্ডল বিকৃত করে দেয়, আর মসজিদে ঢুকে পড়ে যেমন প্রথমবার ঢুকেছিল এবং যেখানেই জয়ী হয়, সেখানেই পুরোপুরি ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। *(7)*

আমরা আগের পর্বগুলোতে দেখেছি যে ১ম বিপর্যয় বলতে ব্যবিলনীয়দের দ্বারা জুডাহ রাজ্য ধ্বংস হওয়ার কথা বোঝনো হয়েছে,তারপরের আয়াতে পারসিয়ানদের সময়ে আবার ওদের সুসময় ফিরে আসার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর এখন জানছি যে ৭ নং আয়াতে ২য় আরেক বিপর্যয়ের কথা বলা হয়েছে। কী ছিল সেটা?

৬৬ ক্রিস্টাব্দে ইহুদীরা রোমান শাসকদের বিদ্রোহ করে। সেই বিদ্রোহ দমন করতে রোমান শাসক Titas জেরুজালেমে আসেন এবং একে মাটির সাথে মিশিয়ে দেন। কথিত আছে যে ঊনার আক্রমণের ধরণ এমন ছিল যে দুইটা ইট একসাথে ছিল না। তিনি ইহুদীদের নির্মিত 2nd temple ধ্বংস করে দেন। আর তারপর থেকে ১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত ইহুদীরা সারা দুনিয়াতে ছন্নছাড়া ভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে, যেখানেই গিয়েছে সেখানেই নির্যাতন, লাঞ্চনার স্বীকার হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সেখান থেকে বিতাড়িত হয়েছে।[5] কেন এমনটা হয়েছে সেটার কুরআনিক ব্যাখ্যা হচ্ছে ওরা আল্লাহর অভিশপ্ত জাতি-

যাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যাদের প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন, যাদের কতককে বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করে দিয়েছেন এবং যারা শয়তানের আরাধনা করেছে, তারাই মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্টতর এবং সত্যপথ থেকেও অনেক দূরে। *(5:60)*

আর ঘটনার ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা হচ্ছে ওরা যেখানেই যেত সেখানে গিয়েই সুদের কারবারে লিপ্ত হত। ওরা ওদের কিতাব বিকৃত করে *Gentile* তথা অইহুদীদের সাথে সুদের লেনদেন করাকে জায়েজ করে নিয়েছিলো, যেটার কথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। এখানে উল্লেখ করার মত

[5] এর একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলো মুসলিম শাসনামলে। আপনি যদি golden period of jews লিখে ইন্টারনেটে সার্চ দেন তাহলে আপনি jews literature খুঁজে পাবেন যেখানে ওরা মুসলিম স্পেনে ওদের সময়টাকে golden period হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। ইতিহাস সাক্ষী, জেরুজালেমে ইহুদী, ক্রিস্টান এবং মুসলিম- এই তিন ধর্মের মানুষই স্বাধীনভাবে, শান্তিপূর্ণ ভাবে এবং প্রকাশ্যে তাঁদের ধর্ম পালন করতে পেরেছে শুধুমাত্র এবং শুধুমাত্র মুসলিম শাসনামলে, ধর্মীয় সহিষ্ণুতার যে দৃষ্টান্ত ইসলাম পৃথিবীকে দেখিয়েছে, তা নিঃসন্দেহে বিরল এবং অদ্বিতীয়।

ব্যাপার হচ্ছে সুদ আজ যেভাবে সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে গ্রাস করেছে, এমনটা কখনোই ছিল না.....সুদের সাথে লেনদেন চার্চের দ্বারা নিষিদ্ধ ছিলো। কিন্তু ইহুদীরা যেহেতু চার্চের এই নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত ছিলো না, তাই প্রাথমিকভাবে ওরা উচ্চহারে সুদের কাজকারবার চালাতো ক্রিস্টানদের সাথে। কিন্তু শীঘ্রই সেই অঞ্চলে অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসতো, ফলে ওদেরকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়া হত।

ইহুদীরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে যীশু খৃষ্ট হিসেবে যিনি নিজেকে দাবী করেছিলেন (ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিনি প্রতিশ্রুত মাসীহ ছিলেন না, কারণ তাকে হত্যা করা সম্ভব হয়েছিলো। এদিকে ক্রিস্টানরা যদিও বিশ্বাস করে যে ঊনাকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছিল, তারা ঊনার 2nd coming এ বিশ্বাস করে।

শিকড়ের সন্ধানে-৪০

ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রতিশ্রুত মাসীহ হিসেবে অস্বীকারের পর ইহুদীরা অপেক্ষা করছিল একজন শেষ নবীর যার ভবিষ্যৎ বাণীর কথা ওদের ধর্ম গ্রন্থে ছিল। কথিত আছে যে তৎকালীন মদীনার ইহুদীরা মদীনায় এসে বসবাস শুরু করেছিলো এইজন্যই, এই জায়গায় নবী আসবে এটা জেনেই। মদীনাবাসীকে ওরা নিরক্ষর বা উম্মী বা Gentile হিসেবে খুবই হেলাফেলার চোখে দেখতো এবং সবসময়ই বলতো যে আমাদের নবী চলে আসলেন বলে।ওরা যখন কোনো যুদ্ধে হেরে যেতো, তখন বলতো আমাদের নবী আসুক, তোমাদেরকে হারিয়ে দিবো ইত্যাদি। ওদের খুতবার অন্যতম প্রধান টপিক ছিলো সেই নবীকে চিহ্নিত করার উপায় সমূহ। মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এইসব কথাবার্তাই মদীনাবাসীকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিশ্বাস করতে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু আদতে যখন ঊনি আসলেন, তখন ওদের প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

ওরা অবাক হয়ে উপলব্ধি করলো যে সবগুলো চিহ্ন মিলে যাচ্ছে, কিন্তু এই নবী বনী ইসরাইলের কেউ নন বরং এতদিন ওরা যাদেরকে উম্মী বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে এসেছে সেই আরবদের একজন! তাই যদি এখন এনার উপর ঈমান আনতে হয়, তাহলে এতদিনের Religious scholarship, hegemony ইত্যাদি যা ছিল ওদের গর্বের বস্তু তা সব বিসর্জন দিয়ে ওদেরকে নেমে আসতে হবে উম্মীদের কাতারে, মেনে নিতে হবে ওদের শ্রেষ্ঠত্ব, কারণ শেষ নবী এসেছেন ওদের মধ্য থেকেই!

এত বড় অপমান মেনে নেয়া ওদের পক্ষে খুবই কঠিন ছিল, তাই ওরা মানে তৎকালীন ইহুদী স্কলাররা সিদ্ধান্ত নিলো যে ওরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যে ওদের ধর্ম গ্রন্থে উল্লেখিত চিহ্ন মিলে যাচ্ছে এটা বেমালুম অস্বীকার করে যাবে। ওদের এই মানসিক অবস্থার কথা কুরআন উল্লেখ করছে এভাবে-

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, অন্যান্যরা যেভাবে ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবে ঈমান আন, তখন তারা বলে, আমরাও কি ঈমান আনব বোকাদেরই মত! মনে রেখো, প্রকৃতপক্ষে তারাই বোকা, কিন্তু তারা তা বোঝে না। (2:13)

এখানে ইহুদীদের কাছে ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটা অর্থ্যাৎ সবকিছু ছেড়ে ছুঁড়ে দেয়ার ব্যাপারটা বোকামী বলে মনে হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ বলছেন ওরাই ছিল বোকা। কেন? কারণটা আল্লাহ্ বলছেন অন্য আয়াতে-

আর তোমরা সে গ্রন্থের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, যা আমি অবতীর্ণ করেছি সত্যবক্তা হিসেবে তোমাদের কাছে। বস্তুতঃ তোমরা তার প্রাথমিক অস্বীকারকারী হয়ো না আর আমার আয়াতের অল্প মূল্য দিও না। এবং আমার (আযাব) থেকে বাঁচো (২:৪১)

এখানে স্বল্প মূল্যটা কী? এই যে দুনিয়ার নেতৃত্ব, বংশ গৌরব এগুলোকে আল্লাহ্ স্বল্প মূল্য হিসেবে অভিহিত করছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ওরা যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল, সেটা আমরা কিভাবে জানি? কুরআনের নিচের আয়াত থেকে-

আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে, যেমন করে চেনে নিজেদের পুত্রদেরকে। আর নিশ্চয়ই তাদের একটি সম্প্রদায় জেনে শুনে সত্যকে গোপন করে।(২ঃ১৪৬)

আরো একটা প্রত্যক্ষ বিবরণ পাওয়া যায় সাফিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার বর্ণিত হাদীস থেকে যিনি ছিলেন বিখ্যাত ইহুদী গোত্র বনু নাদিরের প্রধান হুয়াই এর মেয়ে, পরে ঊনার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিয়ে হয় এবং ঊনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ঊনার থেকে নিচের ঘটনাটা বর্ণিত আছে।

Saffiyah says, "I was my father's and my uncle's favorite child. When the Messenger of Allah came to Madinah and stayed at Quba, my parents went to him at night and when they looked disconcerted and worn out. I received them cheerfully but to my surprise no one of them turned to me. They were so grieved that they did not feel my presence. I heard my uncle, Abu Yasir, saying to my father, 'Is it really him?' He said, 'Yes, by Allah'. My uncle said: 'Can you recognize him and confirm this?' He said, 'Yes'. My uncle said, 'How do you feel towards him?' He said, 'By Allah I shall be his enemy as long as I live.'" (Ibn Hisham, As-Sirah an-Nabawiyyah, vol. 2, pp. 257-258)

এখন এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে এই বিরোধিতাটা মূলত এসেছিল ইহুদী স্কলারদের থেকে,সাধারণ ইহুদীরা তাদের অনুসরণ করেছিলো মাত্র। তারা তখন সম্পূর্ণ ভোল পাল্টে ফেললো

এবং ওদের কিতাবে উল্লেখিত নবুয়্যতের চিহ্নের ব্যাপারটা চেপে গিয়ে ঈমানের অন্যান্য শাখাগুলোকে হাইলাইট করতে লাগলো। ওরা মুসলিমদের বলতে চাইলো যে ওরাও আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, অতএব ওদের সাথে মুসলিমদের খুব বেশী পার্থক্য নেই। কিন্তু আল্লাহ্ কুরআনে দ্ব্যর্থহীণ ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছেন এহেন অসম্পূর্ণ বিশ্বাস আল্লাহর কাছে গ্রহণ যোগ্য নয়। আল্লাহ্ সূরা বাক্বারাতে বলছেন-

আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়। (2:8)

আমরা যদি এই আয়াতের আরবীটা খেয়াল করতাম তাহলে বুঝতাম যে এখানে Strongest form of negation ব্যবহার করা হয়েছে। মানে ওরা একেবারেই ঈমানদার নয়। কিন্তু কেন?

আমরা যদি একটু চিন্তা করি তাহলে বুঝবো যে ঈমানের ৬টা স্তম্ভ আসলে একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, একটাকে ছাড়া আরেকটা অসম্পূর্ণ। এই কন্টেক্সটে একটা উদাহরণ দেই- ইহুদীরা যখন ওদের chosen people এর কনসেপ্টটাকে বিকৃত করে একটা সাম্প্রদায়িক রূপ দিল, তখনই ওরা বংশ মর্যাদার অহমিকার বশবর্তী হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করলো। এই বোধই ওদের মনে এই বিশ্বাসের জন্ম দিল যে শুধু ইহুদী হলেই জান্নাতে যাওয়া যাবে। এভাবে ওরা প্রকারান্তরে আল্লাহকে সাম্প্রদায়িক হিসেবে তুলে ধরলো আর পরকালের ধারণাকেও বিকৃত করে ফেললো। তাহলে কেউ যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান না এনে আল্লাহ্ ও পরকালের উপর ঈমান আনে তাহলে সেটা কি আদোতে ঈমান আনা হবে?

এই বিষয়টাই আল্লাহ্ সুবহানুহু ওয়া তা'লা অসাধারণভাবে তুলে ধরেছেন সূরা বাক্বারার ৯ নং আয়াতে। সেখানে উনি বলেছেন-

তারা আল্লাহ এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করে। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না।

আমরা যদি একটু খেয়াল করি তাহলে বুঝবো যে ইহুদীরা কিন্তু আল্লাহকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করছিলো না, আল্লাহর রাসূল ও তখনকার মুসলিমদের ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু আল্লাহ্ এখানে নিজের কথা উল্লেখ করে বোঝাতে চেয়েছেন যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা আর ঊনাকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টার মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান না এনে যে ঈমানের দাবী ওরা করছে সেটা নিতান্তই অর্থহীণ, আল্লাহর কাছে এটার কোনো মূল্য নেই।

এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে সাধারণ ইহুদীরা এত মারপ্যাঁচ না বুঝে মুসলিমদের থেকে যখন শুনতো ইসলামের বিষয়াবলী, তখন তাদের অনেকেই বলে ফেলতো যে ওদের কিতাবে এসবের সত্যায়ন করা আছে। তখন কর্তৃপক্ষের কাছে ওদের ঝাড়ি খেতে হত, যেমনটা বলা আছে নিচের আয়াতে-

যখন তারা মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলেঃ আমরা মুসলমান হয়েছি। আর যখন পরস্পরের সাথে নিভৃতে অবস্থান করে, তখন বলে, পালনকর্তা তোমাদের জন্যে যা প্রকাশ করেছেন, তা কি তাদের কাছে বলে দিচ্ছ? তাহলে যে তারা এ নিয়ে পালকর্তার সামনে তোমাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। তোমরা কি তা উপলব্ধি কর না? তারা কি এতটুকুও জানে না যে, আল্লাহ সেসব বিষয়ও পরিজ্ঞাত যা তারা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে? (২:৭৬-৭৭)

ওদের এই মানসিকতাকে আল্লাহ্ নিরক্ষরতা হিসেবে অভিহিত করে পরের আয়াতে বলছেন-

তোমাদের কিছু লোক নিরক্ষর। তারা মিথ্যা আকাঙ্খা ছাড়া আল্লাহর গ্রন্থের কিছুই জানে না। তাদের কাছে কল্পনা ছাড়া কিছুই নেই।

তাদের এই কল্পনাটা কী? আল্লাহ্ এই প্যারাতেই সেটা উল্লেখ করছেন এবং সেটা যে ভিত্তিহীণ সেটাও বলে দিচ্ছেন-

তারা বলেঃ আগুন আমাদিগকে কখনও স্পর্শ করবে না; কিন্তু গণাগনতি কয়েকদিন। বলে দিনঃ তোমরা কি আল্লাহর কাছ থেকে কোন অঙ্গীকার পেয়েছ যে, আল্লাহ কখনও তার খেলাফ করবেন না-না তোমরা যা জান না, তা আল্লাহর সাথে জুড়ে দিচ্ছ।

এই শেষের আয়াতটা কি পরিচিত মনে হয়? আমরা মুসলিমরাও কি ভাবি না যে মুসলিম ঘরে জন্মেছি বলেই জান্নাত আমাদের জন্য নির্দিষ্ট? ওদের সাথে খুব বেশী পার্থক্য কি আছে আমাদের?

শিকড়ের সন্ধানে-৪১

আমরা আলোচনা করছিলাম কিভাবে ঈমানের স্তম্ভগুলো একটা আরেকটাকে ছাড়া অর্থহীণ। সূরা বাক্বারার তাফসীর শুনতে গিয়ে এ প্রসঙ্গে একটা অসাধারণ জিনিস জানলাম যেটা এখানে শেয়ার করার লোভ সামলাতে পারছি না। আমরা অনেকেই হয়তো জানি যে সূরা বাক্বারার মূল থিম হচ্ছে হার্ট তথা অন্তরের গতি প্রকৃতি ও সেটার স্বরূপ বিশ্লেষণ। এর শুরুতেই আল্লাহ্ সমগ্র মানব জাতিকে তিনটা ভাগে ভাগ করেছেন-মুত্তাক্বী, অবিশ্বাসী এবং মুনাফিক্ব, তারপর একে একে তাদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। (তাক্বওয়া, কুফর এবং নিফাক্ব এই সবগুলোর অবস্থানই ক্বলব বা হৃদয়) শুরুতেই আছে হচ্ছে মুত্তাক্বীদের বৈশিষ্ট্য সমূহ যেগুলো হচ্ছে-

যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং নামায প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি তাদেরকে যে রুযী দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে (3) এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে সেসব বিষয়ের উপর যা কিছু তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেসব বিষয়ের উপর যা তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। আর আখেরাতকে যারা নিশ্চিত বলে বিশ্বাস করে।

একটু খেয়াল করলে দেখবো যে এখানে শুরু হয়েছে বিশ্বাস দিয়ে, শেষও হয়েছে বিশ্বাস দিয়ে। মাঝখানে আমলের কথা বলে হয়েছে। এখন যে পয়েন্টটা কখনো আমার মাথায় আসেনি, সেটা হচ্ছে যে পূর্ববর্তীদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে-এটার সাথেই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাস (ইয়াক্বীন) আনার কথা বলা হল কেন, ঈমানের অন্য কোনো শাখা নয় কেন.....এটা বলতে গিয়ে উস্তাদ নুমান বললেন যে আমরা যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করি তাহলে দেখবো যে ইহুদী ও ক্রিস্টানরা যেটা করেছে সেটাকে বলা যায় effectively they corrupted the concept of hereafter। এই বিকৃতি সাধনটা কেমন? নিচের আয়াতে সেটা উল্লেখ করা হয়েছে-

ওরা বলে, ইহুদী অথবা খ্রীস্টান ব্যতীত কেউ জান্নাতে যাবে না। এটা ওদের মনের বাসনা। বলে দিন, তোমরা সত্যবাদী হলে, প্রমাণ উপস্থিত কর। (2:111)

এই যে একটা নির্দিষ্ট গোত্রেরই হলে কেবল জান্নাতে যাওয়া যাবে এটাই ছিলো ওদের বিকৃতির মর্মার্থ। আর সেটাকে খণ্ডন করে দিয়েই আল্লাহ্ জানাচ্ছেন যে জান্নাতে যাওয়ার জন্য ঈমান আনার সাথে সাথে সালাত ক্বায়েম করতে হবে, আল্লাহর দেয়া রিযিক্ব থেকে আল্লাহর পথেই ব্যয় করতে হবে ইত্যাদি। অর্থ্যাৎ আমল/চেষ্টা চরিত্র করতে হবে। আর সেজন্যই আল্লাহ্ সফলকামদের অভিহিত করেছেন মুফলিহুন হিসেবে যেটার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কৃষক। আমরা সবাই জানি যে ফসল ঘরে তোলার যে আনন্দ সেটা পেতে গিয়ে কৃষকদের কতটা কাঠ খড় পুরাতে হয়! আমাদেরকেও জান্নাতে যাওয়ার জন্য সেরকম চেষ্টা সাধনা করতে হবে।

আর এই আয়াতে পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে যে একজন মানুষ কোন পরিবারে জন্ম গ্রহণ করলো সেটা কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। আমরা জানি যে ইব্রাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাবা মূর্তিপূজক ছিলেন আর নুহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে জন্ম নিয়েছিল কাফির সন্তান। এই বিষয়টা নিয়ে আমি ৩১ নং আয়াতে বিস্তারিত আলোচনা করেছি, তারপরও ৬২ নং আয়াতটা আবার উল্লেখ করতে ইচ্ছা করছে-

নিঃসন্দেহে যারা মুসলমান হয়েছে এবং যারা ইহুদী, নাসারা ও সাবেঈন, (তাদের মধ্য থেকে) যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তা'আলার প্রতি, কিয়ামত দিবসের প্রতি এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে তার সওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে ।(২:৬২)

আমি যখন IOU তে উসূল আত তাফসীরের কোর্স করেছি তখন বইয়ের ভূমিকাতে এই আয়াতটার কথা ছিলো। সেখানে বলা হয়েছিলো যে কিভাবে কুরআনের তাফসীরের মূলনীতি না জানলে কুরআনকে ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করা যায়। আমরা আগের পর্বে বলেছি যে কিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান না আনলে আল্লাহ্ ও পরকালের উপর ঈমান আনা অর্থহীণ হয়ে যায়। সূরা বাক্বারার শুরুর দিকের আয়াতগুলো ও ৪০ আয়াত থেকে যখন বনী ইসরাইলদের সরাসরি সম্বোধন করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনার কথা বলা হল, তারই ধারাবাহিকতায় এই আয়াত এসেছে। এখন কেউ যদি এইসব কিছু অগ্রাহ্য করে স্রেফ এই আয়াতটা তুলে ধরে বলে যে ইহুদী, ক্রিস্টান, সাবিয়ানরা সবাই জান্নাতে যাবে, তাহলে তাকে আমরা desirer worshipper ছাড়া আর কী বলতে পারি! এই আয়াতটাকে বুঝতে

হবে ৮ নং আয়াতের প্রেক্ষিতে যেখানে আল্লাহ্ দ্ব্যর্থহীণ ভাষায় বলে দিচ্ছেন যে অসম্পূর্ণ ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। আর এটাই তাফসীর শাস্ত্রের প্রথম মূলনীতি- কুরআনের এক অংশ আরেক অংশকে ব্যাখ্যা করে। এখন আমরা যদি তা না বুঝে খণ্ড খণ্ড ভাবে যে কোনো আয়াত বিবেচনা করি, তাহলে কুরআন থেকে আপনি সব মতের ব্যাখ্যা পাবেন। যেমন এই আয়াত থেকে পশ্চিমা দেশে বসবাসকারী apologetic মুসলিমরা প্রমাণ দাখিল করতে চেয়েছে যে ইহুদী এবং ক্রিস্টান হলেও কোনো সমস্যা নেই, কুরআন বলছে জান্নাতে যাওয়া যাবে!

এসব কথা বলার কারণ হচ্ছে এটা বোঝানো যে এইসব ইতিহাস/ কন্টেক্সট জানা থাকলে কুরআন বোঝাটা অনেক সহজ হয়ে যায়। এই আলোচনার ইতি টানবো আমরা ক্বিবলা পরিবর্তন সংক্রান্ত আয়াতটা নিয়ে আলোচনা করে। আমরা জানি যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিশনের শুরু থেকে ২য় হিজরি পর্যন্ত তিনি বায়তুল মাক্বদিসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছেন। যখন মক্কায় ছিলেন তখন কাবা আর বায়তুল মাক্বদিসের দিক একই ছিলো। কিন্তু যখন মদীনাতে আসলেন তখন বায়তুল মাক্বদিসের দিকে মুখ করলে কাবার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াতে হত। এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালো লাগতো না। উনি মুখ ফুটে কিছু বলেন নি, কিন্তু মাঝেই মাঝেই আকাশের দিকে তাকাতেন, যেন আশা করতেন কোনো নির্দেশনা আসবে। সেটার কথা উল্লেখ করে আল্লাহ্ কুরআনে বলছেন যে-

নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি আপনাকে সে কেবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব যাকে আপনি পছন্দ করেন। এখন আপনি মসজিদুল-হারামের দিকে মুখ করুন এবং তোমরা যেখানেই থাক, সেদিকে মুখ কর। যারা আহলে-কিতাব, তারা অবশ্যই জানে যে, এটাই ঠিক পালনকর্তার পক্ষ থেকে। আল্লাহ বেখবর নন, সে সমস্ত কর্ম সম্পর্কে যা তারা করে। (২ঃ ১৪৪)

কী অসাধারণ একটা আয়াত না? আল্লাহ্ আমাদেরকে এমন এক নবীর উম্মাত করেছেন যে নবীর মনের আকাঙ্খার, অস্ফুট বাসনাকে মর্যাদা রাখতে গিয়ে আল্লাহ্ বদলে দিয়েছেন কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আসবে তাদের সালাত আদায়ে দিক!

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ইহুদীরা এটাকে কিভাবে নিয়েছিলো? সেটাও কুরআন আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে-

এখন নির্বোধেরা বলবে, কিসে মুসলমানদের ফিরিয়ে দিল তাদের ঐ কেবলা থেকে, যার উপর তারা ছিল? আপনি বলুনঃ পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে চালান। *(142)*

একটু খেয়াল করলে দেখবো যে আরবীতে এখানে সেই একই শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে-সুফাহা যার অর্থ বোকা যেটা ওরা মুসলিমদের উদ্দেশ্য করে বলতো ১৩ নং আয়াতে। এখানে আল্লাহই ওদেরকে নির্বোধ হিসেবে আখ্যায়িত করছেন। কিন্তু কেন?

আমি এতবার এই আয়াতটা পড়েছি, এটা নিয়ে কখনও চিন্তা করি নি যেটা এই লেকচারটা [6]শুনতে গিয়ে মাথায় এলো.....

[6] https://www.youtube.com/watch?v=TnMMwhfhtVk

শিকড়ের সন্ধানে-৪২

ক্বিবলা পরিবর্তনের ঘটনায় ইহুদীদের মধ্যে চাঞ্চল্য পড়ে গিয়েছিলো। ওরা প্রচার করতে থাকলো যে মুসলিমরা কোন দিকে সালাত আদায় করে তার কোনো consistency নেই। এখন যদি এই ক্বিবলাতে পড়ে তাহলে এতদিন ধরে পড়া নামাযের কী হবে ইত্যাদি। আল্লাহ্ আগের পর্বে উল্লেখিত আয়াতে এর উত্তর দিয়েছেন যে দিক কোনো ব্যাপার না, কার ইবাদাত করা হল এটাই মূখ্য। এর পরের আয়াতে উনি জানাচ্ছেন যে ক্বিবলার পরিবর্তনটা symbolic ছিলো মাত্র-

আপনি যে কেবলার উপর ছিলেন, তাকে আমি এজন্যই কেবলা করেছিলাম, যাতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, কে রসূলের অনুসারী থাকে আর কে পিঠটান দেয়। নিশ্চিতই এটা কঠোরতর বিষয়, কিন্তু তাদের জন্যে নয়, যাদেরকে আল্লাহ পথপ্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদের ঈমান নষ্ট করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ, মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, করুনাময়। (143)

একটু খেয়াল করলে দেখবো যে আল্লাহ্ এখানে ঈমানকে সালাতের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ব্যাপারটা খুবই ভয়ের যদি আমরা এখনো সালাতের গুরুত্ব না বুঝে থাকি।

যাই হোক এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ইহুদীরা যদি আসলেই মুসলিমদেরকে নির্বোধ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়্যতের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান থাকে, তাহলে মুসলিমরা কোন দিকে মুখ করে সালাত আদায় করলো তাতে ওদের কী এসে যায়?

আসল কথা হচ্ছে যে ইহুদীরা এই ঘটনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ঠিকই বুঝতে পেরেছিল। ওরা টের পাচ্ছিল যে এর মাধ্যমে ওদের সাথে শেষ নবীর উম্মাতের আচার অনুষ্ঠান ও প্রথা সমূহ আলাদা করে ফেলা হচ্ছে, তারা উভয়ে যে স্বতন্ত্র জাতি সেটা আস্তে আস্তে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। এই ব্যাপারটাই তারা মেনে নিতে পারছিলো না কারণ মুখে যাই বলুক ওরা মনে মনে ঠিকই জানতো যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই ওদের কিতাব সত্যায়নকারী নবী। তাই ওরা খুব করে চাচ্ছিল যে মিলের পরিমাণটা যেন বেশী থাকে। ক্বিবলা পরিবর্তন নিয়ে ওদের এত কন্সার্ণ প্রকারান্তরে ওদের ভেতরের উৎকণ্ঠারই বহিঃপ্রকাশ। আর এভাবে যে প্রকাশ করে ফেলছে, সেজন্যই আল্লাহ্ ওদেরকে সুফাহা তথা নির্বোধ হিসেবে আখ্যায়িত করছেন।

এতক্ষণ ধরে আমরা যেসব আয়াত পড়লাম তার আশে পাশের আয়াতগুলো বিশেষ করে সূরা বাক্বারার আয়াতগুলো যদি আমরা পড়ি তাহলে একটা প্রশ্ন মনে আসতে পারে যে আল্লাহ্ এসব আয়াতে মদীনার ইহুদীদের ইয়া বনী ইসরাইল বলে এমনে সরাসরি সম্বোধন কেন করতেসেন আর আগের প্রজন্মদের করা পাপের দায়ভার কেন ওদের উপর চাপাচ্ছেন। এটার উত্তরটা আমার খুব ভালো লেগেছে, তাই এখানে উল্লেখ করছি। আল্লাহ্ এমনটা করছেন কারণ তৎকালীন মদীনার ইহুদীরা এমনভাবে মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও পরবর্তী নবীদের কথা বলতো যেন আল্লাহ্ যা কিছু রহমত ওদের উপর বর্ষণ করেছেন সেটা সরাসরি ওদের উপরেই ছিল। ওরা এগুলো বলে বেড়াতো এবং অনেক গৌরব করতো। তাই আল্লাহ্ অনুরূপ কৌশল অবলম্বন করে এমনভাবে কথা বলছেন যে ওই সময়ে করা অপরাধগুলোও ওরাই করেছে। ওদের এই অন্ধকার দিকগুলো ওরা কখনোই বলতো না, কেউ জানতোও না, কুরআন এসে বলা যায় হাটে হাড়ি ভেঙ্গে দিয়েছিলো।

কেউ কি আন্দাজ করতে পারবেন যে আমাদের এখান থেকে profound lesson আছে নেয়ার মত। সেটা কী?

আমরা মুসলিমরা যখন আমাদের অতীত নিয়ে কথা বলি, তখনও শুধু সোনালী অতীত নিয়ে গর্ব করি। কিন্তু আমাদেরও যথেষ্ট নেতিবাচক দিক আছে। সেগুলো লুকিয়ে না রেখে আমাদের উচিৎ সেখান থেকে শিক্ষা নেয়া। তা না করলে আমরা ইহুদীদের মতই Self-proclaimed righteous গ্রুপে পরিণত হব।

এখন ইহুদীবাদ নিয়ে আমরা আমাদের আলোচনার সারমর্মে যাবো.....

- **ইহুদীদের সাথে ক্রিস্টানদের পার্থক্য তাহলে কী?**

ওরা ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের অস্তিত্বই স্বীকার করে না। মানে তাঁকে আল্লাহর নবী মানে না , মাসীহ হিসেবেও স্বীকার করে না। ওরা ওনাকে মাসীহের একজন ভণ্ড দাবীদার ভাবে। মারিয়ামকে ওরা ব্যাভিচারিণী ভাবে, আজো! আর সেজন্যই আমরা যদি ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে দেখবো যে ইহুদী এবং ক্রিস্টানদের সবসময় দা কুড়াল সম্পর্ক ছিল। এটা আমাদের জন্য খুবই বিস্ময়কর হলেও এটা একটা ঐতিহাসিক ফ্যাক্ট। ক্রিস্টানরা ইহুদীদেরকে যীশু ক্রিস্টের হন্তাকারক মনে করে। তাই ক্রিস্টানরা যখন ক্ষমতায় ছিলো তখন ওদেরকে তীব্র হেনস্থার শিকার

হতে হয়েছে। জেরুজালেম যখন ক্রিস্টানদের অধিকারে ছিলো তখন ওরা Temple Solomon এর জায়গাটা ডাস্টবিন বানিয়ে ফেলেছিল ওদের প্রতি ক্রিস্টানদের মানসিকতা তুলে ধরার জন্য।

কেউ বলতে পারেন যে এই অবস্থার পরিবর্তন কখন হয়েছিল?

হুম, উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক জেরুজালেম অধিকৃত হওয়ার পর। পুতি দুর্গন্ধময় ওই জায়গাটা উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ হাতে পরিস্কার করা শুরু করেছিলেন। বিস্ময়কর মনে হয়?

না, মুসলিমদের সহিষ্ণুতা এমনই ছিল। এখন আমরা যেমন কুফফার কাফির করে গলা ফাটাই, আল্লাহর রাসূল ও তাঁর সাহাবীদের জেনারেল অ্যাপ্রোচ এটা ছিলো না। আর যেসময়ে ইহুদীরা ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভণ্ড মাসীহ বলছে আর খ্রিস্টানরা তাঁকে আল্লাহর পুত্র বানিয়ে ফেলছে, সেই সময়ে কুরআন আসলো ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 'উপযুক্ত সম্মান দিতে'। তাঁর প্রকৃত পরিচয়-নবী হিসেবে ঊনার সম্মান পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করলো যা ছিল এই দুই চরমপন্থার মধ্যবর্তী।

ঠিক একইভাবে ইহুদীরা যখন মারইয়ামকে ব্যাভিচারিণী বলছে আর ক্রিস্টানরা ঊনাকে পূজনীয় বানিয়ে ফেলছে, তখন কুরআন ঊনাকে আখ্যায়িত করলো 'ক্বনিতিনা' হিসেবে এবং উপস্থাপন করলো আমাদের জন্য রোল মডেল হিসেবে। এটার মানে কী? যে কিনা আল্লাহর আনুগত্য করতে খুবই আগ্রহী, কোনরকম ধরাবাঁধা ছাড়াই। তাহলে তিনি নারীদের জন্য রোল মডেল কারণ ঊনি একজন নারী ছিলেন?

না, এখানে যে শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে সেটা পুরুষবাচক শব্দ। আরবী গ্রামার অনুযায়ী অডিয়েন্স পুরুষ ও নারী উভয়েই হয়, তখন পুরুষবাচক শব্দ ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ ঊনি আমাদের সবার জন্য রোল মডেল, নারী পুরুষ নির্বিশেষে, কিন্তু অবশ্যই পূজনীয় নয়।

এ প্রসঙ্গে কুরআনের নিচের আয়াতটি প্রাসঙ্গিকঃ

এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমন্ডলীর জন্যে এবং যাতে রসূল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্য। (2:143)

আমরা আগে কয়েকবার বলেছি যে কেন ওরা ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাসীহ হিসেবে মেনে নেয় নি। সেটা কি মনে আছে কারো?

শিকড়ের সন্ধানে-৪৩

কথা হচ্ছিল ইহুদীদের ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাসীহ হিসেবে মেনে না নেয়ার কারণ। আমরা আগে বলেছি, এখন আবার বলছি, কারণটা হচ্ছে-

ওদের ধর্ম গ্রন্থ অনুসারে মাসীহের যেসব কাজ করার কথা ছিলো, ঊনি সেটা করার আগেই মৃত্যুবরণ করেছেন। অর্থ্যাৎ ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন সেটা ওরা বিশ্বাস করে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই কাজগুলো কী যা মাসীহের করার কথা ছিল কিন্তু ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেন নি?কারো কি মনে আছে আগের পর্ব থেকে?

উত্তরটা হচ্ছে-God's Kingdom পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। এখন ইসলাম কি আমাদের এই ধাঁধার উত্তর দেয়?

অবশ্যই !ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কাজ করবেন ঊনার দ্বিতীয়বার আগমনের পর !ঊনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যান নি এটা বিশ্বাস করা আমাদের ঈমানের দাবী। তবে ঊনি আসবেন হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাত হিসেবে,কারণ ঊনি ইমাম মাহদীর পিছনে সালাত আদায় করবেন।

ইহুদীদের সাথে ইসলামের মিল/ অমিলঃ

আমরা গত কয়েক পর্ব ধরে অমিলের ব্যাপারটা তুলে ধরেছি। সেটাকে যদি সামারি করা হয়, তাহলে এক কথায় আমরা কী বলতে পারি? ওরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মেনে নেয় নি ওদের বংশ অহমিকার কারণে। ওদের সবচেয়ে বড় অপরাধ বোধ করি এটাই যে ওরা ইহুদীবাদকে একটা গোত্রীয় পরিচয় বানিয়ে ফেলেছে (ইহুদী নামটা থেকেই এটা বোঝা যাচ্ছে!) chosen people এর কনসেপ্টটাকে বিকৃত করে। আমরা আগে বিস্তারিত বলেছি যে আল্লাহ সুবহানুহু ওয়া তা'লা ওদেরকে বাছাই করেছিলেন তাওহীদের বাণী প্রচার করার জন্য। They were chosen as flag bearers of Oneness of Allah. কিন্তু সেই দায়িত্ব থেকে একেবারেই সরে গিয়েছে তারা। এজন্য আপনি দেখবেন যে ইহুদীরা একেবারেই প্রচার বিমুখ, ওরা কখনোই ওদের ধর্ম প্রচার করে না।

ওদের এই তীব্র জাতীয়তাবাদী মানসিকতা ওদেরকে এমন কিছু বিকৃতি সাধনে উদ্বুদ্ধ করেছে যা এক কথায় ন্যাক্কারজনক। যেমন ওদের দাবী হচ্ছে যে ইসমাইল আলাইহি ওয়াসাল্লাম নয়, ইসহাক্ব আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইব্রাহীম আলাইহিওয়াসাল্লাম আল্লাহর নির্দেশে কুরবানী করতে ধরেছিলেন। ওদের গ্রন্থ অনুসারে.....

Then God said, "Take your son, your only son, whom you love--Isaac--and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you." (Genesis 22:2)

একটু খেয়াল করলে আমরা দেখবো যে এখানে ইসহাক্ব আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, আবার এটাও বলা হয়েছে যে তোমার একমাত্র ছেলে। এখন Biblical scholar রা নিজেরাও স্বীকার করেন যে ইসমাইল আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম ইসহাক্ব আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগে। তাহলে ইসহাক্ব আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাত্র ছেলে হলেন কিভাবে? ওদের নিজেদের গ্রন্থের মাঝেই কি contradiction নেই?

এবার আসুন দেখি কুরআন এটা নিয়ে কী বলে----

সুতরাং আমি তাকে এক সহনশীল পুত্রের সুসংবাদ দান করলাম। (101)অতঃপর সে যখন পিতার সাথে চলাফেরা করার বয়সে উপনীত হল, তখন ইব্রাহীম তাকে বললঃ বৎস! আমি স্বপ্নে দেখিযে, তোমাকে যবেহ করছি; এখন তোমার অভিমত কি দেখ। সে বললঃ পিতাঃ! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে, তাই করুন। আল্লাহ চাহে তো আপনি আমাকে সবরকারী পাবেন। (৩৭:১০০-০২)

দেখেন এখানেও কিন্তু ইসমাইল আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম সরাসরি উল্লেখ করা হয় নি। কিন্তু এখন আমরা জানি যে কুরআনের এক অংশ আরেক অংশের ব্যাখ্যা করে। তাহলে দেখা যাক কুরআন ইসহাক্ব আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে কী বলে!

তাঁর স্ত্রীও নিকটেই দাড়িয়েছিল, সে হেসে ফেলল। অতঃপর আমি তাকে ইসহাকের জন্মের সুখবর দিলাম এবং ইসহাকের পরের ইয়াকুবেরও (১১:৭১)

অর্থ্যাৎ ইসহাক্ব আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের সুসংবাদ যখন দেয়া হয়েছিল, তখনই বলা হয়েছিল যে ঊনার আবার সন্তান হবে যার নাম হবে ইয়াকূব আলাইহিওয়াসাল্লাম। যার ভবিষ্যৎ বংশধরের কথাও উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে, এটা কি সম্ভব যে আল্লাহ্ তাঁকে কুরবানীর আদেশ দিবেন?

এভাবে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে কুরআন আমাদের জানাচ্ছে যে ইসমাইল আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরবানীর আদেশ দেয়া হয়েছিল।

তাহলে শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো? ওরা গত ২ হাজার বছর ধরে প্রতিশ্রুত মাসীহের অপেক্ষা করে চলেছে যে কী না হবে ওদের বংশের এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবে God's kingdom. আজকের যে ইসরাইল রাষ্ট্র, সেটার তাত্ত্বিক ভিত্তি হচ্ছে ওরা মাসীহের জন্য অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত তাই পবিত্র ভূমিতে ফিরে যাওয়ার মাধ্যমে মাসীহের কাজ আগায় দিচ্ছে, ঊনার আগমনকে ত্বরান্বিত করছে। ওখান থেকে gentile দের সরিয়ে ইহুদী বসতি গড়ে তোলাকে ওরা মাসীহের মিশনের অংশ ভাবছে এবং পুণ্যের কাজ মনে করছে। আমার প্ল্যান আছে ইনশাল্লাহ ইসরাইল রাষ্ট্রটার প্রতিষ্ঠার ইতিহাস নিয়ে একটা সিরিজ নোট লেখার (কবে, কখন সম্ভব হবে জানিনা), সেখানে এই বিষয়টা আমরা বিস্তারিত তুলে ধরবো যে Zionism and Judaism যে এক না, বরং বহু orthodox jews আছে যারা ইসরাইল রাষ্ট্রটার ঘোর বিরোধী।

এই zion রাই দাজ্জাল যখন আসবে তখন তাকে মাসীহ হিসেবে ভুল করবে এবং ঊনার অনুসারী হবে। এটা নিয়ে বিস্তারিত একটা হাদীস আছে যেখানে বলা হয়েছে যে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে দাজ্জালের যুদ্ধে অনেক মিরাক্যল ঘটবে, তাঁর মাঝে একটা হচ্ছে গাছ এবং পাথর কথা বলবে। যদি কোনো গাছের পিছনেও দাজ্জালের অনুসারী লুকিয়ে থাকে গাছ কথা বলে উঠে তাঁকে চিহ্নিত করে দিবে।

এখন লক্ষণীয় এই হাদীসটাতে random সব ইহুদীদের কথা বলা হয় নাই, দাজ্জালের অনুসারীদের কথা বলা হয়েছে। এটা খেয়াল করাটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই হাদীসটাকে পুঁজি করেই ইহুদীরা ইসলামকে ইহুদী বিদ্বেষী, অ্যান্টি সেমিটিক ধর্ম হিসেবে প্রোপাগাণ্ডা চালায়। এটা নিয়ে একটা সুন্দর আর্টিকেল হচ্ছে -https://yaqeeninstitute.org/en/nazir-khan/the-myth-of-an-antisemitic-genocide-in-muslim-scripture/

এই লেখাটা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে যদি আমরা ওদের সাথে আমাদের মিলের কথাগুলো না বলি। ওরা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করে, original sin এর ধারণাতে বিশ্বাস করে না, ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর পুত্র (নাঊযুবিল্লাহ) মনে করে না ,আল্লাহ্ ও বান্দার মাঝে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান, কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। ওদেরও ব্যক্তিজীবন আর ধর্মীয় জীবন আলাদা নয়। তাদের ধর্মেও নামায, রোযার অস্তিত্ব রয়েছে। পাঁচবেলা নয়, দুই বেলা নামায আদায় করে,orthodox jew রা মেয়েদের পর্দার বিধান আছে, ছেলে মেয়ের অবাধ মেলামেশার উপর

নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এবং কশের মাংস খেতে হয় (আমাদের যাবীহা হালালের মত)।ওরাও পরকালের হিসাব নিকাশে বিশ্বাস করে। আজকের বিশ্বের ধর্ম সমূহের মাঝে ইহুদীদের সাথেই মুসলিমদের ধর্মীয় আচার ব্যবহারের মাঝে সবচেয়ে বেশী মিল পাওয়া যাবে।

আমাদের ইহুদীবাদ নিয়ে কথকতার এখানেই পরিসমাপ্তি, আগামী পর্ব থেকে আমরা ক্রিস্টান ধর্মের ব্যবচ্ছেদ করে শিকড়ের সন্ধান করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ।

শিকড়ের সন্ধানে-৪৪

ইহুদীবাদ নিয়ে কথা বলতে হলে অবধারিতভাবে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম এবং তাকে অস্বীকার করার কথা বলতে হত। এখন আমাদের কাছে নিশ্চয়ই এটা পরিষ্কার যে কিভাবে আমরা ইহুদী ও ক্রিস্টান এ দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেলাম। এখন থেকে সামনের পর্বগুলোতে আমরা ক্রিস্টানিটির সাথে আমাদের মিল/অমিলগুলোর স্বরূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা চালাবো ইনশাল্লাহ। আমরা ওদের বিশ্বাসের মূল স্তম্ভ গুলো নিয়ে ক্রমান্বয়ে পর্যালোচনা করবো। এর মাঝে রয়েছে

- Concept of trinity
- Jesus being god
- Jesus being Son of god
- Jesus died on the cross to atone for the sins of humanity
- The concept of original sin

তবে এসব টপিক নিয়ে কথা বলার আগে আমাদের বাইবেল সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা থাকতে হবে। বাইবেল ওল্ড টেস্টামেন্ট আর নিউ টেস্টামেন্ট নিয়ে গঠিত। ওল্ড টেস্টামেন্টের ব্যাপারে আমরা আগে বলেছি। নিউ টেস্টামেন্ট গঠিত হচ্ছে ৪টা গসপেলের সমন্বয়ে যেগুলো ওদের কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত বা canonical। এগুলো হচ্ছে Mathew,Mark,John,Luke। ওদের দাবী হচ্ছে যে এরা সবাই ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিষ্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু Dr Bilal Philips ঊনার The true message of jesus chirst বইতে দেখিয়েছেন যে এদের কারো পরিচয়ই নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। [7], গসপেলের লেখক আর এই নামের ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিষ্যরা একই ব্যক্তি নন, তারা ওইসব নাম ব্যবহার করেছে বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য। প্রাথমিকভাবে এইসব গসপেল প্রচারিত হয়েছিল নামবিহীণভাবে। আর এই নামগুলো যুক্ত করা হয়েছিলো ২য় শতাব্দীতে ☹। কারা করেছিলো, সেটাও জানা যায় না।[8]

[7] ঊনি রেফারেন্স দিয়েছেন The new Encyclopaedia Britannica,vol.14, p.824-27

[8] Graham Stanton tells us, "The gospels, unlike most Graeco-Roman writings, are anonymous. The familiar headings which give the name of an author ('The Gospel according to . . .') were not part

অর্থ্যাৎ দেখা যাচ্ছে যে আমরা মুসলিমরা যেটা বিশ্বাস করি যে আজকের বাইবেল আর ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হওয়া ইঞ্জিল এক নয়, সেটার বিকৃত রূপ, এটা ওরাই স্বীকার করে। এই নামগুলো দিয়েই ওরা বুঝাচ্ছে যে গসপেলগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানুষের দ্বারা রচিত হয়েছে, কোনো ঐশী বাণী নয়।[9] এখন ওদের গসপেলগুলার Scholarly criticism করলে বহু অসামঞ্জস্য ধরা পড়ে। যে কোনো একটা ঘটনার বিবরণ কখনোই সবগুলো গসপেলে একইভাবে পাওয়া যায় না। ডঃ বিলাল ফিলিপ্স ঊনার বইটাতে এরকম অনেকগুলো উদাহরণ দেখিয়েছেন।[10] প্রশ্ন উঠতে পারে যে আমাদের হাদীস গ্রন্থেও তো একই ঘটনার বিভিন্ন বর্ণনা আছে। তবু তো আমরা সেগুলোকে আল্লাহর পরোক্ষ ওহী হিসেবে গ্রহণ করি। কথাটা পূর্ণ মাত্রায় সত্যি, কিন্তু আমাদের যদি হাদীস শাস্ত্র সম্পর্কে প্রাথমিক লেভেলের জ্ঞান থাকে তাহলে আমরা জানবো যে হাদীসের সনদ পদ্ধতিটি অত্যন্ত শক্তিশালী যা নির্ধারণ করে যে কোন বর্ণনাটার চেইন সূত্রটি একদম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের ওখানে গিয়ে শেষ হয়েছে।[11] এভাবেই সহীহ, হাসান, দুর্বল, জাল ইত্যাদি হাদীসের মাঝে পার্থক্য করা হয়। আর সবচাইতে বড় কথা যে আমাদের কুরআনের ক্ষেত্রে এমনটা নেই।

যারা কুরআনের সত্যতা/ গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আক্রমণ করতে চায়, আমাদের মাঝে নানা সন্দেহ ঢুকাতে চায়, তাদের সব চেষ্টায় পানি ঢেলে দিতে পারে কুরআনের এই সাদৃশ্য। আজকে আমেরিকার প্রত্যন্ত কোনো অঞ্চলের একটা কিশোর যার কী না কুরআনের কিছু অংশ মুখস্থ আছে তার যদি চায়নার কোনো ছেলের সাথে প্রথমবারের মত দেখা হয় আর তারা একসাথে সালাতে দাঁড়ায় তারা হুবহু একই সূরা ফাতিহা এবং কুরআনের অন্য অংশ

---

of the original manuscripts, for they were added only early in the second century."Stanton, Graham N. p. 19. 8

10 The Interpreter's Dictionary of the Bible states, "It is safe to say that there is not one sentence in the NT in which the MS [manuscript] tradition is wholly uniform."[3] Add to that Bart D. Ehrman's now famous words, "Possibly it is easiest to put the matter in comparative terms: there are more differences in our manuscripts than there are words in the New Testament." [The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings. p. 12.]

11 11 হাদীসের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে গিয়ে মুসলিম উম্মাহ ৫০ হাজারেরও বেশী মানুষের জীবনী সংকলন করেছেন যা এককথায় অবিশ্বাস্য।

পড়বে। আল্লাহর নিজস্ব ওয়াদা হচ্ছে যে তিনি কুরআন সংরক্ষণ করবেন। ঠিক একইভাবে আজ যদি দুনিয়াতে যত কুরআন আছে সব একসাথে পুড়িয়ে দেয়া হয় আর ইন্টারনেট বা সব ধরণের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়, তবু সমগ্র কুরআন reproduce করতে মুসলিমদের অতি সামান্য কয়েকদিন লাগবে। তার কারণ- কুরআন শুধু লিখিতভাবেই সংরক্ষিত না, মৌখিকভাবেও, অর্থ্যাৎ মুখস্থ আকারেও।

কিন্তু এই একই কাজটা যদি বাইবেলের সাথে করা হয়, তবে তা পুনরুদ্ধার করা এক কথায় অসম্ভব।

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন যে তিনি কুরআন মনে রাখা সহজ করে দিয়েছেন। এটার একটা জলজ্যান্ত প্রমাণ হচ্ছে যে বাইবেলের আকার কুরআনের এক পঞ্চমাংশ হলেও আপনি কোনো ক্রিস্টান পাদ্রী বা পোপকে পাবেন না যাদের এটা পুরাটা মুখস্থ (যে কোনো একটা ভার্সন)। ওরা চার্চে সবসময় দেখে দেখে পড়ে। আর মুসলিমদের এই চরম দুরবস্থার যুগেও কুরআনে হাফিজের সংখ্যা যে অসংখ্য, তা কে না জানে!

কুরআনের আরো একটা দারুণ ব্যাপার হল এটা হৃদয়ের অবস্থা নিয়ে কথা বলে। এতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিজীবনের কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। কিন্তু ওল্ড টেস্টামেন্টে মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর কাহিনীও আছে যেটা থেকে সুস্পষ্ট বোঝা যায় ওখানকার সব কিছু মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর কাছ থেকে যা ওহী পেয়েছেন তা নয়, মানুষের লেখা আছে।[12]

যাই হোক, এই বিষয়টি ছাড়াও আরো যেটা বাইবেলের গ্রহণযোগ্যতা কমিয়ে দেয় সেটা হল এটার মূল পাণ্ডুলিপির ভাষা। আমরা মনে হয় জানি যে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ভাষায় কথা বলতেন সেটার নাম ছিলো আরামাইক যেটা আস্তে আস্তে হিব্রুর বদলে ইহুদীদের ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু গসপেলের সবচেয়ে পুরানো পাণ্ডুলিপির ভাষা হচ্ছে গ্রিক। আমরা সবাই জানি যে এক ভাষা থেকে আরেক ভাষায় অনুবাদের সময় কন্টেন্ট অনেকটাই হারিয়ে যায়। আর অনুবাদের সময় অনুবাদকের পক্ষে এটা সহজেই সম্ভব যে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে টপিক সংযোজন/ বিয়োজন করা। বাইবেলের ক্ষেত্রে এটা খুবই কমন। এই তথ্যটা মনে রাখা দরকার কারণ ভবিষ্যতে কিছু বিষয় বুঝতে এটা খুবই কাজে লাগবে ইনশাল্লাহ।

তাই বাইবেলের ইংরেজী অনুবাদের ক্ষেত্রে ভার্সনের সংখ্যা অনেক[13] যেটা আগেই বলেছি যে কুরআনের ক্ষেত্রে চিন্তাই করা যায় না।

একটা কথা আমি সবসময় বলি যে জ্ঞান, সেটা যে ফিল্ডেরই হোক না কেন তা যদি নিরপেক্ষভাবে অর্জিৎ হয় এবং আমাদেরকে ভাবতে শেখায়, তবে তা আমাদেরকে সত্যের কাছে নিয়ে যাবে ইনশাল্লাহ, যেমনটা হয়েছিল মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে যাদুকরদের সাথে। ওদের যাদুবিদ্যার জ্ঞানই ওদেরকে সত্য চিনতে শিখিয়েছিল। ঠিক সেভাবে যারা বাইবেল স্কলার, তাদের অধিকাংশই আজকাল বিশ্বাস করেন না যে বাইবেল ঐশী বাণী। এই উপলব্ধি বহু বাইবেল স্কলারকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে আলহামদুলিল্লাহ।

[13] তাই আমাদের যদি জীবনে এমন অভিজ্ঞতা আসে যে আমাদেরকে কেউ ক্রিস্টান ধর্মের দাওয়াত দিতে আসে আমরা সহজেই তাদের এই প্রশ্নটা করতে পারি যে তোমাদের ধর্মগ্রন্থের এতগুলো ভার্সন কেন।

শিকড়ের সন্ধানে-৪৫

গত পর্বে আমরা বাইবেলের গ্রহণযোগ্যতা যে প্রশ্নের সম্মুখীন সেটা বলেছি এবং কেন সেটাও ব্যাখ্যা করেছি। এখন আমরা ধীরে ধীরে দেখাবো যে তারপরও কেউ যদি আজকের বাইবেল পড়ে তাহলে ক্রিস্টানদের মাঝে যেসব বিশ্বাস প্রচলিত সেগুলোর সাথে আকাশ পাতাল পার্থক্য খুঁজে পাবে বললে অত্যুক্তি হবে না। বাইবেলে জেসাস তথা ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে রূপ ফুটে উঠেছে তা আজকের ক্রিস্টানদের তুলে ধরা রূপের থেকে পুরাই আলাদা, বরং তা একজন মুসলিমের আচার ব্যবহারের সাথে অনেকটাই মিলে যায়। আজকে আমরা সেরকম কিছু বিষয় তুলে ধরবো

- শুকরের মাংস না খাওয়াঃ

ওদের গ্রন্থে আছে-

And the pig, though it has a divided hoof, does not chew the cud; it is unclean for you. 8 You must not eat their meat or touch their carcasses; they are unclean for you. Leviticus 11:7-8[14]

কিন্তু আজকের ক্রিস্টানরা কি সেটা মানে? Pork তো ওদের খাদ্যতালিকায় আবশ্যকীয় আইটেম। তাছাড়াও শুকর ওদের এত প্রিয় যে ওদের নার্সারি ছড়ার মাঝে, বাচ্চাদের গল্পে, কার্টুনে সবখানে এটার সরব উপস্থিতি।

- রক্ত সমৃদ্ধ কিছু না খাওয়াঃ

But you must not eat the blood; pour it out on the ground like water. (Deuteronomy 12:16)

অনুরূপ নিষেধাজ্ঞা কুরআনেও আছে, আমরা সবাই আশা করি সেটা জানি-

আপনি বলে দিনঃ যা কিছু বিধান ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে পৌঁছেছে, তন্মধ্যে আমি কোন হারাম খাদ্য পাই না কোন ভক্ষণকারীর জন্যে, যা সে ভক্ষণ করে; কিন্তু মৃত অথবা প্রবাহিত রক্ত

[14] আরো আছে Deuteronomy 14:8

অথবা শুকরের মাংস এটা অপবিত্র অথবা অবৈধ; যবেহ করা জন্তু যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়। অতপর যে ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে এমতাবস্থায় যে অবাধ্যতা করে না এবং সীমালঙ্ঘন করে না, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা ক্ষমাশীল দয়ালু। (6:145)

- মদ্যপান না করাঃ

যারা পশ্চিমা দেশগুলোতে থাকেন তাদের জন্য মনে হয় এটা কল্পনা করাও দুষ্কর যে বাইবেলে মদ্যপানের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছে। তাহলে দেখা যাক ওদের বইতে কী বলা আছে-

The Lord said to Moses, "Speak to the Israelites and say to them: 'If a man or woman wants to make a special vow, a vow of dedication to the Lord as a Nazirite, they must abstain from wine and other fermented drink and must not drink vinegar made from wine or other fermented drink. They must not drink grape juice or eat grapes or raisins. As long as they remain under their Nazirite vow, they must not eat anything that comes from the grapevine, not even the seeds or skins. (Numbers 6:1-4)

কিন্তু আমরা অনেকেই হয়তো জানি যে ওরা এটাকে ওদের ধর্মীয় অনুষঙ্গে পরিণত করেছে, তাই চার্চের ভিতরে, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের (Communion-celebration of the last supper) অংশ হিসেবে ওরা মদ্যপান করে। তাহলে কেন এই বৈপরীত্ব? ঘটনা হচ্ছে যে Gospel of John যে উল্লেখিত আছে যে Jesus have a miracle of turning water into wine during the last supper. এখন এই ঘটনা চারটা গসপেলের মধ্যে খালি এটাতেই উল্লেখ করা হয়েছে। আর Gospel of John বারবারই ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন বর্ণনা করতে গিয়ে অন্যান্য গসপেলের সাথে বিরোধিতাপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছে। তাই শুরু থেকে চার্চ এই গসপেলকে Heretical হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। আজকের নিউ টেস্টামেন্টের স্কলারদের মতে তাই এই ঘটনার বিশুদ্ধতা প্রশ্নের সম্মুখীন।

- নামাযে সিজদাহ করাঃ

বাইবেল অনুসারে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদাতের সময় সিজদাহ করেছিলেন, যেমনটা আমরা করে থাকি।

Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will."
(Matthew 26:39)

- মেয়েদের পর্দার বিধানঃ

যে কেউ যদি মাদার মেরীর কোনো মূর্তি/ ছবি দেখে তাকে মুসলিম নারী হিসেবে ভ্রম হওয়া অলৌকিক কিছু না। বাইবেল থেকে জানা যায় যে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমসাময়িক নারীরা মুখ ঢেকে চলতেন, যেমনটা আমরা নিচের ঘটনা থেকে বুঝতে পারি।

And Rebekah lifted up her veils, and when she saw Isaac, she lighted off the camel. and asked the servant, "Who is that man in the field coming to meet us?"

"He is my master," the servant answered. So she took her veil and covered herself.) Genesis 24:65(

যারা মুসলিম মেয়েদের পর্দার বিধানকে oppression বলেন আমার তাদেরকে খুব জিজ্ঞেস করে দেখতে ইচ্ছা করে যে তাহলে আপনার হিসাব অনুযায়ী মাদার মেরীই সবচেয়ে অত্যাচারিত ছিলেন, নাকি!

- রোযা রাখাঃ

এটাও উল্লেখ আছে যে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ৪০ দিন রোযা রেখেছিলেন।

After fasting forty days and forty nights, he was hungry. (Matthew 4:2)

- সুদের উপর নিষেধাজ্ঞাঃ

এটা মনে হয় সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার যে বাইবেল অনুসারে সুদের লেনদের নিষিদ্ধ। আজকের সুদভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থায় এটা বিশ্বাস করাই কষ্টকর হয়ে পড়ে। যাই হোক এটার এত

রেফারেন্স আছে যে সব এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আমি একটা লিস্ট দিচ্ছি যেখানে সবগুলো একসাথে উল্লেখ করা আছে।[15] তবে নিচের এটা উল্লেখ না করলেই নয় যেখানে বলা হচ্ছে যে তৎকালীন ইহুদীরা মাসজিদুল আকসার মধ্যে অন্যান্য লেনদেনের সাথে সুদের লেনদেনও শুরু করেছিল। ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে মানি এক্সচেঞ্জারদের টেবিল উল্টে দিয়েছিলেন-

Then Jesus went into the temple courts and drove out all who were buying and selling there. He overturned the tables of the money changers and the seats of those selling doves. 13And He declared to them, "It is written: 'My house will be called a house of prayer.' But you are making it 'a den of robbers. (Mark 11:15-19; Luke 19:45-48; John 2:12-25)

এ প্রসংগে Dr Lawrence Brown,[16]আমার খুব প্রিয় একজন ব্যক্তিত্ব, Deen show র একটা ভিডিওতে[17] একটা মন্তব্য মনে পড়ছে-The muslims follow jesus more than the Christians.এটা খুব সহজেই ফুটে ওঠে যখন আমরা দেখি যে জেসাসের সব ছবিতে ঊনার দাড়ি আছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্রিস্টানের দাড়ি নেই,ঊনি ঊনার শিষ্যদেরকে সালাম দিয়েছেন এবং দেয়া শিখিয়েছেন (Luke 10:5, Luke 24:36). ইত্যাদি এমন অনেক কিছু বলা যায়!

What an irony, তাই না? যারা জেসাস জেসাস বলে গলা ফাটিয়ে ফেলছে, তারাই ঊনার অবাধ্যতায় লিপ্ত। অবধারিতভাবে তাহলে প্রশ্ন উঠে যে কেন এমন হচ্ছে? কঠিন প্রশ্নের সহজ উত্তর- ওরা ওদের ধর্ম গ্রন্থ পড়ে না, তাই জানে না!

বিশাল বড় অপরাধ, নাকি? আমরা তো এই কাজ কেউ করি না, তাই না? আর সেজন্যই আশেকে রাসূলদের অধিকাংশ কাজই সুন্নাহ বিরোধী! আবার বলতে ইচ্ছা করছে, What an irony, তাই না?

---

[15] https://www.openbible.info/topics/charging_interest

[16] https://extremelysmart.org/2011/11/26/dr-laurence-brown/

[17] https://www.youtube.com/watch?v=gdL_GH5RGn0

শিকড়ের সন্ধানে-৪৬

আজকের পর্বে আমরা আজকের ক্রিস্টান ধর্মের সবচেয়ে মৌলিক স্তম্ভ-ট্রিনিটির কন্সেপ্টটা নিয়ে আলোচনা করবো। এটা নিয়ে আগে আমরা বিস্তারিত কথা বলেছি, কিন্তু সেটা ছিলো কুরআনের দৃষ্টিকোণ থেকে, আজকে আমরা দেখবো বাইবেলের দৃষ্টিকোণ থেকে।তার আগে বলে নেয়া ভালো যে এখন থেকে আমরা যা বলবো সেটার উৎস মূলত ২টা বই- ডঃ বিলাল ফিলিপ্স এর The true message of jesus Christ আর ডঃ লরেন্স ব্রাউনের Misgoded.

আমরা দেখবো যে বাইবেলের কোথাও ট্রিনিটির কথা সরাসরি উল্লেখ নাই। এমনকি বাইবেল দিয়ে দ্ব্যর্থহীণভাবে এটা প্রমাণ করা যাবে না। অর্থ্যাৎ এই doctrine এর ভিত্তিও বাইবেল নয়। বাইবেল স্কলাররাই বলেন যে এটা কোনো Revealed doctrine নয়, বরং Evolved Doctrine, মানে Theologian রা সময়ের সাথে সাথে এটা ঘষা মাজা করেছেন।[18] এটাকে প্রথম একটা সুসংগঠিত রূপরেখা দেন Tertullian (155 – 240 CE), মানে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিশনের প্রায় ২০০ বছর পরে! তার মডেলটা ছিল এরকম-[19]

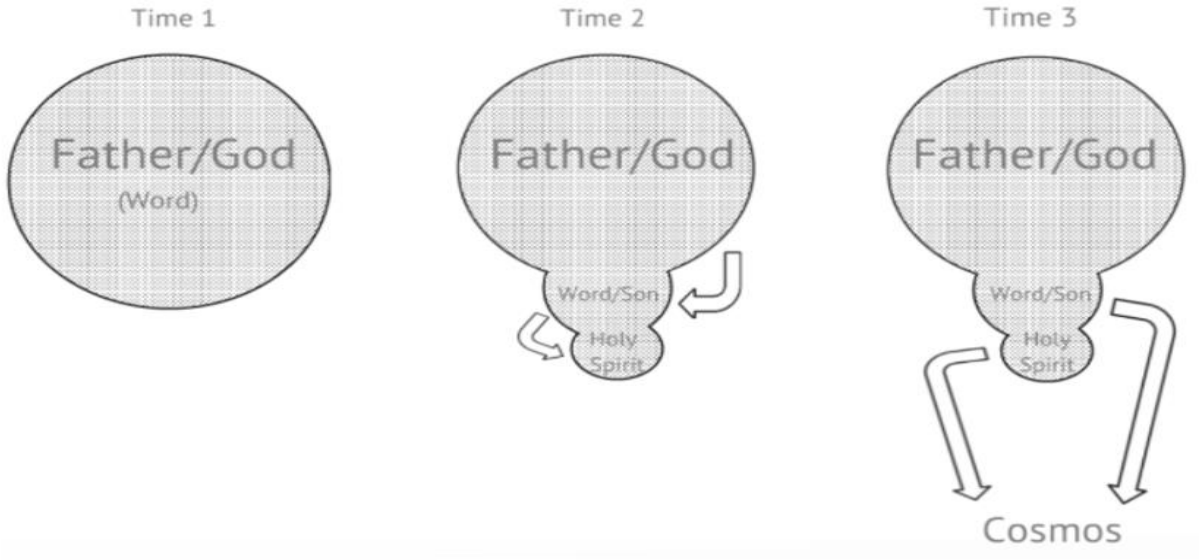

[18] এজন্যই ক্রিস্টানদের মাঝে একটা গ্রুপ গড়ে উঠেছে যারা এই মতবাদে বিশ্বাস করে না।কেউ আগ্রহী হলে এই ভিডিওটা দেখতে পারেন https://www.youtube.com/watch?v=YGCtsJvh0bQ

[19] https://plato.stanford.edu/entries/trinity/trinity-history.html

পরবর্তীতে council of Nicea (৩২৫ ক্রিস্টাব্দ) এটাকে আরো পরিমার্জিত করে। এটা কী, সেটা আমরা পরের পর্বগুলোতে বিস্তারিত দেখবো ইনশাল্লাহ, পাঠককে অনুরোধ করছি এই টার্মটা মনে রাখার জন্য।

তাই বাইবেলে এর বিপরীত কথাই আমরা পাই। Mark 12:28-29 তে একজন এসে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসে জিজ্ঞেস করলেন সবচেয়ে বড় commandment কোনটা। উত্তরে তিনি বলেন-

"The most important one," answered Jesus, "is this: 'Hear, O Israel: The Lord our God, the Lord is one. Mark 12:29

আপনি যদি কোনো ক্রিস্টানকে এটা বলেন, তাহলে সে বলবে হ্যাঁ God এক, কিন্তু তিনের এক ইত্যাদি.....এভাবে ব্যাখ্যা দিতে চাবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ব্যাখ্যা দেয়ার সুবর্ণ সুযোগ তো ছিলো ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের, তাই না, যখন ঊনাকে একজন এসে এটা জিজ্ঞেস করলো? কিন্তু তিনি আর কোনো ব্যাখ্যাই দিলেন না, তাহলে আমরা কার কথা বেশী বিশ্বাস করবো? ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নাকি কোনো পোপ অথবা পাদ্রীকে?

এখন বাইবেল সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা আছে এমন কাউকে যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন বাইবেল থেকে প্রমাণ দিতে, তাহলে খুব সম্ভবত সে নিচের অংশকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করবে, সবচেয়ে বহুল উল্লেখিত প্রমাণ এটাই।

For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one. And there are three that bear witness in earth, the Spirit, and the water, and the blood: and these three agree in one. (1 John 5:7-8)

কিন্তু বাইবেল স্কলাররা এটার ব্যাপারে কী বলেন? তারা বলেন যে এই বাক্যটা অরিজিনাল পাণ্ডলিপিতে ছিলো না, কোনো একজন কপি কারক এটা ফুটনোট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেন নিজস্ব চিন্তা হিসেবে!! পরবর্তীতে কারো এটা পছন্দ হলে (যে ট্রিনিটির সমর্থক ছিলো) সে সেটা মার্জিন থেকে মূল টেক্সটের অংশ বানিয়ে দেন পঞ্চম শতাব্দীতে এসে :(তাই বাইবেল স্কলাররা এই

অংশকে এই অংশকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।[20] বিস্তারিত জানতে এই ভিডিওটা দেখতে পারেন https://www.youtube.com/watch?v=Nlx9lLqJ8rU

আমি যখন এটা শুনছিলাম তখন আমার শুধুই নিচের আয়াতটার কথা মনে হচ্ছিল-

অতএব তাদের জন্যে আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ-যাতে এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্যে।(২:৭৯)

এখনকার অধিকাংশ বাইবেল থেকে এটা সরিয়ে দেয়া হয়েছে যেমন Revised Standard Version of 1952 and 1971, New Revised Standard Version of 1989, New American Standard Bible, New International Version, The Good News Bible, The New English Bible, The Jerusalem Bible, Darby's New Translation ইত্যাদি। মজার ব্যাপার হচ্ছে যে New Scofield Reference Bible এটা রেখে দিয়েছে। যেহেতু এটা বাইবেল স্কলারদের জন্য, তাই এই insertion এর ব্যাপারটা ফুটনোটে দেয়া। কিন্তু Scofield Study Bible যেটা আমজনতার জন্য, সেখানে এই ফুটনোটটা নাই! মানে বাইবেলের অনুবাদ কেমন হবে সেটা নির্ভর করে পাঠকের উপরে ☹

এখন আসা যাক অন্যান্য প্রমাণে। আরো আছে নিচের অংশঃ

Go therefore and disciple all the nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit (Matthew 28:19)

এখন ঘটনা হচ্ছে যে আরেকটা গসপেলে একই ঘটনার বর্ণনা করা হচ্ছে, কিন্তু সেখানে ফাদার, সান, হোলি ঘোস্ট ইত্যাদির কোনো উল্লেখ নেই।

---

[20] The Interpreter's Bible comments: This verse in the KJV is to be rejected (with RSV). It appears in no ancient Greek MS nor is it cited by any Greek father; of all the versionsonly the Latin contained it, and even this in none of its most ancient sources. The earliest MSS of the Vulg. do not have it. As Dodd (Johannine Epistles, p. 127n) reminds us, "It is first quoted as a part of 1 John by Priscillian, the Spanish heretic, who died in 385, and it gradually made its way into MSS of the Latin Vulgate until it was accepted as part of the authorized Latin text." -
The Interpreter's Bible. 1957. Volume XII. Nashville: Abingdon Press. pp. 293294.

And he said unto them, Go ye into all the world, and preach the gospel to every creature (Mark 16:15)

এমন বৈপরীত্বময় টেক্সটের উপর কি ভরসা করা যায় আমার পারলৌকিক মুক্তির জন্য? আমার কাছে এমনটা খুবই ভয়ের ব্যাপার মনে হয় ☹ তাছাড়া তর্কের খাতিরে যদি বা ধরেও নেই যে Matthew 28:19 তে এই তিনটা স্বত্তার কথা বলা হয়েছে, তা থেকে কি বোঝা যায় যে এরা তিনজন মিলে God? স্বাভাবিক কমন সেন্স থেকে বোঝা যায় যে কেউ যদি বলে Lions and tigers and bears তাহলে কেউ কি একটা triune (তিনের ভেতর এক) পশু চিন্তা করে? তাহলে the Father and of the Son and of the Holy Spirit শুনে কেউ triune God এর কন্সেপ্টে চিন্তা করবে কেন!

প্রমাণ হিসেবে আরো আছে নিচের অংশ যেখানে বলা হচ্ছে যে যে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছে, সে যেন ফাদার/ গডকেই দেখেছে। তাহলে তো এরা একই স্বত্ত্বা!

Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? he that hath seen me hath seen the Father; and how sayest thou then, Show us the Father? (john 14:9)

কিন্তু বাইবেলের অন্য অংশেই আবার আছে কেউই ফাদার/ গডকে দেখেনি, তার কণ্ঠও শুনে নি! তাহলে কি তারা একই স্বত্ত্বা হতে পারে!

And the Father who sent me has himself testified concerning me. You have never heard his voice nor seen his form (john 5:37)

যারা ট্রিনিটির পক্ষে কথা বলেন তাদের আরো একটা প্রিয় রেফারেন্স হচ্ছে-

I and my Father are one. John 10:30

কিন্তু তারা পরের অংশগুলোকে এড়িয়ে চলেন। এরপরেই বলা হচ্ছে যে এই কথা বলার জন্য তৎকালীন ইহুদীরা তাকে পাথর ছুড়ে হত্যা করতে চেয়েছিল, তখন ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্তব্য করেন যে ওরা ঊনার কথাকে ভুল বুঝেছে!

Then the Jews took up stones again to stone him.Jesus answered them, Many good works have I shewed you from my Father; for which of those works do ye stone me? The Jews answered him, saying, For a good work we stone thee not; but for blasphemy; and because that thou, being a man, makest thyself God. Jesus answered them, Is it not written in your law, I said, Ye are gods?)John 10:31-34)

এতেই যদি তারা সন্তুষ্ট না হয়, তাহলে আরো দেখানো যায় যে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিষ্যদেরকে অন্তর্ভুক্ত করেও বলেছেন যে তারা সবাই এক।

That they all may be one; as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us: that the world may believe that thou hast sent me. (John 17:21)

And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one, as we are. (John 17:11)

যেভাবে John 10:30 কে বর্ণনা করা হয়েছে, সেই একই আঙ্গিকে যদি অন্যান্য আয়াতগুলোকেও চিন্তা করা হয় তাহলে তো কন্সপেটটা আর ট্রিনিটি থাকে না, বহু স্বত্ত্বার সমষ্টি হয়ে যায়।

এখন আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী আজকের বাইবেলে কিছু হলেও আল্লাহর অরিজিন্যাল বাণী অবশিষ্ট আছে। সেই আলোকে কেউ কি চিন্তা করতে পারেন যে উপরের অংশে আসলে কিসের দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে?

শিকড়ের সন্ধানে-৪৭

আগের পর্বে আমরা একটা চিন্তার খোরাক দেয়ার চেষ্টা করেছিলাম। আমরা যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করি তাহলে বুঝবো যে I and Father is the one অথবা We are one (the disciples) এই কন্সেপ্টগুলো যতটা না আক্ষরিক, তার চেয়ে প্রতীকী। এখানে আসলে এদের সবার পথ যে একই অথবা মিশন একই এমন কথা বুঝানো হয়েছে আর এমনটা আমাদের কুরআনেও একাধিক জায়গায় বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমার নিচের আয়াতটার কথা মনে পড়ছে-

বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ ও তোমাদিগকে ভালবাসেন এবং তোমাদিগকে তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী দয়ালু। (৩:৩১)

যে লোক রসূলের হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। (৪:৮০)

যাই হোক, আমি যখন এই পর্বগুলো লেখার জন্য নানা জিনিস পড়ছিলাম/ ভিডিও দেখছিলাম তখন আমার ভেতরে একটা চিন্তা কিলবিল করছিলো। আমি কি আমার পয়েন্ট প্রমাণ করার জন্য কোনো selective quoting করছি যেই দোষ আমরা ক্রিস্টান/ ইহুদীদের দিয়ে থাকি? আমার কি উচিৎ না ওদের পক্ষের লেখাগুলো পড়া? বলা যেতে পারে Intellectually honest থাকার জন্য আমি ট্রিনিটির পক্ষের বেশ কিছু লেখা পড়লাম। সত্যি কথা হচ্ছে আমার যুক্তিবাদী মন একটুও সন্তুষ্ট হতে পারে নি। তখন আমার লরেন্স ব্রাউনের Misgoded বইটার ভূমিকার কিছু কথা মনে পড়ে গেলো। উনি ওখানে লিখেছেন যে এখন আমরা সারা বিশ্বের মানুষরা খুব কমই চিন্তা করে থাকি। সস্তা বিনোদনের নানা উপকরণ উপভোগ করে আমাদের দিন কাটে, আড্ডায় চায়ের কাপে যেসব বিষয়ের উপর ঝড় ওঠে তাও খুব অগভীর বিষয়। তাই আজকাল মানুষকে খুব হালকা যুক্তি/ আবেগ দিয়ে পটিয়ে ফেলা যায়। কিন্তু আগে ব্যাপারটা এমন ছিলো না, মানুষ অনেক গভীর ভাবে চিন্তা/ বিশ্লেষণ করতো। তাই তখন dissenting voice কে স্তব্ধ করার জন্য চার্চকে খুব কঠোর ব্যবস্থা নিতে হত যেটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত পড়ে পড়বো ইনশাল্লাহ।

আমি যখন ট্রিনিটির স্বপক্ষের লেখাগুলো পড়ছিলাম তখন আমি ঠিক এই জিনিসটাই লক্ষ্য করলাম- আবেগে উপচানো, গদ্গাদ লেখা কেন এরা তিনজন আলাদা হয়েও এক, যেগুলার অধিকাংশই আমার কাছে মনে হয়েছে কমন সেন্সের পরিপন্থী!

এ প্রসংগে আরো একটা বিষয় মাথায় আসলো যেটা সাম্প্রতিক সময়ে সূরা বাক্বারার তাফসীর পড়তে গিয়ে জেনেছি। উস্তাদ নুমান আলী খান বলছেন যে মানুষের ব্যবহার, আচরণ ইত্যাদিকে নিয়ন্ত্রণ করে মূলত ২টা ফ্যাকাল্টি- হৃদয় এবং ব্রেন। হৃদয়ের মাঝে থাকে আবেগগুলো, আর ব্রেন পর্যালোচনা করে যুক্তি, প্রমাণ ইত্যাদি। সঠিক পথে থাকার জন্য এই ফ্যাকাল্টিদ্বয়ের মাঝে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। ভারসাম্যহীণতার একটা উদাহরণ হচ্ছে একজন ডাক্তার যখন ধূমপান করেন তখন। এখানে তার ভারসাম্যহীণতা ব্রেনে নয়, সে খুব ভালো করেই জানে কেন এটা করা উচিৎ না। সমস্যা হচ্ছে হার্টে। সেই একই মানুষ হয়তো তার মেয়ের সামনে সিগারেট খায় না কারণ সন্তানের প্রতি তার ভালোবাসা তাকে এটা করতে দেয় না।

আমরা সবাই জানি যে সূরা ফাতিহাতে আমাদের দুই গ্রুপের মত হওয়া থেকে আশ্রয় চাইতে বলা হয়েছে। একটা হচ্ছে غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ (যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে) আরেকটা হচ্ছে الضَّالِّينَ(যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।)

মোটা দাগে একথা বলা যায় যে প্রথম গ্রুপ হচ্ছে ইহুদীরা দ্বিতীয় গ্রুপ হচ্ছে ক্রিস্টানরা...কিন্তু কেন? আসলে কি এই দুই গ্রুপের সবাইকে কলমের আঁচড়ে গযব প্রাপ্ত অথবা পথভ্রষ্ট হিসেবে লেবেলিং করে দেয়া উদ্দেশ্য, নাকি ওদের যে স্বভাব এই পরিণতি ডেকে এনেছে সেটা বোঝাটা উদ্দেশ্য যাতে আমরা একই ভুল না করি।

এই দুই গ্রুপের ভুলগুলোর কারণ যদি আমরা উপরের হার্ট ও ব্রেনের আঙ্গিক থেকে দেখি তাহলে দেখবো যে ইহুদীদের সমস্যা ব্রেনে ছিলো না, ছিলো হৃদয়ে। ওদের কাছে প্রমাণের কোনো অভাব ছিলো না যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই নবী যার জন্য তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ যে উপমা ব্যবহার করছেন সেটা পড়লেই আমি আবেগাপ্লুত হয়ে যাই-

আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে, যেমন করে চেনে নিজেদের পুত্রদেরকে। আর নিশ্চয়ই তাদের একটি সম্প্রদায় জেনে শুনে সত্যকে গোপন করে।(2:146)

সব ধরণের প্রমাণ থাকার পরও ওরা মেনে নিতে পারছিলো না যে উম্মী তথা Gentile দের মধ্য থেকে একজনের কাছ থেকে নবী আসবে, ওদের গোত্র থেকে না।

পক্ষান্তরে আমরা যদি ক্রিস্টানদের কথা চিন্তা করি, আমরা বুঝবো যে ওদের হৃদয় পরিষ্কার। আমরা সবাই জানি মিশনারীরা কেমন মানবতার জন্য কাজ করে। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে ওরা প্রমাণ/যুক্তির তোয়াক্কা করে না। আবেগ দিয়েই ওদেরকে দিয়ে অনেক কিছু করানো যায়। ওদের

কেউ যদি কখনও এইসব doctrine নিয়ে প্রশ্ন তোলে, তখন ওদের অথরিটি তথা পোপ, পাদ্রী এরাই বলে যে You just need to have faith. ভালোবাসা, ভালোবাসা, ভালোবাসা.....ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য, যুক্তি বুদ্ধি ঊর্ধ্বে এক ভালোবাসা। যারা এমনটা করতে পারে না, তারা যদি ইসলামের সন্ধান না পায় তাহলে নাস্তিক হয়ে যায়, যদি পায় ইসলামের সন্ধান, তাহলে ইসলাম গ্রহণ করে। এজন্যই আমরা দেখি যে বিশাল সংখ্যক মুসলিম রিভার্ট হচ্ছে বাইবেল স্কলার অথবা যারা বাইবেল নিয়ে পড়াশোনা করেছে।

এখান থেকে আমরা খুব গভীর একটা দিক নির্দেশনা পাই কিন্তু! এখানে প্রকারান্তরে আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে জ্ঞানের প্রতি আমাদের Attitude কী হওয়া উচিৎ -

১। আমাদের ক্রমাগত জ্ঞান অর্জনের প্রসেসের মাঝে থাকতে হবে। যদি আমরা মনে করি যে যত বেশী জানবো তত মানতে হবে (এটা আমি অনেকের কাছেই শুনি), অথবা যা জানি এটাতেই সন্তুষ্ট থাকতে চাই, অথবা খালি অমুক তমুক যাদেরকে একটু প্র্যাক্টিসিং মনে হয় তার কথার উপর অন্ধভাবে বিশ্বাস করি নিজেরা প্রমাণ/ যুক্তি কিছু না দেখি, তাহলে আমরা হয়ে যাবো الضَّالِّينَ, ক্রিস্টানদের মত।

২। জ্ঞান যা অর্জন করছি তা আমলে পরিণত করার জন্য সবসময় আন্তরিক চেষ্টা করে যেতে হবে। কোনো কিছু ফরয জানার পর তা না করে যেন আমরা বসে না থাকি! যদি জ্ঞান আসার পরও সেখানে আমরা গাফিলতি করি, তাহলে সেটা হবে غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ দের মত!

সূরা বাক্বারা জুড়ে রয়েছে মূলত ইহুদীদের এই স্বভাবের কারণ নিয়ে আলোচনা। ওটা পড়তে গিয়ে বারবার যেসব দুআ আমার মাথায় আসছিলো (আমি কুরআনের আয়াতগুলোকে দুআতে পরিণত করে পড়তে চাই সবসময়। কিভাবে করা যায়, সেটার উপরে একটা নোট লিখেছিলাম http://bit.ly/1TUyLpn) তাতে আমি নতুন করে উপলব্ধি করছিলাম যে কেন সূরা ফাতিহাকে উম্মুল কুরআন বলা হয়। আমার সব কথাই যেন শেষ দুই আয়াতে বলে দেয়া হয়েছে!

আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে ইসলাম প্র্যাকটিস শুরু করার পর আমি প্র্যাক্টিসিং মানুষদের এৎ জঘন্য রূপ দেখেছি যে আমি যদি না জানতাম যে Islam is the truth, আমি বহু আগে ইসলাম থেকে ছিটকে যেতাম। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কিভাবে আমরা এই জ্ঞানপাপী হওয়া থেকে নিজেদেরকে বাঁচাতে পারি? এমনটা কেন হয়? কেন আল্লাহ্ আমাদেরকে যে জ্ঞান দিয়েছেন সেটার দাবী অনুযায়ী আমরা আচরণ করতে পারি না?

আমার সীমিত অভিজ্ঞতা বলে যে ধর্মীয় আচার আচরণগুলো করতে করতে যখন সেটা অভ্যস্ততায় পরিণত হয়, তখনই হার্টটা কঠিন হয়ে যায়। এক কথায়, আল্লাহর সাথে সম্পর্কটা যখন হালকা হয়ে যায়। আমার মনে আছে যে আমি প্রথম যখন পর্দা করা শুরু করি, তখন প্রতিবার বোরকাটা গায়ে জড়ানোর সময় আমার মনে হত আমি কুরআনের একটা আয়াতকে ধারণ করছি, খুবই boost up অনুভব করতাম। সময়ের সাথে সাথে এটা আমার পোশাকে পরিণত হয়েছে, এখন এটা পরে বের হওয়ার সময় আর কিছুই মনে হয় না ☹ এই কথা সত্যি নামায, রোযা সব ধরণের ইবাদাতের ক্ষেত্রেই!

আরো একটা কারণ হচ্ছে বন্ধু বান্ধবের সার্কেল আল্লাহর স্মরণ বিমুখ হওয়া। Believers are mirror to each other.....Reminder benefits the believers এই মূলনীতিগুলো খুবই সত্যি!

শিকড়ের সন্ধানে-৪৮

আমরা কথা বলছিলাম ট্রিনিটির কনসেপ্টটা নিয়ে। এই পর্যায়ে এসে আমাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে যে কুরআন এ ব্যাপারে কিছু বলে নাকি। পুরা কুরআন জুড়েই যখন আল্লাহর পরিচয় এবং এককভাবে ঊনাকেই ইবাদাত করার পেছনে যুক্তি তুলে ধরা হয়েছে তখন আলাদা করে আসলে এই মতবাদটাকে খণ্ডন করার কিছু নাই। কুরআন শুধু দুই জায়গায় এটার কথা উল্লেখ করেছে-

হে আহলে-কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর শানে নিতান্ত সঙ্গত বিষয় ছাড়া কোন কথা বলো না। নিঃসন্দেহে মরিয়ম পুত্র মসীহ ঈসা আল্লাহর রসূল এবং তাঁর বাণী যা তিনি প্রেরণ করেছেন মরিয়মের নিকট এবং রূহ-তাঁরই কাছ থেকে আগত। অতএব, তোমরা আল্লাহকে এবং তার রসূলগণকে মান্য কর। আর একথা বলো না যে, আল্লাহ তিনের এক, একথা পরিহার কর; তোমাদের মঙ্গল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ একক উপাস্য। সন্তান-সন্ততি হওয়াটা তাঁর যোগ্য বিষয় নয়। যা কিছু আসমান সমূহ ও যমীনে রয়েছে সবই তার। আর কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট। (৪:১৭১)

নিশ্চয় তারা কাফের, যারা বলেঃ আল্লাহ তিনের এক; অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোন উপাস্য নেই। যদি তারা স্বীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরে অটল থাকবে, তাদের উপর যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি পতিত হবে। (৫:৭৩)

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে ট্রিনিটি আর ঈশ্বরপুত্রে বিশ্বাস করা একই কথা। কিন্তু আমাদের যুক্তিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমরা দেখাবো যে ট্রিনিটির কনসেপ্ট যেন বাইবেলে নেই, সেরকম আজকের বাইবেল, বিকৃতির পরও কোথাও সরাসরি বলে না যে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র হিসেবে দাবী করেছেন, বরং নিউ টেস্টামেন্টে ৮৮ বার নিজেকে মানব সন্তান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। একইভাবে তিনি কোথাও নিজেকে divine হিসেবে দাবী করেন নাই। বরং এমনটা অস্বীকার করেছেন। এখানে লক্ষণীয় যে আমরা এখানে God Incarnation (আল্লাহ মানুষের রূপ ধরে দুনিয়াতে আদৌ আসতে পারেন নাকি)- এই টপিকটার যৌক্তিকতা নিয়ে কথা বলবো না, কারণ সেটা আমাদের এখানকার আলোচ্য বিষয় নয়। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে লিখলে আসলে পাতার পর পাতা লেখা হয়ে যায় কারণ বাইবেলে আছে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম হয়েছিলো, ক্ষুধা তৃষ্ণা ছিলো, ঊনি সব কিছু জানতেন না ইত্যাদি

অনেক কিছু। যারা বলেন যে God সবকিছু হতে পারলে মানুষ কেন হতে পারবে না, তাদের এক কথায় বলা যায় যে God does not do any ungodly task! কেউ এই পয়েন্ট নিয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে এই ভিডিওটা দেখতে পারেন। https://www.youtube.com/watch?v=_Yn-6OW5K8c

ফিরে আসছি বাইবেলের রেফারেন্সে। প্রথমে আমরা দেখবো যে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সাথে ঊনার সম্পর্কের ব্যাপারে কী বলেছেন। নিচের অংশ থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে ঊনি কখনোই নিজেকে God হিসেবে দাবী করেন নাই।

So Jesus said, "When you have lifted up[a] the Son of Man, then you will know that I am he and that I do nothing on my own but speak just what the Father has taught me. [John 8:28]

যাই হোক আরো রেফারেন্স হচ্ছে বাইবেলের নিচের অংশঃ

"You heard me say, 'I am going away and I am coming back to you.' If you loved me, you would be glad that I am going to the Father, for the Father is greater than I. [John 14:28]

Jesus gave them this answer: "Very truly I tell you, the Son can do nothing by himself; he can do only what he sees his Father doing, because whatever the Father does the Son also does. [John 5:19]

এভাবে আসলে অনেক রেফারেন্সই দেয়া যায়, যেগুলোতে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে আল্লাহর অনুগত হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তবে সবচেয়ে গুরুত্বের দাবী রাখে মনে হয় নিচের অংশ, যেখানে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আল্লাহর ইবাদাত করতে বলছেন।

Jesus answered, "It is written: 'Worship the Lord your God and serve him only.'" [Luke 4:8]

এর আগের একটা পর্বে আমরা দেখেছি যে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদাহ করেছেন। ঊনি নিজেই যদি divinity দাবী করবেন, তাহলে কাকে সিজদাহ করেছিলেন ঊনি?

বরং ঊনি নিজেকে নবী হিসেবে উপস্থাপন করেছেন বাইবেলের বহু জায়গায়। যেমন নিচের অংশেঃ

When Jesus had finished these parables, he moved on from there.54 Coming to his hometown, he began teaching the people in their synagogue, and they were amazed. "Where did this man get this wisdom and these miraculous powers?" they asked. 55 "Isn't this the carpenter's son? Isn't his mother's name Mary, and aren't his brothers James, Joseph, Simon and Judas?[21] 56 Aren't all his sisters with us? Where then did this man get all these things?" 57 **And they took offense at him.**

But Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his own town and in his own home." [Matthew 13:53-57]

অর্থ্যাৎ যখন ঊনার লোকেরা ঊনাকে অবিশ্বাস করছিলো, তখন ঊনি মন্তব্য করেছিলেন যে নিজের গোত্রের লোকেরা নবীদের এভাবে অবিশ্বাসই করে থাকে!

এখন অবধারিতভাবে প্রশ্ন উঠে যে যারা এমনটা দাবী করেন তাদের পক্ষের রেফারেন্স কোনটা? তারা নিচের অংশকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে-

And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. 1 Timothy 3:16 King James Version (KJV)

[21] বাইবেলে এরকম একাধিক জায়গায় ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাইয়ের নাম উল্লেখ করেছে। এটার মানে কী সেটা নিয়ে ওদের মাঝেই মতভেদ আছে, নানা গ্রুপ নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছে। কেউ আপন ভাই, কেউ সাহাবী, কেউ নিকটাত্মীয় ইত্যাদি। কুরআন বা সুন্নাহ থেকে আমরা কিছু জানতে পারি না, তাই এব্যাপারে চুপ থাকাটাই আমাদের জন্য শোভন, কারণ যা আল্লাহ জানান নাই, তা আমাদের জানার প্রয়োজন নাই বলেই জানান নাই।

মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এই অংশটা এভাবে বাইবেলের আদি পাণ্ডুলিপিগুলোতে ছিলোনা। আদি গ্রীক পাণ্ডুলিপি অনুসারে এটা ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশ্ন যে Who manifest in the flesh? কোনো একজন কপিকারক এটা বদলিয়ে লিখেছে যে God, পরে এটা বাইবেলের অংশ হয়ে গেছে। [22]এখানে উল্লেখ্য যে বাইবেলের King James Version (KJV) যেটা থেকে আমি উপরে কোট করেছি, সেটা সংকলিত হয়েছে ১৬০০ ক্রিস্টাব্দে। এটার পরে বাইবেলের বহু পুরানো পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সেখান থেকেই উপরের এই বিষয়টি আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই রিভাইড সংস্করণগুলোতে ফুটনোট পাওয়া যায় ব্যাপারটাতে ভারসাম্য আনার জন্য-

Footnotes:

1 Timothy 3:16 Gk *Who*; other ancient authorities read *God*; others, *Which* Without any doubt, the mystery of our religion is great:
He[a] was revealed in flesh,vindicated[b] in spirit,[c] seen by angels,
proclaimed among Gentiles, believed in throughout the world, taken up in glory.
Timothy 3:16New Revised Standard Version (NRSV)

সুবহানাল্লাহ, আমি যখন পড়ছিলাম এগুলো নিয়ে, আমার মাথা পুরা গুলিয়ে যাচ্ছিলো! এত ভার্সন যে গ্রন্থের আর এত কোটি কোটি অসামঞ্জস্য যেখানে একেকটা ভার্সনের মাঝে, সেখানে কিভাবে এটার উপর ভিত্তি করে জীবন চালানো সম্ভব? নিশ্চয়ই কুরআন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত সেটার একটা সুস্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে এটার এমন একাধিক ভার্সন নেই।

[22] In a chapter entitled "Theologically Motivated Alterations of the Text" in his book, Misquoting Jesus, Professor Ehrman elaborates on the corruption of 1 Timothy 3:16, which was detected not only by Sir Isaac Newton, but also by the eighteenth century scholar, Johann J. Wettstein.
In Ehrman's words, "A later scribe had altered the original reading, so that it no longer read "who" but "God" (made manifest in the flesh). In other words, this later corrector changed the text in such a way as to stress Christ's divinity.... Our earliest and best manuscripts, however, speak of Christ 'who' was made manifest in the flesh, without calling Jesus, explicitly, God Ehrman, Bart D. Misquoting Jesus. P. 157

শিকড়ের সন্ধানে-৪৯

শিকড়ের সন্ধানের এখনকার পর্বগুলো লিখতে গিয়ে আমি যত পড়ছি আর শুনছি, তত মনে হয় আমি ইসলামের অসাধারণত্ব বুঝতে পারছি আর ততই মোহিত হচ্ছি। যাই হোক, আজকের পর্বে আমরা দেখাবো যে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঈশ্বর পুত্র হিসেবে দাবী করার ব্যাপারটাও বাইবেল দ্বারা সমর্থিত নয়।

আমরা এর আগের পর্বে দেখেছি যে ঊনি নিজের পরিচয় দিয়েছেন নবী হিসেবে। তাহলে এই Son of God এর কনসেপ্টটা আসলো কোথা থেকে? ট্রিনিটির মতই এটা একটা Evolved Doctrine, not Revealed one. এটা সর্বসম্মতভাবে ক্রিস্টান ধর্মের অংশ হয় ৩২৫ ক্রিস্টাব্দে, Council of Nicaea এর মাধ্যমে। আগেই বলেছি, এটা নিয়ে আমরা পরে বিস্তারিত পড়বো ইনশাল্লাহ।

এখন বাইবেলে তো এটার পক্ষে কিছু প্রমাণ খুঁজে বের করা লাগবে, নাহলে মানুষকে বুঝ দেয়া যাবে কিভাবে! ওরা স্বপক্ষে যেসব যুক্তি দেখায় তার মাঝে একটা হচ্ছে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহকে Father ডেকেছেন। কঠিন প্রশ্নের সহজ উত্তর। ঊনি My father না, our father বলেছেন। এই হিসাব অনুযায়ী সব ক্রিস্টান যারা Lord's Prayer (The Lord's Prayer is a venerated Christian prayer that, according to the New Testament, Jesus taught as the way to pray) উচ্চারণ করে, তারা সবাই আল্লাহর পুত্র?

পাণ্ডুলিপিগুলো ঘাটলে দেখা যাবে যে এই Sonship এর কন্সেপ্টটা এসেছে ২টা গ্রীক শব্দ থেকে pais এবং huios যাদেরকে অনুবাদ করা হয়েছে son হিসেবে। কিন্তু এখানে গোড়ায় গলদ বিদ্যমান। গ্রীক শব্দ pais এসেছে হিব্রু শব্দ ebbed থেকে যার প্রাথমিক মানে হচ্ছে servant, তাই pais theou এর সঠিক অনুবাদ হওয়া উচিৎ ছিলো "servant of God, Son of God না। মজার ব্যাপার হচ্ছে যে বাইবেল ঘাটলে দেখা যাবে অন্য আরো বহু চরিত্রকে pais theou হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই শব্দটা নিউ টেস্টামেন্টে এসেছে ৮বার। এর মাঝে পাঁচবার বলা হচ্ছে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, বাকিগুলোতে দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লাম (Lk. 1:69; Acts 4:25) এবং ইসরাইলের ক্ষেত্রে ((Lk. 1:54)। প্রাথমিকভাবে বাইবেলে এই শব্দটার অনুবাদ consistent ছিলো না। যখন ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বলা হয়েছে, তখন Son, যখন অন্যদের কথা বলা হয়েছে তখন Servant! King James Version এ এমনটাই দেখলাম।

তবে আস্তে আস্তে মনে হয় মানুষের মাঝে সচেতনতা বাড়ছে, মানুষকে ধোঁকা দেয়া কঠিন হচ্ছে। তাই রিভাইসড ভার্সনে দেখলাম সবই অনুবাদ করা হয়েছে Servant হিসেবে ☺

একটু চিন্তা করলেই বুঝবো যে এই শব্দটা আসলে আমাদের আব্দুল্লাহ তথা আল্লাহর বান্দার কন্সেপ্টের মতন।

আরেকটা যে গ্রীক শব্দ huios, যেটার অনুবাদ করা হয় Son হিসেবে, সেটাও একটা ভুল অনুবাদ। কারণ Mattew 17:25, Luke 19:9, Matthew 7:9, Matthew 12:27, John 19:26,Matthew 8:12, Luke 10:6, Luke 16:8. এই রেফারেন্সগুলো পড়লেই বোঝা যাবে যে অর্থটা যে আক্ষরিক নয়, metaphorical কারণ এগুলোতে son of kingdom (Matthew 8:12), sons of thunder (Mark 3:17) ও বলা হয়েছ!

ওরা যেহেতু এটাকে Literally নিয়েছে, সেহেতু ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ঊনার সময়ে লেখা হয়েছে Son of God। যখন অন্যান্যদের ব্যাপারে অনুবাদ করা হয়েছে যেমন Luke 3:38(Adam wasthe son of God),2 Samuel 7:13(Solomon was the son of God) এমন কি ইসরাঈলের সবাইকে sons of God বলা হয়েছে।

দুটার মাঝে পার্থক্য কি বোঝা যাচ্ছে? আগেরটাতে Son লেখা হয়েছে বড় হাতের অক্ষরে। কিন্তু কেন এমন করা হয়েছে? কোনো কারণ নেই। বাইবেলের পাণ্ডুলিপিগুলো যেসব ভাষা থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়েছে-আরামাইক, গ্রীক ইত্যাদি এসব ভাষার কোনোটাতেই এই Capitalization এর কনসেপ্ট নাই, তবুও করা হয়েছে স্রেফ ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আলাদা করার জন্য, ওদের মতবাদের সপক্ষে মিথ্যা প্রমাণ উপস্থাপন করার জন্য। এটা বাইবেলের অনুবাদকদের Dishonesty র অনেক গুলা উদাহরণের মাঝে একটি উদাহরণ।

তবে এই Capitalization ছাড়াও ওদেরকে আরো কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়েছে। যেমন ওরা বলা শুরু করেছে যে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম Not made, rather begotten son. এখন আমরা যদি begotten শব্দটার অর্থ দেখি ডিকশনারিতে, তাহলে সেটার অর্থ হচ্ছে নারী ও পুরুষের স্বাভাবিক জৈবিক প্রক্রিয়াতে যে সন্তানের জন্ম তাকেই begotten বল। তাহলে কি ওরা দাবী করে যে আল্লাহ মারইয়ামের সাথে এই প্রক্রিয়ায় লিপ্ত হয়েছিলেন? আস্তাগফিরুল্লাহ ঠিক

কতবার বললে এহেন ধারণা করার গুনাহ থেকেও বাঁচা যাবে আমার জানা নেই। তখন মনে হয় নিশ্চয়ই আমার রাব যথার্থই ব্যাপারটা প্রকাশ করেছেন এভাবে-

তারা বলেঃ দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। (৪৪) নিশ্চয় তোমরা তো এক অদ্ভুত কান্ড করেছ। (৪৯) হয় তো এর কারণেই এখনই নভোমন্ডল ফেটে পড়বে, পৃথিবী খন্ড-বিখন্ড হবে এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচুর্ণ হবে। (৯০) এ কারণে যে, তারা দয়াময় আল্লাহর জন্যে সন্তান আহবান করে।(৯১) অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয়। (৯২) নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে কেউ নেই যে, দয়াময় আল্লাহর কাছে দাস হয়ে উপস্থিত হবে না। (১৯:৮৮-৯৩)

এছাড়াও এখানে একটা মজার ব্যাপার আছে। বাইবেলের অনুবাদকেরা Monogenes শব্দটা অনুবাদ করতে গিয়ে বলেছেন যে এটার মানে only begotten son। এই শব্দটা নিউ টেস্টামেন্টে ৯বার আছে। Luke ৭:১২, ৮:৪২, ৯:৩৮ এগুলোতে এই শব্দ আছে, কিন্তু এখানে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বলা হচ্ছে না। তাই তখন ওরা only begotten son হিসেবে অনুবাদ করে নাই। বাকি জায়গাগুলোতে যখন ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বলা হচ্ছে, তখন only begotten son অনুবাদ করেছে। আরো এক জায়গায় (Hebrew 11:17) ওরা এই শব্দটার অনুবাদ করেছে only begotten son যদিও বা তখন ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বলা হচ্ছে না। কার কথা বলা হচ্ছে কেউ আন্দাজ করতে পারেন?

ইব্রাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লামের only begotten son হিসেবে ইসহাক্ব আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা। কেন? কারণ ওরা ঊনার সন্তান হিসেবে ইসমাইল আলাইহি ওয়াসাল্লামের অস্তিত্বের কথাও অস্বীকার করতে চায়! কেন চায় সেটা তো আমরা এখন নিশ্চয়ই বুঝি। তবে ব্যাপারটাতে অবশ্যই ওরা পুরোপুরি সফল হতে পারে নাই। কারণ Genesis 16:11, 16:15, 17:7, 17:23, 17:25 এরকম অনেকগুলো জায়গায় আল্লাহ নিজে ঊনাকে ইব্রাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছেলে হিসেবে ঘোষণা দিচ্ছেন।

আমার কাছে এটা Intellectual Dishonesty একটা অনেক বড় উদাহরণ। তবে আশার কথা হচ্ছে যে এখনকার অনেক রিভাইসড সংস্করণেই এই বিষয়গুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মানে only begotten son হিসেবে আর অনুবাদ করা হয় নাই।

যাই হোক, এভাবে আরো অনেক যুক্তি দেখানো যায়। যেমন নিউ টেস্টামেন্টের আরেক জায়গায় begotten son এর কথা আছে, কিন্তু সেখানে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা বলা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে দাউদ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা।

I will proclaim the LORD's decree: He said to me, "You are my son; today I have become your father. [Psalm 2:7]

তাহলে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামই শুধু begotten son কিভাবে হলেন?

তবে আমার কাছে সবচেয়ে বড় যুক্তি হচ্ছে ঊনার নিজের কথা। ঊনি নিজে যেখানে সুস্পষ্টভাবে নিজেকে মানুষ হিসেবে দাবী করছেন[23], সেখানে আমি আপনি কে তাকে আল্লাহর ছেলে বলার? আসুন দেখা যাক নিচের রেফারেন্সটা-

but now you are trying to kill me, a man who has told you the truth that I heard from God. This is not what Abraham did.[John 8:40New Revised Standard Version (NRSV)]

আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে যে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আসলেই নিজেকে আল্লাহর ছেলে হিসেবে দাবী করতেন, তাহলে তৎকালীন ইহুদী আইন অনুযায়ী এটা হত ধর্মত্যাগ এবং নিঃসন্দেহে ওরা ঊনাকে সাথে সাথেই হত্যা করতো!

[23] Hasting's Bible Dictionary ("whether Jesus used the term 'Son of God' of himself is doubtful" 11:30). Harper's Bible Dictionary (Jesus never claims for himself the title"Son of God" 11:45).

শিকড়ের সন্ধানে-৫০

আমি যদি এই নোটটা বাংলাদেশে বসে লিখতাম তাহলে হয়তো এটার বিষয়াবলী একটু অন্যরকম হত। আমি এখন যে শহরে থাকি, সেটা একটা চার্চ অধ্যুষিত শহর বললে অত্যুক্তি করা হবে না। এখানে নতুন ছাত্রদের মাঝে 'দাওয়াতী কাজ' করার একটা অভিনব উপায় হচ্ছে তাদেরকে ফ্রি ফার্নিচার দেয়া। কারণ তারা জানে যে নতুন একটা জায়গায় থাকতে আসলে এই জিনিসটাই হচ্ছে অত্যন্ত জরুরী, কিন্তু সাধ্যের বাইরে। তাছাড়া ওরা আরো যেটা করে সেটা হল একদম ঘরে এসে এসে Jesus এর দাওয়াত দেয়-তার ভালোবাসার কথা বলে, কিভাবে তিনি আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্য করেছেন নিজে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে, তাকে আল্লাহর পুত্র হিসেবে বিশ্বাস করলে কিভাবে আমি অনন্তকাল জান্নাতে যেতে পারি ইত্যাদি। আগে থেকেই Comparative Religion এ আগ্রহ ছিলো, রিভার্ট মুসলিমদের কাহিনী প্রচুর পড়েছি তাই মোটামুটি আইডিয়া ছিলো। কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে গভীরভাবে ঘাটাঘাটি করার খোরাক পেয়েছি এখানকার সামাজিক আবহে।

যাই হোক,আমরা গত কয়েক পর্ব ধরে ট্রিনিটি, ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের Divinity, ঊনার ঈশ্বর পুত্র হিসেবে দাবী এগুলো সব কিছু বাইবেলের আলোকে পর্যালোচনা করেছি। কুরআন এগুলোর বিরুদ্ধে যেসব যুক্তি পেশ করছে তার মাঝে যেটা আমার কাছে বেশ শক্তিশালী লাগে সেটা হচ্ছে সমস্ত নবী রাসূলদের প্রচার করা বাণীর অভিন্নতা। পরের একটা পর্বে আমরা দেখবো যে কিভাবে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের ভবিষ্যৎ বাণী করে গেছেন এবং সেটা আজো ওদের বাইবেলে রয়ে গেছে [কিন্তু অবশ্যই ওরা বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করে] একটা হাদীসে পড়েছিলাম যে নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লামও দাজ্জালের ব্যাপারে ঊনার জাতিকে সতর্ক করেছিলেন[24], যদিও আমরা জানি যে দাজ্জাল আসবে একদম শেষ জমানায়! এখন তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেই যে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পুত্র(আস্তাগফিরুল্লাহ) হওয়ার ব্যাপারটা সত্য, তাহলে এটা এমন একটা বিশাল ঘটনা যে আগের সব নবীদের এমনটা

[24] Narrated Ibn Umar: Once Allah's Apostle stood amongst the people, glorified and praised Allah as He deserved and then mentioned the Dajjal saying, "l warn you against him (i.e. the Dajjal) and there was no prophet but warned his nation against him. No doubt, Noah warned his nation against him but I tell you about him something of which no prophet told his nation before me. You should know that he is one-eyed, and Allah is not one-eyed." Bukhari Volume 4, Book 55, Number 553

ঘটার ব্যাপারে ভবিষ্যৎ বাণী করা উচিৎ ছিলো, তাই না? কিন্তু আমরা কোথাও এমন কোনো ইঙ্গিত পর্যন্ত পাই না।

ফিরে আসছি আমাদের মূল আলোচনায়। ট্রিনিটি এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী নিয়ে কথা বলার পর অবধারিতভাবে যে টপিকটা আলোচনায় আসে সেটা হল ঊনার ক্রুশবিদ্ধ হবার ঘটনাটা। সাধারণ কমন সেন্স বলে

যে আল্লাহর ছেলেকে কেন মানুষ ক্রুশবিদ্ধ করতে সমর্থ হবে! সেটা justify করার জন্য ওরা মূলত ২টা

মতবাদের উদ্ভব ঘটিয়েছে- Concept of Original sin and Atonement.

Concept of Original sin মানে আমরা সবাই হয়তো জানি- আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও হাওয়া আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্তৃক আল্লাহর নিষেধ করা গাছের ফল খাওয়া। তারা মনে করে যে এই পাপের ফলেই মানুষ দুনিয়াতে এসেছে, সকল মানুষ জন্মগত ভাবেই পাপী।

আর Atonement মানে হচ্ছে যে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈশ্বর পুত্র হিসেবে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্য করতে। এই মতবাদ অর্থ্যাৎ Jesus, the son of God died on the cross to atone for the sins of mankind ক্রিস্টান ধর্মের একটা আবশ্যকীয় পার্ট। এখান থেকেই ওদের Baptism এর প্রথাটা এসেছে যেখানে একজন নবজাতক শিশুকে Baptized[25]

[25] Baptism is the mystery which transforms the old and sinful person into a new and pure one.Through Baptism a person is united to the Body of Christ by becoming a member of the Orthodox Church. During the service, water is blessed. The catechumen is fully immersed in the water three times in the name of the Holy Trinity. This is considered to be a death of the "old man" by participation in the crucifixion and burial of Christ, and a rebirth into new life in Christ by participation in his resurrection.

Children of Orthodox families are normally baptized shortly after birth. Converts to Orthodoxy are usually formally baptized into the Orthodox Church, though exceptions are sometimes made. Those who have left Orthodoxy and adopted a new religion, if they return to their Orthodox roots, are usually received back into the church through the mystery of Chrismation.

করা হয়, পরবর্তীতে ক্রিস্টান ধর্মের Tenets of faith গুলোতে বিশ্বাস করে অন্য কেউও Baptized হতে পারে।

আজকের পর্বে আমরা শুধু Original sin এর Concept নিয়ে কথা বলবো ইনশাল্লাহ।

ট্রিনিটি, ঈশ্বর পুত্র, ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের Divinity এগুলোর মতই Original sin এর কন্সেপ্টের কোনো সরাসরি রেফারেন্স বাইবেলে পাওয়া যায় না, কোথাও ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনটা বলে যান নাই, যদিও বা বাইবেল অনুসারে তিনি জানতেন যে সামনে ঊনার কঠিন সময় আসছে। তাহলে স্বাভাবিক যুক্তি অনুসারে এই দারুণ গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, যা কী না জান্নাতে যাওয়ার চাবিকাঠি, সেটা কি ঊনার বলে যাওয়া উচিৎ ছিলো না? বরং ঊনি ওদেরকে ধৈর্য্য ধরে সৎ কাজ করে যাওয়ার উপদেশ দিয়ে গেছেন। বরং আমরা এই কনসেপ্টের পুরাপুরি বিপরীত বক্তব্য পাই। কী সেটা?

The person who sins shall die. A child shall not suffer for the iniquity of a parent, nor a parent suffer for the iniquity of a child; the righteousness of the righteous shall be his own, and the wickedness of the wicked shall be his own. [Ezekiel 18:20]

এর চাইতে সুস্পষ্ট বক্তব্য আর কী থাকতে পারে! এছাড়াও আমরা যদি নিচের অংশটা দেখি তাহলে দেখবো যে শিশুদেরকে নবী রাসূলদের বাণীর অভিন্নতার বিষয়টা মাথায় রাখি, তাহলে এই যুক্তিটাও বেশ শক্তিশালী যে কোনো নবী রাসূলই এই ব্যাপারে কিছু বলেন নি কখনো।

কিন্তু Concept of Original sin এর স্বপক্ষে ওদের তো কিছু প্রমাণ থাকতে হবে! ওরা যে দলীল উপস্থাপন করে সেটা হলো নিচেরটা-

The next day John saw Jesus coming toward him and said, “Look, the Lamb of God, who takes away the sin of the world! [John 1:29]

যেহেতু Lamb হচ্ছে যা কুরবানী দেয়া হয়, তাই ওদের দাবী হচ্ছে যে ঊনার কুরবানীর মাধ্যমে পাপ সমূহের প্রায়শ্চিত্য হচ্ছে। আপনাদের যুক্তিবাদী মনে কী বলে? এমন একটা অস্পষ্ট রেফারেন্সের উপর কি নিজের পারলৌকিক পরিণতি ভরসা করা যায়? আমি হলে পারতাম না এত বড় রিস্ক নিতে!

এছাড়াও এই রেফারেন্স নিয়ে অন্য ঘাপলাও আছে। এখানে যে শব্দটার অন্যবাদ করা হয়েছে Lamb, সেটা একটা ভুল অনুবাদ।[26] অরিজিন্যাল আরেমিক শব্দটার অনুবাদ হচ্ছে servant, সেটা কিন্তু বাক্যটার অর্থ একেবারেই বদলে দেয়, বরং ক্রিস্টান ধর্মের মূলে গিয়ে কুঠারাঘাত করে। বাইবেলের অনুবাদকদের Intellectual Dishonesty র উদাহরণের লিস্টে আরো একটা যোগ হল। এটা নিয়ে আরো কথা বলা যায়। নিচের অংশ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে জন জানতেন না ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিচয়। তাহলে কিভাবে ঊনি আগের অংশে বললেন যে ঊনি হচ্ছে Lamb of God?

"Are you the Messiah we've been expecting, or should we keep looking for someone else?" [Matthew 11:3]

তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেয়া হয় যে ঊনি আসলেই দুনিয়া থেকে পাপ মোচনকারী তাহলে অন্যত্র কেন তিনি পরকালের বিচারের দিকে ইঙ্গিত করছেন?

and come out--those who have done what is good will rise to live, and those who have done what is evil will rise to be condemned. [John 5:29]

[26] https://www.youtube.com/watch?v=MtOwmBbRpo0

শিকড়ের সন্ধানে-৫১

original sin এর বিষয়টা নিয়ে আদ্যপান্ত আলোচনা জরুরী ছিলো কারণ এটার উপর ভিত্তি করেই ওরা বলে থাকে যে যীশু সমগ্র মানবতার জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে কখনো এটা দাবী করেন নাই। ওদের ধর্ম গ্রন্থে আজো, স্পষ্ট লেখা আছে যে ঊনি শুধু, শুধুই বনী ইসরাঈলের জন্য এসেছিলেন।

“I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel.” (Matthew 15:24)[1]

ঊনি যখন ঊনার শিষ্যদেরকে পাঠালেন দাওয়াত দেয়ার জন্য তখন স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছিলেন-

When Jesus sent the disciples out in the path of God, he instructed them, “Do not go into the way of the Gentiles, and do not enter a city of the Samaritans. But go rather to the lost sheep of the house of Israel.” (Matthew 10:56)

আমরা যদি আজকের বিশ্বের দিকে তাকাই তাহলে অবাক লাগার মতই ব্যাপার যে যারা ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে personal savior হিসেবে গ্রহণ করেছে তাদের অধিকাংশই Gentile, lost sheep of Israil নয়!

যাই হোক,আলোচনার এই পর্যায়ে এসে আমাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছা করছে যে কুরআন এবং হাদীসে original sin এর ব্যাপারে কী বলা আছে।

আলহামদুলিল্লাহ, ইসলাম আমাদেরকে দ্ব্যর্থহীণ ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছে যে আদম আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দুনিয়াতে পাঠানোর কারণ এটা ছিলনা যে ঊনারা নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছিলেন, বরং ঊনাদেরকে সৃষ্টিই করা হয়েছিল দুনিয়ার জন্য-

আর তোমার পালনকর্তা যখন ফেরেশতাদিগকে বললেনঃ আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি বানাতে যাচ্ছি, তখন ফেরেশতাগণ বলল, আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? (২:৩০)

আবার মানব সন্তান সবাই যে প্রথমে নিষ্পাপ থাকে সেটা আমরা নিচের হাদীস থেকে জানতে পারি-Abu Huraira reported Allaah's Messenger (sallAllaahu alayhi wa sallam) as saying: No babe is born but upon Fitra. It is his parents who make him a Jew or a Christian or a Polytheist (মুসলিমঃ ৬৪২৬)[27]

এতো গেল ধর্মগ্রন্থের বক্তব্য। আল্লাহর দেয়া কমন সেন্স আমাদেরকে কী বলে এই কনসেপ্টটা নিয়ে?

আজকাল যখন নিজেকে নাস্তিক হিসেবে দাবী করা এক ধরণের ফ্যাশন হয়ে গিয়েছে, তখন যারা এমন দাবী করেন তাদেরকে আমার একটা প্রশ্ন খুব করতে ইচ্ছা করে যে আপনি কি justice এ বিশ্বাস করেন? প্রতিটা মানুষ তার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে দেখবেন ন্যায়বিচার প্রত্যাশী। আর আমরা সবাই আমাদের কমন সেন্স+ দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝি যে ন্যায় বিচার বলে কিছু এই দুনিয়াটাতে একেবারেই নেই। আর এই না থাকাটাই আমার কাছে পরকালের অস্তিত্বের সবচেয়ে বড় যৌক্তিক প্রমাণ বলে মনে হয়। বিচার হতে হবে, হতেই হবে.....তাত্ত্বিকভাবে যদি তর্কের খাতিরে মেনে নেই যে শূন্য থেকে এসে শুণ্যে মিলিয়ে যাবো আমরা, তাহলে এই যে এত অন্যায়, খুনাখুনি অপরাধ যারা করছে তারা কি এমনিতেই পার পেয়ে যাবে?

এই দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে ক্রিস্টান ধর্মের এই original sin এর কন্সেপ্টটা কিন্তু ন্যায় বিচারের যে ধারণা, সেটার মূলে গিয়ে কুঠারাঘাত করে। আমার সব পাপের প্রায়শ্চিত্য যদি আরেকজন করে গিয়ে থাকে তাহলে আমার হাজারটা খুন করতে অসুবিধা কোথায়? আর একজন শিশু যে কী না মাত্র পৃথিবীর আলো দেখেছে সে শুরু থেকেই পাপী এটা কেমন কনসেপ্ট? তাই যারা নিজেদেরকে ব্যাপ্টিস্ট ক্রিস্টান হিসেবে দাবী করে আদতে তারা জানে যে এটা সত্য হতে পারে না, কিন্তু তবু তারা মরীচিকার মত এই বিশ্বাসটাকে আঁকড়ে ধরে রাখে, কারণ এতে তারা যেমন খুশি তেমন জীবন যাপনের একটা আধ্যাত্মিক লাইসেন্স পেয়ে যায়।

মজার ব্যাপার হচ্ছে ইসলামের দৃষ্টিতে original sin বলে যদি কিছু থেকে থাকে তাহলে সেটা কী কেউ আন্দাজ করতে পারেন?

---

[27] অনুরূপ কথা নিউ টেস্টামেন্টেও আছে যেটা আরেকটা প্রমাণ original sin প্রত্যাখ্যান করার জন্য।
but Jesus said, “Let the little children come to me, and do not stop them; for it is to such as these that the kingdom of heaven belongs. [Matthew 19:14]

ইবলিশ যখন আল্লাহর আদেশ অনুসারে আদম আলাইহিওয়াসাল্লামকে সিজদাহ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, সেটা। কিন্তু ওদের ধর্মগ্রন্থে এটা একদমই অনুপস্থিত। কেন বলুন তো?

আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব নিজেদের খেয়াল খুশীমত বিকৃত করতে যে তাদের প্ররোচনা দিয়েছে, সে কী চাইবে যে তার পাপের কথা উল্লেখ থাকুক?

এখানে আমাদের একটা জিনিস খুব গুরুত্বের সাথে বোঝা উচিত। আমরা যদি শয়তানের সিজদা করার কাজটাকে বিচ্ছিন্ন করে শুধুই আদম আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজটাকে হাইলাইট করি তাহলে এখান থেকে প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ থেকে বাধাগ্রস্ত হবে। আমাদেরকে বুঝতে হবে যে original sin শুধু একটা কন্সেপ্ট না, এটা জীবনের ব্যাপারে একটা দৃষ্টিভঙ্গী। আমার মনে আছে আমার ছোটবেলায় আমি যুখন আমলে নাজাত টাইপের বই থেকে ইসলাম শিখতাম, তখন সেখানে বিশেষ দুআ থাকতে আসরের ওয়াক্তে পড়ার জন্য, যেটা ছলনাময়ী নারীদের প্ররোচনা থেকে পুরুষদের বাঁচার জন্য পড়তে বলা হত, বলা হত এই টাইমটা বেশী করে ইবাদাতে মশগুল থাকতে। কেন? কারণ খুবই অদ্ভূত! আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কাজটা নাকি করেছিলেন বিবি হাওয়ার প্ররোচনায়! শুধু তাই নয়, বিবি হাওয়া পুরা ফলটা খেয়েছিলেন, তাই মেয়েদের প্রতি মাসে যন্ত্রনাদায়ক এক অভিজ্ঞতার মাঝ দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু আদম আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরাটা খান নাই, গলার কাছে আটকে গিয়েছিল, সেজন্যই ছেলেদের গলার মাঝখানের উঁচু অংশটাকে Adam's Apple বলে! সুবহানাল্লাহ! ক্রিস্টান ধর্মের উপকথা কিভাবে আমাদের মাঝে অনুপ্রবেশ করেছে। এসব বই থেকে ইসলাম শেখা হয় বলেই হয়তো এত তরুণ তরুণী ইসলাম বিদ্বেষী হয়ে বেড়ে ওঠে!

বহু বছর পর আমি যখন সূরা বাক্বারাতে বর্ণনা করা কাহিনীটা আরবীতে পড়লাম, তখন আমি অবাক বিস্ময়ে খেয়াল করলাম যে আল্লাহ জানাচ্ছেন যে তাদের উভয়ে

ۖ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ

অনন্তর শয়তান তাদের উভয়কে ওখান থেকে পদস্খলিত করেছিল। (২:৩৬)

আরবী ভাষা সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান থাকলেই আমরা বুঝবো যে এখানে দ্বিবচন ব্যবহার করা হয়েছে।এই কাহিনীর যে অংশটা সবচেয়ে, সবচেয়ে বড় শিক্ষণীয়, সেটা হল যে ভুল দুইজনের দ্বারাই হয়েছিল-মানুষ এবং শয়তান। কিন্তু মানুষ সাথে সাথে তওবা করেছিলো, শয়তান করে নাই। তাই ভুল করাটা ইস্যু না, ভুল করার পর আমাদের প্রতিক্রিয়াটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ।

আরো একটা পয়েন্ট আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ লেগেছে- শয়তানের অপরাধের মূল কারণ- আরবীতে যেটাকে বলা হচ্ছে ইস্তিকবার, যেটার অর্থ হচ্ছে Extreme desire to get recognition. একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখবো যে এই অনুভূতিটা অনেক বড় বড় পাপের উৎস। আমাদের হয়তো ইউসুফ আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাহিনী মনে আছে, ঊনার ভাইদের এই Sibling Rivalry মূলে ছিলো ইয়াকুব আলাইহি ওয়াসাল্লাম তথা ঊনাদের বাবার কাছ থেকে Undivided attention পাওয়ার তীব্র ইচ্ছা। মোটা দাগে একে হিংসা/ অহংকার বললে আমরা হয়তো নিজেদের সংশোধন করতে পারবো না ঠিক মত। ইস্তিকবার এর চেয়েও সূক্ষ্মতম অনুভূতি। এখানে সবচেয়ে ভয়ে ব্যাপার হচ্ছে শয়তান লালায়িত ছিলো Religious Honor এর জন্য, দুনিয়ার না কিন্তু!

আমাদের কি মনে আছে যে এই ধর্মীয় মর্যাদার মোহটা ছাড়তে পারে নাই বলেই ইহুদীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করার মত কুফরী করতে পেরেছিলো? আমার দৃষ্টিতে original sin তাই ইস্তিকবার। এটা একটা রোগ, এটা আক্রমণ করতে পারে আমাদের যে কাউকে, যে কোনো সময়ে, ঠিক শয়তানের মতই এটা বছরের পর বছর ধরে করে আসা আমলকে ধূলিস্যাত করে দিতে পারে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে এটা থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক্ব দিন, আমীন।

শিকড়ের সন্ধানে-৫২

আজকের পর্বে আমরা কথা বলবো ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার বিষয়টা। প্রথমে আমরা বোঝার চেষ্টা করবো যে ক্রিস্টানরা এব্যাপারটা নিয়ে কী ভাবে। এ ব্যাপারে কথা বলার আগে আমাদের জেনে নেয়া দরকার যে এই সময় ঘটনাটা Exactly কিভাবে ঘটেছিলো তা কুরআন ও হাদীস থেকে আমরা কিছু জানতে পারি না। আমরা বিশ্বাস করি যে আমাদের জন্য এটা অপ্রয়োজনীয়, সেজন্যই আল্লাহ আমাদেরকে জানান নাই। কিন্তু ক্রিস্টানদের এসংক্রান্ত বিশ্বাস বুঝতে হুলে আমাদেরকে কিছুটা নির্ভর করতে হবে অনির্ভরযোগ্য গসপেল সমূহের উপরেই।

ক্রিস্টানদের গসপেল অনুসারে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ১২ জন শিষ্য ছিল (এই সংখ্যা ঠিক না ভুল আমরা জানি না)। এনাদের মাঝে একজন বিশ্বাস ঘাতকতা (Judas নাম) করে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ধরিয়ে দিয়েছিলো রোমান সৈন্যদের কাছে। ঊনার বাকি শিষ্যরা ঊনি গ্রেফতার হওয়ার পর ঊনাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলো।

"... **and they all forsook him and fled.** And there followed him a certain young man, having a linen cloth cast about **his** naked **body**; and the young men laid hold on him: and he left the linen cloth, and fled from them naked." (Mark 14: 50, 51, 52)[28]

ক্রিস্টানরা দাবী করে যে শত শত মানুষ নাকি যীশু ক্রিস্টের এই ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছে। কিন্তু ওদের গসপেল থেকেই জানা যাচ্ছে যে রোমান সৈন্যরা বাদে মাত্র কয়েকজন মহিলা এটা দেখেছিলো।

"And many women were there beholding afar off, which followed Jesus from Galilee, ministering unto him; among which was Mary Mag'dalene, and Mary the mother of James and Joses, and the mother of Zeb'edee's children."

[28] আরো আছে Matthew 26: 56, 57

(Matthew 27: 55, 56) [29]

বাইবেল থেকে এটা পরিষ্কার যে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিষ্যদের মাঝখান থেকে কেউ এই ঘটনা দেখে নাই। এরপর কী হয়েছিলো? ওদের বিশ্বাস অনুসারে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ক্রুশবিদ্ধ করার পর যেখানে কবর দেয়া হয়েছিল, ঊনার একজন অনুসারী [Mary Magdalene][30] সেখানে যান এবং কবরটা শূন্য দেখতে পান। সেখানে ফেরেশতা দেখতে পান তারপর ৪০দিন সময়ের মাঝে ঊনি ঊনার বিভিন্ন অনুসারীদের মাঝে দেখা দেন।

[And came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many] **(Matthew 27:53)**

এখান থেকেই ওদের বিশ্বাস হচ্ছে যে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর ঊনি resurrected হয়েছিলেন এবং ঊনি ফেরেশতাদের সাহায্যে ঊর্ধ্বে গমন করেন। ওরা ঊনার 2nd coming এ বিশ্বাস করে,দ্বিতীয়বার এসে ঊনি ঊনার সম্পূর্ণ মিশন সম্পন্ন করবেন অর্থ্যাৎ ন্যায়বিচার পূর্ণ God's Kingdom দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করবেন। এই resurrection[31] এর ঘটনাটা ওদের ধর্মের

---

[30] আরো আছে (Mark 15: 40, 41).

[30] আমরা অনেকেই হয়তো জানি যে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলে God না বা Divine না এটা নিয়ে পশ্চিমা ক্রিস্টানদের মাঝে অনেক গল্প কাহিনী লেখা হয়েছে। Dan Brown এর The Vinci code হয়তোবা অনেকেই পড়েছেন। এসব অনেক বইতেই ঊনাকে মানুষ হিসেবে দেখানোর জন্য এই Mary Magdalene এর সাথে ঊনার রোমান্টিক সম্পর্ক দেখানো হয়। নিশ্চয়ই আমরা এ ব্যাপারে কিছু জানিনা এবং চুপ থাকাটাই শ্রেয় মনে করি।

[31] The resurrection of Jesus is the Christian religious belief that, after being put to death, Jesus rose again from the dead. It is the central tenet of Christian theology and part of the Nicene Creed: "On the third day he rose again in accordance with the Scriptures".

According to the New Testament, after the Romans crucified Jesus, he was anointed and buried in a new tomb by Joseph of Arimathea but God raised him from the dead and he appeared to many people over a span of forty days before he ascended into heaven, to sit at the right hand of God. Christians celebrate the resurrection of Jesus on Easter Sunday, two days after Good Friday, the day of his crucifixion.

অত্যাবশ্যকীয় অংশ, এটা উপলক্ষেই ওরা Easter Sunday উদযাপন করে, যেটার কথা আমরা অনেকেই হয়তোবা জানি!

এটা থেকে আমরা বুঝলাম যে some sort of Ascension এর concept ওদের মাঝে আছে। কিন্তু এটা থেকেই মূলত ঊনারা ঊনার প্রতি Divinity Ascribe করে। আর সেজন্যই ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা ব্যাখ্যা করার জন্য ওদের Original sin এবং He was sent for all the mankind and died on the cross to atone for their sins এইসব কন্সেপ্টের দরকার হয়। এখন ডঃ লরেন্স ব্রাউন, যার কথা আমি সবসময় বলি এবং যার রিসোর্স আমি মূলত সিরিজের এই পার্ট লিখতে গিয়ে ব্যবহার করেছি, ঊনি ঊনার আর্টিকেলে দেখিয়েছেন যে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই resurrection এর যেসব কাহিনী গসপেলে আছে সেগুলোর মাঝে এত বৈপরীত্ব আছে যে সেগুলা থেকে কোনো ফ্যাক্ট খুঁজে পাওয়া কিংবা সেগুলোতে বিশ্বাস করা কোনো যুক্তিবাদী মনের পক্ষে খুবই কঠিন। যাদের আগ্রহ আছে, তারা লেখাটা এখানে পড়ে দেখতে পারেন https://www.islamreligion.com/articles/1774/religious-mysteries-101-crucifixion/

এখানে আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে যে বাইবেলের অন্যান্য অংশ থেকে পরোক্ষভাবে বোঝা যায় যে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্রুশবিদ্ধ হন নাই, ঊনি ঊনার অনুসারীদের বলেছেন যে ঊনি ঊর্ধ্বে গমন করবেন। নিচে আমরা এমন কিছু রেফারেন্স দেখবো

41 Then he withdrew from them about a stone's throw, knelt down, and prayed, 42 "Father, if you are willing, remove this cup from me; yet, not my will but yours be done." [[43 Then an angel from heaven appeared to him and gave him strength. 44 In his anguish he prayed more earnestly, and his sweat became like great drops of blood falling down on the ground. [luke 22:41-44]

অর্থ্যাৎ ঊনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছেন[32] যে মৃত্যু যেন ঊনার কাছ থেকে সরায় নেয়া হয় এবং তখনই ফেরেশতার আগমন ঘটে। এটা থেকে আমরা বুঝি যে আল্লাহ ঊনার প্রার্থনা ক্ববুল করেছিলেন। আল্লাহ যে দুআ ক্ববুল করেছিলেন এটা অন্যত্র উল্লেখও করা আছে-

[32] এটা আরেকটা রেফারেন্স ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের Divinity প্রত্যাখ্যান করার জন্য।

“In the days of his flesh, Jesus offered up prayers and supplications, with loud cries and tears, to the one who was able to save him from death, and he was heard because of his reverent submission” (Hebrews 5:7, NRSV)

এর চেয়ে আরো সরাসরি রেফারেন্সও পাওয়া যায়-

[11] For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways;12 they will lift you up in their hands, so that you will not strike your foot against a stone. Psalm 91:11-12New International Version (NIV)

এই অংশ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে ফেরেশতারা ঊনাকে সবসময় রক্ষা করবেন, কোনো পাথরের উপর পা রাখতেও দেবেন না (ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার শুরুর প্রসেস) এবং উপরে তুলে নিয়ে যাবেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা। গত কয়েক পর্ব ধরে আমরা নিশ্চয়ই বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে বাইবেলে যা আছে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ক্রিস্টানদের বর্তমান মতবাদের সাথে বিরোধিতাপূর্ণ। তারপরও শত শত বছর ধরে এমনটা চলছে সেটার কারণ কী? কঠিন প্রশ্নের সহজ উত্তর! ওরা বাইবেল পড়ে না, পোপ-পাদ্রীরা যা বলে সেটা অন্ধভাবে বিশ্বাস করে!

শিকড়ের সন্ধানে-৫৩

গত পর্ব পড়ার পর নিশ্চয়ই আমাদের বিস্তারিত জানতে ইচ্ছা করছে যে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে ইসলাম আমাদেরকে কী বলে।মুসলিম হিসেবে এটাতো আমাদের সবারই জানা যে কুরআন আমাদেরকে দ্ব্যর্থহীণ ভাষায় জানিয়ে দিচ্ছে যে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা বা ক্রুশবিদ্ধ কোনোটাই করতে তারা সক্ষম হয়নি। যেসব আয়াতে এই বিষয়গুলো উল্লেখ করা আছে সেটা হচ্ছে সূরা ইমরানের ৫৫ নং আয়াত, নিসার ১৫৭-৫৮ নং আয়াত। তবে এই আয়াতগুলো নিয়ে কথা বলার আগে আমি নিজের কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে চাই যা এই আয়াতগুলো নিয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে আমার হয়েছে।

আমি যখন ডঃ লরেন্স ব্রাউনের Misgoded বইটা পড়ছিলাম তখন আমার মনে হচ্ছিল যে ক্রিস্টানদেরকে কি আসলে খুব দোষ দেয়া যায় কী না। ওরা অনুবাদ পড়ছে, ওরা কিভাবে বুঝবে যে গ্রীক পাণ্ডুলিপি থেকে selective translation করা হয়েছে? গ্রীক ভাষার জ্ঞান তো আজকের বিশ্বে খুব প্রচলিত জ্ঞানও না। আমরা কি আশা করতে পারি যে প্রতিটা মানুষ চেক করবে আদি পাণ্ডুলিপি? বাইবেলের অনুবাদকদের, পোপ, পাদ্রী এদেরকে যদি এইটুকু বিশ্বাস না করা যায় তাহলে পুরা ধর্ম ব্যবস্থাটাই তো ভেঙ্গে পড়বে! এটা ভাবতে গিয়েই আমার মনে হচ্ছিল মুসলিম হিসেবে আমাদের অবস্থা কি খুব আলাদা? আজকাল কেউ যদি কুরআনের ভুল অনুবাদ করে, অপব্যাখ্যা করে, তাহলে আমাদের কি বোঝার উপায় আছে ভুলটা?

এটা ভাবতে গিয়েই মনে হল যে আমরা অনেক সময়ই অভিযোগ করি যে কুরআন আল্লাহ কেন আরবী ভাষায় নাযিল করলেন যেটা কী না অনেক কঠিন! অথচ আমরা চিন্তা করি না যে এটা আল্লাহর অশেষ রহমত যে আরবী আজো একটা জীবন্ত ভাষা, বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ এই ভাষায় কথা বলে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আল্লাহ নিজে বলছেন যে উনি কুরআন শেখা আমাদের জন্য সহজ করে দিবেন (৫৪:১৭)। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে যে আমরা আল্লাহর ওয়াদায় বিশ্বাস করি না?

এই কথাগুলো এখন বলছি কারণ আমরা অনেকেই হয়তো জানি যে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উপরে তুলে নেয়া সম্পর্কিত আয়াতগুলো নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপচেষ্টা করা হয়। ২০০৯ সালের দিকে আমি যখন ইসলাম প্র্যাক্টিস করা শুরু করি, আমার মনে আছে যে তখন দেশে ক্বাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করা নিয়ে খুব তোলপাড় চলছিল। আমি তখন মাত্র ইসলাম

নিয়ে পড়াশোনা করা শুরু করেছি, এদের নামও শুনিনি আগে। তখন ওরা প্রায়ই যেটা করতো সেটা হল রাতের অন্ধকারে বাসার নিচ দিয়ে ওদের লিফলেট দিয়ে যেত, যেখানে থাকতো যে ওরা কেন মুসলিম, ওদের বিশ্বাসের মূলনীতিগুলো, সেগুলোর যৌক্তিকতা ইত্যাদি। (যেমন ওরা গোলাম রাহমান কাদ্বিয়ানীকে নবী ভাবে, ঊনাকে মাসীহ হিসেবে দাবী করে, কুরআনের উল্লেখিত আয়াতগুলো থেকে প্রমাণ করতে চায় যে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যু হয়েছে ইত্যাদি।) আমি যেহেতু তখন কিছুই জানি না, তাই একটা সফট কর্নার তৈরি হয়েছিলো, অস্বীকার করবো না। তখন ওদের বিশ্বাসের স্তম্ভগুলোর তীব্র বিরোধিতা করে খুব কড়া ভাষায় লেখা একটা বই পড়েছিলাম, পড়ে আমার লেখকের উপরেই মেজাজ খারাপ হয়েছিলো।

কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমতে তখন ইন্টারনেটে ঘাঁটাঘাটি করে ওদের ভুলগুলো বুঝতে পেরেছিলাম। তাই এ সংক্রান্ত রিসোর্স যে ইন্টারনেটে আছে, সেটা আমি জানতাম। এবার শিকড়ের সন্ধানের এই পর্ব লিখতে গিয়ে আজকের আমি যখন ঐ রিসোর্সগুলো আবার পড়তে লাগলাম, তখন আমি বুঝলাম যে সেগুলো আসলে কতটা unconvincing! আমি তখন alternative explanation খুঁজছিলাম, আলহামদুলিল্লাহ, পেয়েও গেলাম। বায়্যিনাহ টিভিতে Cover to Cover একটা সিরিজ আছে যেটাতে উস্তাদ নু'মান আলী খান পুরা কুরআনের মোটামুটি একটা গ্রামাটিক্যাল অ্যানালাইসিস করেছেন। এখন যেহেতু অ্যারাবিকের মোটামুটি একটা working knowledge আছে, তাই ঊনার ব্যাখ্যাটা বুঝতে পারলাম। সুবহানাল্লাহ, আমি যেন নতুন করে উপলব্ধি করলাম যে আরবী কুরআন হচ্ছে কুরআন, কুরআন আরবীতে বুঝলে কেউ আমাকে ইচ্ছামত অনুবাদ অথবা অপব্যাখ্যা করে বিভ্রান্ত করতে পারবে না ইনশাল্লাহ!

এই অনুভূতি আসতেই মনে পড়ল মারইয়াম জামিলার কথা। আমরা অনেকেই হয়তো জানি যে কুরআন বলেই দিচ্ছে যে খুব অল্প সংখ্যক ইহুদী ইসলাম accept করবে। এই ভবিষ্যৎ বাণীটাই আমার কাছে কুরআনের একটা মিরাক্যল মনে হয়। এখন এ ব্যাপারে আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে যে যারা গ্রহণ করেন ইসলাম, তারা সাধারণত একেকটা asset হন। আমার কাছে মারইয়াম জামিলা তেমন একজন asset। ইসলামের একদম প্রাথমিক সময়ে ঊনার Islam and the west, Islam and Orientalism ইত্যাদি বইগুলো আমাকে অনেক কিছু বুঝতে শিখিয়েছিলো। মনে নাই কোনটা, তবে কোনো একটা বইতে ছিলো যে মুসলিম বিশ্বে colonialization এর মাধ্যমে সবচেয়ে বড় যে ক্ষতিটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে ভাষা হিসেবে আরবীকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে সূক্ষ্ম ও সুদূর প্রসারী পরিকল্পনার মাধ্যমে। এর জের মুসলিম উম্মাহ আজো পোহাচ্ছে। ঊনি এই বিষয়টি দেখিয়েছিলেন ইহুদী ও ক্রিস্টানদের ইতিহাস পর্যালোচনা করে। তখন কথাটা

পড়ে আমি চমকে উঠেছিলাম, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আরবী শেখার। আজকে এই আয়াতগুলো নিয়ে পড়তে গিয়ে আবারো ঊনার বক্তব্যের প্রজ্ঞা টের পেলাম। এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা না বললেই নয়- আমরা হয়তো ওরিয়েন্টালিস্টদের ব্যাপারে জানি, এদের কাজই ছিলো ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করে ইসলামের ভুল প্রচার করা। IOU তে আমরা ওরিয়েন্টালিস্টদের নিয়ে অনেক কিছু পড়েছি। সেখানে শেখা একটা জিনিস খুব শেয়ার করতে ইচ্ছা করছে- আজকাল জাকির নায়েক বা অন্যান্য অনেক বক্তাকে দেখা যায় যে কুরআন/ হাদীসের বিভিন্ন আয়াতের মাঝে apparent conflict গুলো ব্যাখ্যা দিতে দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রশ্নকারী হয় মুসলিম, ইন্টারনেটে হয়তোবা ইসলাম নিয়ে সার্চ দিয়েছে, প্রথমেই ইসলাম বিরোধী সাইটগুলো এসেছে, কনফিউজড হয়ে গেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই apparent conflict গুলো খুঁজে বের করলো কে? ওরিয়েন্টালিস্টরা?

উত্তর হচ্ছে না। ইসলামের ক্ল্যাসিকাল যুগে আমাদের আলিমরাই এগুলো নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং apparent conflictগুলো যে আসলে কোনো conflict ই না সেগুলো ব্যাখ্যা করে বই লিখেছেন। ওরিয়েন্টালিস্টরা করেছে কী, সেইসব বই থেকে শুধু apparent conflict গুলো তুলে ধরে আলাদা বই লিখেছে নিজেদের ভাষায়, আমাদের আলিমদের লেখা রিসোর্স ব্যবহার করেছে ইসলামকে হেয় প্রমাণে। শতাধিক বছর ধরে চালানো তাদের এই প্রচেষ্টা হয়তো পশ্চিমাদের কাছে সফল হয়েছে, কিন্তু মুসলিমদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারে নি। কেন?

কারণ মুসলিমরা খুব ভালো করে আলিমদের লেখার সাথে পরিচিত ছিলো। যখনই ওরা apparent conflict এর দিকে অঙ্গুলি হেলন করেছে, মুসলিমরা আলিমদের লেখা যুক্তি দিয়ে ওদেরকে খণ্ডন করেছে।

তাহলে কখন মুসলিম উম্মাহ এগুলো দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া শুরু করেছে? যখন থেকে ক্ল্যাসিকাল রিসোর্সের সাথে মুসলিমদের সেতুবন্ধন ভেঙ্গে গেছে। কখন এটা হয়েছে? যখন থেকে আরবী আর মুসলিমদের প্রধান ভাষা নেই!

জানিনা এই কথাগুলো বলা অপ্রয়োজনীয় হল কী না, তবে এই আয়াতগুলো পড়তে গিয়ে আমি যেন বুকের গভীর থেকে আবারো অনুভব করেছি আরবী জানার আবশ্যকীয়তা, এ যেন কোনো luxury নয়, অপরিহার্য!

আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো আগামী পর্বে আমার এই অনুভূতিটা ভাষায় প্রকাশ করতে, এই আয়াতগুলোর বিশ্লেষণ পড়তে গিয়ে পাঠকরাও যেন আরবী শেখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারেন।

শিকড়ের সন্ধানে-৫৪

আগের পর্বে বলেছি যে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের Ascention এর কথা উল্লেখ আছে কুরআনের ৩টা আয়াতে- সূরা ইমরানের ৫৫ নং আয়াত, নিসার ১৫৭-৫৮ নং আয়াত এবং সূরা মায়িদার ১১৭ নং আয়াত। ইচ্ছা করেই এই আয়াতগুলোর ক্ষেত্রে আমি আরবীটা, ইন্টারনেটে পাওয়া যায় এমন দুটো বাংলা অনুবাদই উল্লেখ করছি-

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّـهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ **وَلَـٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ** ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ
اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَّفَعَهُ اللَّـهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ
اللَّـهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٥٨﴾ (8:১৫৭-৫৮)

জহুরুল হক্কের অনুবাদঃ

আর তাদের বলার জন্য -- "আমরা নিশ্চয়ই কাতল করেছি মসীহ্‌কে, -- মরিয়ম-পুত্র ঈসাকে" আল্লাহ্‌র রসূল, আর তারা তাঁকে কাতল করে নি, আর তারা তাঁকে ক্রুশে বধও করে নি, কিন্তু তাদের কাছে তাঁকে তেমন প্রতীয়মান করা হয়েছিল। আর নিঃসন্দেহ যারা এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করছিল, তারা অবশ্য তাঁর সম্বন্ধে সন্দেহের মধ্যে ছিল। এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই অনুমানের অনুসরণ ছাড়া। আর এ সুনিশ্চিত যে তারা তাঁকে হত্যা করে নি। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ তাঁকে তাঁর দিকে উন্নীত করেছেন। আর আল্লাহ্‌ হচ্ছেন মহাশক্তিশালী, পরমজ্ঞানী।

মুহিউদ্দীন খানের অনুবাদঃ

আর তাদের একথা বলার কারণে যে, আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহর রসূল। অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছে, আর না শুলীতে চড়িয়েছে, বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুতঃ তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধুমাত্র অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোন খবরই রাখে না। আর নিশ্চয়ই তাঁকে তারা হত্যা করেনি। বরং তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা নিজের কাছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

إِذْ قَالَ اللَّـهُ يَا عِيسَىٰ **إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ** وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ
الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ *(৩:৫৫)*

জহুরুল হক্কের অনুবাদঃ

স্মরণ করো! আল্লাহ্ বললেন -- "হে ঈসা, আমি নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু ঘটাব, এবং আমি তোমাকে আমার দিকে উন্নীত করবো, আর তোমাকে পরিশোধিত করবো যারা অবিশ্বাস পোষণ করে তাদের থেকে, আর যারা তোমায় অনুসরণ করবে তাদের আমি স্থান দেবো যারা অবিশ্বাস পোষণ করে তাদের উপরে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত, এরপর আমারই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থান, আর আমি তোমাদের মধ্যে বিচার করবো যে-বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছিলে সেই বিষয়ে। (৩:৫৫)

মুহিউদ্দীন খানের অনুবাদঃ

আর স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বলবেন, হে ঈসা! আমি তোমাকে নিয়ে নেবো এবং তোমাকে নিজের দিকে তুলে নিবো-কাফেরদের থেকে তোমাকে পবিত্র করে দেবো। আর যারা তোমার অনুগত রয়েছে তাদেরকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যারা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাদের উপর জয়ী করে রাখবো। বস্তুতঃ তোমাদের সবাইকে আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে। তখন যে বিষয়ে তোমরা বিবাদ করতে, আমি তোমাদের মধ্যে তার ফয়সালা করে দেবো। (৩:৫৫)

فَلَمَّا ۖ فِيهِمْ دُمْتُ مَّا شَهِيدًا عَلَيْهِمْ وَكُنتُ ۚ وَرَبَّكُمْ رَبِّي اللَّـهَ اعْبُدُوا أَنِ بِهِ أَمَرْتَنِي مَا إِلَّا لَهُمْ قُلْتُ مَا
شَهِيدٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَىٰ ۚ وَأَنتَ عَلَيْهِمْ الرَّقِيبَ أَنتَ كُنتَ **تَوَفَّيْتَنِي**

জহুরুল হক্কের অনুবাদঃ

"আমি তাদের বলি নি তুমি যা আমাকে আদেশ করেছ তা ছাড়া অন্য কিছু, যথা -- 'তোমরা আল্লাহ্‌র উপাসনা করো যিনি আমার প্রভু ও তোমাদের প্রভু', আর আমি তাদের সাক্ষী ছিলাম যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম, কিন্তু যখন তুমি আমার মৃত্যু ঘটালে তখন তুমিই ছিলে তাদের উপরে প্রহরী। আর তুমিই হচ্ছো সব-কিছুরই সাক্ষী। (৫:১১৭)

মুহিউদ্দীন খানের অনুবাদঃ

আমি তো তাদেরকে কিছুই বলিনি, শুধু সে কথাই বলেছি যা আপনি বলতে আদেশ করেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহর দাসত্ব অবলম্বন কর যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ পরিজ্ঞাত।(৫:১১৭)

আমরা প্রথমে আলোচনা করবো সূরা আল ইমরানের এই ৫৫ নং আয়াত এবং সূরা মায়িদার ১১৭ নং আয়াতটা নিয়ে। ক্বাদিয়ানীরা যখন প্রমাণ করতে চায় যে ঈসা আলাইহিওয়াসাল্লামের মৃত্যু

হয়েছে, ওরা এই আয়াতগুলোকে ব্যবহার করে। আমরা হয়তো জানি যে বিভ্রান্ত গ্রুপগুলোর জন্য সবচেয়ে কমন কৌশল হচ্ছে স্পষ্ট আয়াতগুলোকে এড়িয়ে গিয়ে অস্পষ্ট আয়াতগুলোকে ব্যবহার করা। এক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয় নি। আল্লাহ সূরা নিসার ১৫৭ নং আয়াতে যতটা স্পষ্টভাবে সম্ভব, সেভাবে ঘোষণা দিচ্ছেন যে ওরা ঈসা আলাইহিওয়াসাল্লামকে হত্যা করে নি, শূলেও চড়ায় নি। যাই হোক, এখানে যেই শব্দটা নিয়ে ওরা কাটাছেঁড়া করে, সেটা হল **مُتَوَفِّيكَ** (৩:৫৫) এবং **تَوَفَّيْتَنِي** (৫:১১৭)। দুটা শব্দই একই মূল ধাতু থেকে এসেছে, তাই আমরা ৩:৫৫ কে ভিত্তি করেই আলোচনা চালিয়ে যাবো। খেয়াল করলে দেখবো যে জহুরুল হক দুই ক্ষেত্রেই ঊনার অনুবাদে এটার অনুবাদ করেছেন তোমার মৃত্যু ঘটাবো, যেটা আসলে কাদ্বিয়ানী ব্যাখ্যা। মুহিউদ্দীন খানের ৩:৫৫ এর অনুবাদে আছে তোমাকে নিয়ে নেবো, যেটা অনেকটা আক্ষরিক অনুবাদ। ইংরেজী অনুবাদ গুলোতেও বলা হয়েছে Will Take you। ব্যাপারটা তাহলে কী?

আমরা এটা পর্যালোচনা করবো আরবী ব্যাকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে। **مُتَوَفِّيكَ** আসলে ২টা শব্দ **كَ** এখানে Attached pronoun. **مُتَوَفِّي** একটি ফীল মুদারি যার অর্থ বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ দুটাই হতে পারে। এই শব্দটার মূল ধাতু হচ্ছে **تَوَفّ** যার আভিধানিক অর্থ to take in full. তাহলে উক্ত আয়াতটার অর্থ দাঁড়াচ্ছে ইয়া ঈসা I am taking you away fully. এখন এমনিতে সাধারণভাবে মোটামুটি সব ভাষাতেই taking away মানে মারা যাওয়া। ধরেন যদি কেউ বলে যে My parents were taken in an accident, সবাই বুঝবে যে তার মা-বাবার মৃত্যু ঘটেছে। তবে এই যুক্তিতো আসলে কুরআনের ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য খাটে না।

এর আগে অন্য পর্বে আমি উল্লেখ করেছি কিভাবে কুরআনের এক অংশ আরেক অংশকে ব্যাখ্যা করে। ক্বাদিয়ানীরা এই জায়গায় এসে এই মূলনীতি ব্যবহার করছে। কুরআনের অন্যত্র এই **تَوَفّ** শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে ফেরেশতারা যখন আত্মাকে তুলে নিয়ে যায় তখন। সূরা যুমারের ৪২ নং আয়াতে আছে-

اللَّـهُ **يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ** حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا

আল্লাহ মানুষের প্রাণ হরণ করেন তার মৃত্যুর সময়, আর যে মরে না, তার নিদ্রাকালে।

তারা এই যুক্তি দেখিয়ে বলে যে ঈসা আলাইহিওয়াসাল্লামের মৃত্যু ঘটেছে। উস্তাদ নুমান আলী খান যেটা বলছেন সেটা হচ্ছে যে কুরআন থেকেই বোঝা যায় যে **تَوَفّ** শব্দটা in an itself মৃত্যুকে বোঝায় না। ঊনি প্রমাণ হিসেবে বলছেন সূরা নিসার ১৫ নং আয়াত- حَتَّىٰ **يَتَوَفَّاهُنَّ** الْمَوْتُ যে

পর্যন্ত মৃত্যু তাদেরকে তুলে না নেয়। যদি **تَوَفّ** মানেই মৃত্যু হত তাহলে আলাদা করে الْمَوْتُ (মাওত) শব্দটা উল্লেখ করার দরকার ছিলো না।

এখন আমার খুব সামান্য পড়াশোনা থেকে মনে হচ্ছে যে সূরা নিসার আয়াতটা খুবই প্রাসঙ্গিক হলেও সূরা যুমারের আয়াত থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে এই তুলে নেয়ার ব্যাপারটা শুধু মৃত্যুর সময়েই ঘটে না, ঘুমের সময়েও ঘটে। খুব, খুব স্পষ্ট করে আল্লাহ ঘুমের সময়ের এবং মৃত্যুর সময়ের আত্মা তুলে নেয়ার মাঝে পার্থক্যটা তুলে ধরেছেন। ঘুমের সময়ের এই তুলে নেয়ার কথা সূরা আনআমের ৬০ নং আয়াতেও আছে-

وَهُوَ الَّذِي بِاللَّيْلِ **يَتَوَفَّاكُم** যেটার অর্থ হচ্ছে তিনিই রাত্রি বেলায় তোমাদেরকে করায়ত্ত করে নেন। এখান থেকে আমরা কী বুঝি? যখন আল্লাহর **تَوَفّ** শব্দ দ্বারা মৃত্যু/ঘুম বোঝাচ্ছেন তখন কী বুঝাচ্ছেন সেটা আয়াতের অন্যান্য অংশ থেকে সেটাকে স্পষ্ট করে দিচ্ছেন। যখন কিছুই বুঝাচ্ছেন না, তখন আল ইমরানের ৫৫ নং আয়াতের অনুবাদ করতে হবে আক্ষরিক-I am taking you away fully.

কিন্তু এটার মানে কী আসলে? taking you away fully দ্বারা কী বুঝাচ্ছেন আল্লাহ? আমরা সেটা বোঝার চেষ্টা করবো পরের পর্বে ইনশাল্লাহ।

শিকড়ের সন্ধানে-৫৫

সূরা আল ইমরানের ৫৫ নং আয়াতে **مُتَوَفِّيكَ** বলতে আসলে কী বুঝানো হচ্ছে সেটা আয়াতের পরের অংশেই বলে দেয়া হচ্ছে- **وَرَافِعُكَ إِلَيَّ** যার মানে হচ্ছে And I am raising you to myself. এই অংশটা নিয়ে ক্বাদিয়ানীরা বলে যে এটার মানে হচ্ছে To raise in rank or elevate in status. প্রমাণ হিসেবে তারা উপস্থাপন করে নিচের আয়াতটি-

عَلِيًّا مَكَانًا وَرَفَعْنَاهُ ﴿٥٦﴾ نَّبِيًّا صِدِّيقًا كَانَ إِنَّهُ ۚ إِدْرِيسَ الْكِتَابِ فِي وَاذْكُرْ

মুহিউদ্দীন খানের অনুবাদঃ

এই কিতাবে ইদ্রীসের কথা আলোচনা করুন, তিনি ছিলেন সত্যবাদী নবী। আমি তাকে উচ্চে উন্নীত করেছিলাম। (১৯:৫৬-৫৭)

জহুরুল হক্কের অনুবাদঃ

আর কিতাবখানাতে ইদ্‌রীসের কথা স্মরণ করো। নিঃসন্দেহ তিনি ছিলেন সত্যপরায়ণ, একজন নবী। (56) আর আমরা তাঁকে উন্নীত করেছিলাম অত্যুচ্চ পর্যায়ে।(১৯:৫৬-৫৭)

ওদের কথা হচ্ছে যে **رَافِعُ** মানে জীবিত তুলে নেয়া নয়,সম্মানিত করা, যেমনটা ইদ্রিস আলাইহিওয়াসাল্লামের কথা বলা হয়েছে। ঊনার মৃত্যু হয়েছে এটা নিশ্চিত, অতএব মৃতদের ক্ষেত্রেও এটা ব্যবহার হতে পারে।

Convincing লাগছে যুক্তিটা? যত যাই হোক, ওরা কুরআনের এক অংশ আরেক অংশকে ব্যাখ্যা করে-তাফসীরের এই মূলনীতিই তো অনুসরণ করছে, তাই না?

হুম। এজন্যই আরবী জানতে হইবে! **رَافِعُ** শব্দটার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে physically কাউকে তুলে নেয়া। যদি এটা দ্বারা সম্মান বা অন্য কিছু বুঝানো হয় তাহলে qualifier add করা হয়। এটার উদাহরণ হচ্ছে উপরের আয়াতটা- ইদ্রীস আলাইহিওয়াসাল্লামকে কিভাবে সমুন্নত করা হয়েছে? **عَلِيًّا مَكَانًا.**

এমন আরো উদাহরণ আছে যে সূরা আমাদের অনেকেরই মুখস্থ। কেউ মনে করতে পারছেন? সূরা আলামনাশরহ **وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ** ﴿٤ যেখানে বলা হচ্ছে যে রাসূল সাল্লালাহু আলাইহিওয়াসাল্লামের আলোচনা, স্মরণ, মর্যাদা ইত্যাদি সমুন্নত করা হয়েছে। এমন কিছু যদি না

থাকে, শুধু رَافِعُ থাকে, তাহলে আভিধানিক অর্থ-physically কাউকে তুলে নেয়া বুঝতে হবে। এটার প্রমাণ কী?

تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ فِيهِ مَا وَاذْكُرُوا بِقُوَّةٍ آتَيْنَاكُم مَا خُذُوا الطُّورَ فَوْقَكُمُ **وَرَفَعْنَا** مِيثَاقَكُمْ أَخَذْنَا وَإِذْ (২:৬৩)

এই আয়াতে তৎকালীন বনী ইসরাইলের উপর তূর পাহাড় তুলে ধরার কথা বলা হচ্ছে। এই আয়াত পড়ে কেউ কস্মিনকালেও চিন্তা করে না যে তূর পাহাড়কে সম্মানিত করার কথা বলা হচ্ছে।

তাহলে শেষমেষ এত আলোচনার সারমর্ম কী? ঈসা আলাইহিওয়াসাল্লামকে সম্পূর্ণ রূপে physically তুলে নেয়া হয়েছে-both body and soul. এই মর্মে ইবনে তাইমিয়্যা রাহিমাহুল্লাহর মন্তব্য তুলে না ধরে পারলাম না-

“Al-tawaffa in the Arabic language means: to exact fully or take in full. It takes three forms; the first: to take in sleep; the second: to take in death; and the third: to take the body and soul all together.” (Al-Jawab Al-Sahih 2/83)[33]

এখন ৩:৫৫ তে যে তৃতীয় টাইপটা বুঝানো হয়েছে সেটা আমরা কিভাবে বুঝলাম? আয়াতের পরের অংশ **وَرَافِعُكَ إِلَيَّ** থেকে! আরো একটা প্রমাণ আছে! সূরা নিসার ১৫৭ আয়াত যেটা আমরা আগে উল্লেখ করেছি, সেখানে বলা হচ্ছে **بَل رَّفَعَهُ** اللَّـهُ إِلَيْهِ ***আর নিশ্চয়ই তাঁকে তারা হত্যা করেনি। বরং তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ তা’আলা নিজের কাছে।***

অর্থ্যাৎ ঊনাকে হত্যা করা হয়নি, এটার Negation করা হয়েছে **بَل** শব্দটা দিয়ে। তাহলে কী হয়েছে? **رَّفَعَهُ,** তুলে নেয়া হয়েছে। যখন আমরা **مُتَوَفِّيكَ** শব্দের অর্থটা এভাবে সঠিকভাবে বুঝবো, তখন সূরা মায়িদার ১১৭ নং আয়াতের সঠিক অনুবাদ বুঝতে পারবো যেখানে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে فَلَمَّا أَنتَ كُنتَ **تَوَفَّيْتَنِي** ***অতঃপর যখন পনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন।***– মানে আমাকে আপনার কাছে তুলে নিলেন। আমরা কি বুঝতে পারলাম আরবী জানার প্রয়োজনীয়তা?

[33] এই পুরা বিষয়টা ইংরেজীতে সুন্দর করে উপস্থাপন করা হয়েছে এখানে https://ghurabapublications.wordpress.com/2014/02/05/refutation-of-ahmadiyyaqadiyaniyya-claims-that-isa-as-is-dead/

আল্লাহ আমাদের সবার মনে আরবী শেখার তীব্র ইচ্ছা জাগ্রত করুন এবং সেটার জন্য অর্থ, সময় ও এনার্জি ব্যয় করার তৌফিক্ব দিন, আমীন।

শিকড়ের সন্ধানে-৫৬

আগের দুই পর্ব ধরে আমরা দেখলাম ঈসা আলাইহিওয়াসাল্লামের Ascension এর কুরআনিক প্রমাণ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঘটনাটা ঘটানো হয়েছিলো কিভাবে? আমরা আগেই বলেছি যে কুরআন বা হাদীস আমাদেরকে সুস্পষ্ট কিছু বলে না। এ প্রসংগে আমি সূরা নিসা ১৫৭-৫৮ নং আয়াতটা আবার উল্লেখ করছি আরবী+দুইটা অনুবাদ।

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّـهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ **وَلَـٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ** ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رَّفَعَهُ اللَّـهُ إِلَيْهِ ۚ وَكَانَ اللَّـهُ عَزِيزًا حَكِيمًا﴿١٥٨﴾ (8:১৫৭-৫৮)

জহুরুল হক্কের অনুবাদঃ

আর তাদের বলার জন্য -- "আমরা নিশ্চয়ই কাতল করেছি মসীহ্‌কে, -- মরিয়ম-পুত্র ঈসাকে" আল্লাহ্‌র রসূল, আর তারা তাঁকে কাতল করে নি, আর তারা তাঁকে ক্রুশে বধও করে নি, কিন্তু তাদের কাছে তাঁকে তেমন প্রতীয়মান করা হয়েছিল। আর নিঃসন্দেহ যারা এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করছিল, তারা অবশ্য তাঁর সম্বন্ধে সন্দেহের মধ্যে ছিল। এ বিষয়ে তাদের কোনো জ্ঞান নেই অনুমানের অনুসরণ ছাড়া। আর এ সুনিশ্চিত যে তারা তাঁকে হত্যা করে নি। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ তাঁকে তাঁর দিকে উন্নীত করেছেন। আর আল্লাহ্‌ হচ্ছেন মহাশক্তিশালী, পরমজ্ঞানী।

মুহিউদ্দীন খানের অনুবাদঃ

আর তাদের একথা বলার কারণে যে, আমরা মরিয়ম পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি যিনি ছিলেন আল্লাহর রসূল। অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছে, আর না শুলীতে চড়িয়েছে, বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। বস্তুতঃ তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে, তারা এক্ষেত্রে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে, শুধুমাত্র অনুমান করা ছাড়া তারা এ বিষয়ে কোন খবরই রাখে না। আর নিশ্চয়ই তাঁকে তারা হত্যা করেনি। বরং তাঁকে উঠিয়ে নিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা নিজের কাছে। আর আল্লাহ হচ্ছেন মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

এই আয়াতে আমাদের মূল আলোচ্য হচ্ছে **شُبِّهَ** শব্দটা। আমরা খেয়াল করলে দেখবো যে দুইটা অনুবাদে পুরাই দুইটা ভিন্ন অর্থ করা হয়েছে। জহুরুল হক্কের অনুবাদঃ***কিন্তু তাদের কাছে তাঁকে তেমন প্রতীয়মান করা হয়েছিল।*** মুহিউদ্দীন খানের অনুবাদঃ***বরং তারা এরূপ ধাঁধায় পতিত***

হয়েছিল। প্রথমটা থেকে মনে হবে যে কেউ একজন ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলো। পরেরটা থেকে মনে হবে যে পুরা ব্যাপারটা নিয়েই কনফিউশন আছে। আমরা যদি আরবী শব্দের অর্থটা মনে করি তাহলে দেখবো যে দুটাই আসলে হতে পারে। It was made to appear to them (something similar happened) এবং it was made confusing to them. এখন তাফসীর ইবনে কাসীর এই আয়াতের তাফসীরে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করছেন যে-

Ibn Abi Hatim recorded that Ibn `Abbas said, "Just before Allah raised `Isa to the heavens, `Isa went to his companions, who were twelve inside the house. When he arrived, his hair was dripping water and he said, `There are those among you who will disbelieve in me twelve times after he had believed in me.' He then asked, *`Who volunteers that his image appear as mine, and be killed in my place. He will be with me (in Paradise)'* One of the youngest ones among them volunteered and `Isa asked him to sit down. `Isa again asked for a volunteer, and the young man kept volunteering and `Isa asking him to sit down. Then the young man volunteered again and *`Isa said, `You will be that man,' and the resemblance of `Isa was cast over that man while `Isa ascended to heaven from a hole in the house. When the Jews came looking for `Isa, they found that young man and crucified him.* Some of `Isa's followers disbelieved in him twelve times after they had believed in him. They then divided into three groups. One group, Al-Ya`qubiyyah (Jacobites), said, `Allah remained with us as long as He willed and then ascended to heaven.' Another group, An-Nasturiyyah (Nestorians), said, `The son of Allah was with us as long as he willed and Allah took him to heaven.' Another group, Muslims, said, `The servant and Messenger of Allah remained with us as long as Allah willed, and Allah then took him to Him.' The two disbelieving groups cooperated against the Muslim group and they killed them. Ever since that happened, Islam was then veiled until Allah sent Muhammad ." This statement has an authentic chain of narration leading to Ibn `Abbas, and An-Nasa'i narrated it through Abu Kurayb who reported it

from Abu Mu`awiyah. Many among the Salaf stated that `Isa asked if someone would volunteer for his appearance to be cast over him, and that he will be killed instead of `Isa, for which he would be his companion in Paradise. [34]

এখানে বলা হচ্ছে যে ঈসা আলাইহিওয়াসাল্লামের জায়গায় আরেকজনকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। এই বক্তব্যের সবচেয়ে কাছাকাছি বক্তব্য আমরা পাই gospel of barnabas থেকে যেটা canonical gospel (ওদের Authority দ্বারা স্বীকৃত) না, বরং ওদের ভাষায় apocryphal gospels ["falsely attributed"]।কথিত আছে যে barnabas ঈসা আলাইহিওয়াসাল্লামের প্রত্যক্ষ শিষ্যদের একজন ছিলেন। এটা বছরের পর বছর ধরে লাইব্রেরীতে ছিল, কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে লোকচক্ষুর সামনে আনা হয়েছে।[35] সেটা বলছে যে ঊনার একজন শিষ্য বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল ঈসা আলাইহিওয়াসাল্লামকে রোমানদের কাছে চিনিয়ে দেয়ার ব্যাপারে, কারণ রোমানরা ঊনাকে চিনতো না। কথা ছিলো যে সে ঊনাকে নিয়ে বের হবে এবং দেখিয়ে বলবে He is our master. তো সে ঢোকার পর হঠাৎ করেই ঘরের ছাদ খুলে যায় এবং চারজন ফেরেশতা এসে ঈসা আলাইহিওয়াসাল্লামকে তুলে নিয়ে যান। ওই শিষ্য যখন বেকুব হয়ে বের হয়ে আসেন তখন বাকিরা তাকে ঈসা আলাইহিওয়াসাল্লাম ভেবে বলে ওঠে He is our master. সে টের পায়নি যে তার চেহারা ঈসা আলাইহিওয়াসাল্লামের মত হয়ে গেছে। তখন রোমান সৈন্যরা ওকেই ঈসা আলাইহিওয়াসাল্লাম ভেবে ক্রুশবিদ্ধ করে।

এই ব্যাখ্যার সাথে তাফসীর ইবনে কাসীরে উল্লেখিত narration এর পার্থক্য হচ্ছে যে ওখানে ঊনাকে আত্মোৎসর্গকারী নিবেদিত প্রাণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, আর ক্রিস্টান Account এ বিশ্বাস ঘাতক।

কোনটা সত্যি? নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালো জানেন।

এজন্যই অনেক গল্পের বইয়ে দেখানো হয় যে ইসলাম ঈসা আলাইহিওয়াসাল্লামের ব্যাপারে যা যা বলে সেগুলা আসলে ভ্যাটিকানের ওরা জানে, এমন অনেক গসপেল ওদের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে, কিন্তু ওরা সেগুলো প্রকাশ করে না। এটার সত্য মিথ্যাও আল্লাহ জানেন!

[34] http://www.qtafsir.com/index.php?option=com_content&task=view&id=585&Itemid=59

শিকড়ের সন্ধানে-৫৭

গত পর্বে আমরা দেখেছি যে **شُبِّهَ** শব্দটার অর্থ যদি চিন্তা করি It was made to appear to them (something similar happened) তাহলে ঘটনার ব্যাখ্যাটা কেমন দাঁড়ায়। আমরা যদি চিন্তা করি যে অর্থটা হচ্ছে it was made confusing to them, তাহলেও কিন্তু It makes perfect sense. কেন? মনে আছে কয়েক পর্ব আগে বলা ক্রিস্টান Narrative? কী হয়েছিলো, কিভাবে হয়েছিলো কোনো কিছু নিয়েই ওদের definitive কোনো ব্যাখ্যা ছিলো না, ছিলো না কোনো নির্ভরযোগ্য উৎস? ডঃ লরেন্স ব্রাউন ঊনার Misgoded বইটার পুরা একটা চ্যাপ্টার জুড়ে দেখিয়েছেন যে একদম শীর্ষস্থানীয় বাইবেল স্কলারদের মাঝে এটা নিয়ে কত দ্বিধা, মতভেদ ইত্যাদি আছে। সুবহানাল্লাহ, নিশ্চয়ই কুরআনের বক্তব্য সত্য!

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যে কেন আল্লাহ সুবহানুহু ওয়া তা'লা এমনটা ঘটালেন, মানে কেন ঊনি সুস্পষ্টভাবে তখনকার মানুষদের দেখিয়ে দিলেন না যে ঈসা আলাইহিওয়াসাল্লামকে তুলে নেয়া হয়েছে? এজন্য আমাদের আল্লাহর একটা রীতি বুঝতে হবে। আল্লাহ যখন কোনো ব্যক্তি/ জাতির উপর মারাত্মক অসন্তুষ্ট হন, তখন তার একটা প্রকাশ হচ্ছে তাকে/ তাদেরকে পাপ করার অবাধ সুযোগ দেয়া। সূরা বাক্বারার ১৫ নং আয়াতে বলা হচ্ছে-

يَعْمَهُونَ طُغْيَانِهِمْ فِي **وَيَمُدُّهُمْ** بِهِمْ يَسْتَهْزِئُ اللَّـهُ

বরং আল্লাহই তাদের সাথে উপহাস করেন। আর তাদেরকে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের অহংকার ও কুমতলবে হয়রান ও পেরেশান থাকে।

এখানে ব্যবহৃত يَمُدُّ শব্দটার অর্থ হচ্ছে ঢিলা দেয়া, অবকাশ দেয়া, ছাড় দেয়া ইত্যাদি যাতে সে বুঝতে না পারে যে আল্লাহ তার উপর ঠিক কতটা অসন্তুষ্ট! সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ, শক্তিমান ও সফল ভাবতে থাকে।

আল্লাহ তৎকালীন ইহুদীদের সাথেও এই রকম করেছিলেন, ওরা রোমান সৈন্যদের দ্বারা আল্লাহর রাসূলকে হত্যার যে ষড়যন্ত্র চালিয়েছিলো, সেটাতে যে ওরা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিলো সেটা আল্লাহ ওদেরকে বুঝতে দেন নাই, এটাই ছিলো ওদের বিরুদ্ধে আল্লাহর চক্রান্ত। কারণ ওরা যদি এটা বুঝতো তাহলে ওরা টের পেত যে ঈসা আলাইহিওয়াসাল্লামই প্রকৃত মাসীহ। ওরা আত্মতৃপ্তির ঢেঁকুর তুলছিলো, সেটার কথা ওদের গ্রন্থেই আছে-

Likewise, also the chief priests mocking him, with the scribes and elders, said, He saved others; himself he cannot save. If he be the King of Israel, let him now come down from the cross, and we will believe him] **(Matthew 27:41-42)**

এভাবে ওদের বিভ্রান্তিতে রেখে আল্লাহ ওদেরকে হিদায়াত থেকে বঞ্চিত করেছেন। এর চেয়ে বড় শাস্তি আর কী হতে পারে?

এজন্যই আল্লাহ যে আয়াতে ঈসা আলাইহিওয়াসাল্লামকে তুলে নেয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, তার আগের আয়াতেই বলেছেন-

الْمَاكِرِينَ خَيْرُ وَاللَّـهُ ۖ اللَّـهُ وَمَكَرَ وَمَكَرُوا

এবং কাফেরেরা চক্রান্ত করেছে আর আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম কুশলী। (৩ঃ৫৪)

এই আয়াতটা একটা সার্বজনীন আয়াত হলেও যেন পরের আয়াতে আল্লাহ এটার একটা সুনির্দিষ্ট উদাহরণ দিচ্ছেন! এবং এই বিভ্রান্তিটা শুধু সেই সময়ের ইহুদী নয়, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সত্যি হয়ে গিয়েছে। ওরা আজো যে এক মাসীহের জন্য অপেক্ষা করছে এটা কি বিশাল এক শাস্তি নয়? তাছাড়া আমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে ক্রিস্টানরা ক্ষমতায় থাকাকালে ইহুদীরা কিভাবে নির্যাতিত হয়েছে ঈসা আলাইহিওয়াসাল্লামের হত্যাকারী হিসেবে? ইহুদীদের নিয়ে কথা বলার সময় আমরা সেটা উল্লেখ করেছি।

এছাড়াও ওদের সেই সময়েই মানে যারা ঈসা আলাইহিওয়াসাল্লামের সাথে এমন করেছিলো, তারা দুনিয়াতে আরেকটা বিশাল শাস্তি পেয়েছিলো।

কারো কি মনে আছে সেটা কী?

হুম, ৭০ ক্রিস্টাব্দে সঙ্ঘটিত ২য় বিপর্যয়। রোমানরা যখন জেরুজালেমকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিলো, কথিত আছে যে দুটা ইট একসাথে ছিলো না.....

আল্লাহ আমাদেরকে এভাবে পাপ করার ক্রমাগত সুযোগ দেয়া থেকে রক্ষা করুন! আমরা যেন বুঝতে পারি যে আল্লাহ আমার উপর ঠিক কতটা অসন্তুষ্ট!

ক্রুশবিদ্ধ হবার টপিক নিয়ে কথা বলা আমাদের মোটামুটি এখানেই শেষ। শুধু একটা কথা বলতে চাই, যেটা পড়ে আমার খুব ভালো লেগেছে, সেটা হচ্ছে নবী ও রাসূলের পার্থক্যের আলোকে ব্যাপারটা দেখা। আমরা সবাই জানি যে নবী ও রাসূল একই নয় মানে সব রাসূলই নবী, সব নবী রাসূল নয়। অর্থ্যাৎ রাসূলরা নবীদের থেকে বেশী সম্মানিত। এখন আমরা খেয়াল করলে দেখবো যে কাফিররা আল্লাহর অনেক নবীকে হত্যা করতে সমর্থ হলেও কোনো রাসূলকে পারে নাই। ঈসা আলাইহিওয়াসাল্লাম যেহেতু আল্লাহর রাসূল ছিলেন, তাই ঊনাকে যদি ইহুদীরা হত্যা করতে পারতো, তাহলে সেটা হত আল্লাহর ক্ষমতার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন। আল্লাহ তাঁর একজন সম্মানিত রাসূলকে ক্রুশবিদ্ধের মত অপমানজনক এবং অসহায় মৃত্যু দিবেন তা কি হতে পারে? ওদের গ্রন্থ থেকেই আমরা জানতে পারি যে... "He who is hanged [i.e., either on gallows or crucified] is accursed of God."

[Deuteronomy 22:23]

তাই যদি আমি বিশ্বাস করি যে ঈসা আলাইহিওয়াসাল্লামকে ওরা হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিলো, ঊনার বিরুদ্ধে ওদের চক্রান্ত সফল হয়েছিলো, তাহলে সেটা ঊনার জন্য সম্মানহানিকর, ঊনার সম্মান এতে বাড়ে না।

আগামী পর্বে আমরা ক্রিস্টানদের বিশ্বাসের স্তম্ভগুলির ব্যাপারে একটা সামগ্রিক বিশ্লেষণ তুলে ধরবো ইনশাল্লাহ।

শিকড়ের সন্ধানে-৫৮

গত কয়েক পর্ব ধরে আমরা আজকের ক্রিস্টান ধর্মের মূলনীতিগুলো নিয়ে আলোচনা করছি, এবং বারবার একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে উঠছে- ওদের ধর্মের স্তম্ভগুলোর কোনোটার ভিত্তিই ঈসা আলাইহিওয়াসাল্লামের শিক্ষা নয়, বাইবেল থেকে প্রত্যক্ষ রেফারেন্স পাওয়া যায় না, বরং বিপরীত কথা পাওয়া যায়। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে এই বিশাল পরিবর্তন কিভাবে ঘটল। এজন্য আমাদের ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাতে হবে এবং পরিচিত হতে হবে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের সাথে যার নামে পল- তাকে আধুনিক ক্রিস্টানিটির জনক বলে অভিহিত করা যায়।

কিন্তু কে ছিল এই পল? সে কিন্তু ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিষ্যদের কেউ ছিলো না, তার সাথে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সরাসরি কখনও সাক্ষাৎ হয়ও নাই। তাহলে সে এমন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব কিভাবে হল যে তাকে আধুনিক ক্রিস্টানিটির জনক বলা যায়?

পল ছিলো একজন রোমান, সে ইহুদী ছিলো না। এই তথ্যটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা আগে বলেছি যে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোটেই বিশ্ব মানবতার জন্য প্রেরিত হন নাই যেমনটা ওরা এখন দাবী করে। বরং তিনি exclusively বনী ইসরাঈলদের জন্য প্রেরিত ছিলেন। যাই হোক, পল প্রাথমিকভাবে প্রচণ্ড ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদ্বেষী ছিলো। ঊনাকে allegedly ক্রুশবিদ্ধ করার পর সে যাচ্ছিলো ঊনার শিষ্যদেরকে ধরে আনার জন্য (কথিত আছে যে ঊনারা সবাই পালিয়ে গিয়েছিল), তাদেরকে হত্যা করাই ছিলো তার উদ্দেশ্য। তার বক্তব্য অনুসারে পথিমধ্যে The resurrected Jesus appeared to him in a great light. আমাদের মনে আছে যে আমরা ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্রুশবিদ্ধ হওয়া নিয়ে কথা বলার সময় বলেছিলাম যে ওরা বিশ্বাস করে তিনদিন পর ঊনি Resurrected হন, তারপর চল্লিশদিন পর্যন্ত সময়ে ধরে বিভিন্ন Disciple দের কাছে দেখা দেন এবং তারপর একবারে Ascend করেন.....পল সেই কাহিনীর অংশ যার কাছে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখা দিয়েছিলেন বলে সে দাবী করে। ঊনার সেই আলোর ছটাতে সে অন্ধপ্রায় হয়ে গিয়েছিলো, তিনদিন পর সে তার দৃষ্টি শক্তি খুঁজে পায়, আর তারপর থেকেই সে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্ধ ভক্ত হয়ে যায়।

কিন্তু এই কাহিনীতে একটা ঘাপলা আছে। কেউ কী আন্দাজ প্রচার করতে পারেন ঘাপলাটা কী? পল তো ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিষ্য ছিল না, সে তো ঊনাকে দেখেও নাই। তাহলে সে

কিভাবে বুঝলো যে উনার কাছে যে দেখা দিয়েছে সে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম? মজার ব্যাপার হচ্ছে যে সে নিজেও জানতো যে এই ব্যাপারটাকে শয়তানের কাছ থেকে আসতে পারে-

"Satan himself transforms himself into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also transform themselves into ministers of righteousness ..." 2 Corinthians 11:1415

কিন্তু কেন আমরা এমনটা ভাবছি? মানে কেন আমরা ওর এই আধ্যাতিক অভিজ্ঞতাটাকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছি? সে যে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোর বিরোধী থেকে অন্ধ ভক্ত হয়ে গেলো এটাতো ভালো, তাই না? ধর্মীয় আচার আচরণ পালনের মাধ্যমে কেউ যদি ধার্মিক হয়ে যায় এটাতো আনন্দের কথা।

সমস্যাটা হচ্ছে ও ধর্মীয় আচার আচরণ পালন করা শুরু করে নি বরং ধর্মটাকেই বদলে দিয়েছিলো। সে কী প্রচার করা শুরু করলো?

ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন সত্য মাসীহ, তিনি ছিলেন ঈশ্বর পুত্র.....

অবাক লাগছে? হুম। ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আল্লাহর পুত্র সেই ধারণার প্রবর্তক ছিল এই পল। আজকের ক্রিস্টান ধর্মের যেসব মূলনীতিগুলো আমরা গত কয়েক পর্ব ধরে বিশ্লেষণ করেছি এবং বাইবেলের সাথে বিরোধিতাপূর্ণ পেয়েছি, সেগুলো সব কিছু এই পলের Brain child.

আমরা নিচে এক নজরে বোঝার চেষ্টা করবো পলের প্রচারিত মতবাদগুলো কী ছিলো এবং সেগুলো কিভাবে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রচারিত শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক ছিল?

পলের শিক্ষা	ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা
১। ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশ্ব মানবতার জন্য প্রেরিত হয়েছেন। সেই মূলত ক্রিস্টিয়ানিটিকে ইহুদীবাদের বাইরে নিয়ে যায়।	১। "I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel." (Matthew 15:24)[1]
২। ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈশ্বর পুত্র ছিলেন	২। ৮৮বার নিউ টেস্টামেন্টে নিজেকে মানব সন্তান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন
৩। অইহুদীদের জন্য তাওরাতের আইনকানুন প্রযোজ্য	৩। ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন উনার

না, শুধু বিশ্বাস করলেই চলবে। আবার আইন কানুনকে আক্ষরিক ভাবে না নিয়ে allegorically নিতে হবে। "But now we have been delivered from the law, having died [i.e., suffered] to what we were held by, so that we should serve in the newness of the Spirit and not in the oldness of the letter" (Romans .(7:6 "And by him [Jesus Christ] everyone who believes is justified from all things from which you could not be justified by the law of Moses" (Acts .(13:39 উদাহরণঃ Jesus was circumcised (Luke 2:21). Paul taught it wasn't necessary (Rom 4:11 and Gal 5:2).	commandments গুলো মানতে হবে, শুধু মুখের বুলি ফোটালে হবে না। "Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven" (Matthew .(7:21 "But if you want to enter into life [eternal life, that is—i.e., salvation] keep the commandments" (Matthew .(19:17 "If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love" (John .(15:10 Now, Israel, hear the decrees and laws I am about to teach you. Follow them so that you may live and may go in and take possession of the land the Lord, the God of your ancestors, is giving you. 2 Do not add to what I command you and do not subtract from it, but keep the commands of the Lord your God that I give you. [Deuteronomy 4:4-1]

৪। ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে original sin মোচন করতে গিয়ে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন, তারপর resurrected হয়েছেন, এগুলোও পলের উদ্ভাবন। Remember Jesus Christ, raised from the dead, a descendant of David—that is my gospel] 2 Timothy 2:8New Revised Standard Version (NRSV)[ওর নিজের এই বক্তব্য ছাড়া আর কোথাও আমরা এটার আর কোনো রেফারেন্স খুঁজে পাই না।	৪। ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে এসব কথা কোথাও কিছু বলেন নাই, এটা আমরা বিস্তারিত দেখেছি আগের পর্বে।
৫। পল ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপ্টিজমের একটা নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছিলো। তার বক্তব্য ছিল যে কেউ যখন পানিতে পুরাটা ব্যাপ্টাইজড হয়, সে আদতে নিজেকে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের রক্তে সিক্ত করছে, তার পুরাতন স্বত্বার মৃত্যু ঘটছে এবং ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতই তার নবজন্ম হচ্ছে, original sin থেকে মুক্ত হচ্ছে। (See Romans 6:3-4, Colossians 2:12).	৫। ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার অনুসারীদের জন্য ব্যাপ্টিজম স্রেফ দৈহিক ও আধ্যাতিক শুদ্ধিকরণ একটা প্রক্রিয়া ছিলো, এর সাথে তথাকথিত original sin, death and resurrection of jesus এর কোনো সম্পর্ক ছিলো না।.

শিকড়ের সন্ধানে-৫৯

পলের শিক্ষার সাথে ঈসা আলাইহিওয়াসাল্লামের শিক্ষার যে কতটা সাঙ্ঘর্ষিক ছিলো, সেটা নিচের উক্তিগুলো থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়-

1. *"Jesus did not preach any of Paul's sayings, and Paul is considered responsible for Jesus' Divinity."*[36]
2. *"Paul did something that Rabbi Jesus never did and refused to do. He extended God's promise of salvation to the Gentiles; he abolished the law of Moses, and he prevented direct access to God by introducing an intermediary."*[37]

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে পল যে এভাবে ঈসা আলাইহিওয়াসাল্লামের শিক্ষা বিকৃত করে প্রচার করছিলো, সেটার ব্যাপারে ঊনার আসল শিষ্যদের প্রতিক্রিয়া কী ছিল?

এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে যে যেহেতু ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঊনার দাওয়াতী কাজ শুধু বনী ইসরাইলীয়দের মাঝে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, তাই ঊনার শিষ্যরা ইহুদীবাদের নিজেদের সম্পর্ককে ছিন্ন করে নি (যদিও ইহুদীরাই ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলো) তারা নিজেদেরকে প্র্যাক্টিসিং ইহুদীই ভাবতো এবং তাওরাতের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতো। ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর একজন নবী হিসেবে বিশ্বাস করতো, এটাই ছিলো ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতাকারী ইহুদীদের সাথে ঊনাদের এক মাত্র পার্থক্য। Acts of the Apostles (নিউ টেস্টামেন্টের একটা অংশ) থেকে বোঝা যায় যে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাথমিক অনুসারীরা কী কঠোরভাবে তাওরাতের নিয়ম-কানুনগুলো মেনে চলতেন। সেগুলো দেখে Carmichael মন্তব্য করেছেন যে , "The above passages are astonishing; they indicate that for a

[36] Micheal Hart in his book "The 100, a Ranking of the Most Influencial People in History"

[37] *Lehmann, Johannes. p. 134. 123*

whole generation after Jesus' death his followers were pious Jews and proud of it, had attracted into their fold members of the professional religious classes, and did not deviate even from the burdensome ceremonial laws."[38]

ফলশ্রুতিতে স্বাভাবিকভাবেই ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিষ্যদের কাছে পল ছিলেন একটা Heretical figure। ঊনাদের প্রভাব প্রতিপত্তির কেন্দ্র ছিল জেরুজালেম। ঊনাদের সাথে পলের প্রচারিত ধর্ম বিশ্বাস একটা দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিল। আমাদের আজকের ভাষায় he was excommunicated by the Mother church in Jerusalem.

সেটা আমরা কিভাবে জানতে পারি? Bart D. Ehrman, সম্ভবত আজকের সময়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী বাইবেল স্কলার, The New Testment: A Historical Introduction to the Early Christian Writings বইয়ের লেখক আমাদের জানাচ্ছেন যে "Paul's view was not universally accepted or, one might argue, even widely accepted," and that there were prominent Christian leaders, including Jesus' closest disciple, Peter, "who vehem ently disagreed with him on this score and considered Paul's views to be a corruption of the true message of Christ." 39
According to Bart D. Ehrman, "In particular, the Adoptionists] a second century Christian sect] considered Paul, one of the most prominent authors of our New Testament, to be an archheretic rather than an apostle." [40]

[38] Carmichael, Joel. p. 223.

[39] Ehrman, Bart D. Lost Christianities. Pp. 97-98.

[40] Ehrman, Bart D. The

New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings. 2004. Oxford University Pres

s. P. 3.

ওদের গ্রন্থ অনুসারে জেমস, ঈসা আলাইহিওয়াসাল্লামের ছোট ভাই এবং তৎকালীন চার্চের প্রধান পলকে তিরষ্কার করছিলেন এটা বলে যে,
"But they have been informed about you that you teach all the Jews who are among the Gentiles to forsake Moses, saying that they ought not to circumcise their children nor to walk according to the customs" (Acts 21:21).

তারপর তিনি পলকে সতর্ক করে দেন একটা সমাবেশের ব্যাপারে যেখানে পলের শাস্তি নির্ধারণের কথা ছিল -"What then? The assembly must certainly meet, for they will hear that you have come" (Acts 21:22). ঊনি ওকে তওবা করার পরামর্শ দেন-"walk orderly and keep the law" (Acts 21:2324). কিন্তু পল সেটা করেছে বলে জানা যায় না। এখন ওদের গসপেল অনুসারে "A disciple is not above his teacher, nor a servant above his master" (Matthew 10:24). মানে শিষ্যদের প্রভাব অবশ্যই ঈসা আলাইহিওয়াসাল্লামের চেয়ে বেশী ছিল না। তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে ঈসা আলাইহিওয়াসাল্লামের শিষ্যদের এমন বিরোধিতা স্বত্বেও কিভাবে পলের শিক্ষা বেঁচে রইলো এবং আজকের সময়ে dominant থাকলো যেখানে ঊনি শিষ্যই ছিলেন না?

এজন্য আমাদের ইতিহাস জানতে হবে। পলের যে শিক্ষা তা তৎকালীন রোমান pagan religion দ্বারা প্রভাবিত ছিলো,তাই অইহুদীদের কাছে সেটা খুবই জনপ্রিয়তা পায়। কোনো আইন মানতে হবে না, খালি বিশ্বাস করলেই হবে, কেউ একজন আমার পাপের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়ে গেছে, আমার কোনো দায় নেই, এটাতো খুবই মজার একটা ধর্ম, এটা সাধারণ মানুষের ভালো লাগবে এটাতো খুবই স্বাভাবিক! তাছাড়া ৭০ ক্রিস্টাব্দে রোমানদের দ্বারা জেরুজালেম মাটির সাথে মিশে যাওয়ার পর জেরুজালেম ভিত্তিক ইহুদী ক্রিস্টানদের প্রভাবও নাই হয়ে যায় এবং পল দ্বারা প্রচারিত নতুন ধর্ম যা কী না একসময় জেরুজালেম চার্চের কঠিন বিরোধিতার কারণে কোনো সুবিধাই করতে পারছিলো না, সেটা অপ্রতিদ্বন্দ্বীতার সাথে প্রচার ও প্রসারের সুযোগ পায়। আমাদের দেশে যে মাজার পুজারীরা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠ পোষকতা পায় সেরকম আর কী।

শিকড়ের সন্ধানে-৬০

আমরা বলেছি যে পলের বিকৃত মতবাদ ভালোই জনপ্রিয়তা পেয়েছিলো। কিন্তু এটা বলা যাবে না যে সেটা পূর্ণ রূপে সফল হয়েছে। বহু মানুষ তখনও একত্ববাদী ক্রিস্টান ছিলো যারা ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহর নবী ছাড়া আর কিছুই ভাবতো না। এই গ্রুপের নাম প্রথমে ছিলো Nazarenes, পরে Ebionites. এছাড়াও আরো অনেক গ্রুপের উদ্ভব হয়েছিল যেটার কথা পল নিজেই উল্লেখ করেছে-

"Now I say this, that each of you says, 'I am of Paul,' or 'I am of Apollos[41],' or 'I am of Cephas[42],' or 'I am of Christ'" (1 Corinthians 1:12(

কিন্তু সামগ্রিকভাবে ক্রিস্টান ধর্মের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছিলো, যেটা তৎকালীন রোমান শাসকদের চক্ষুশূল হয়ে গিয়েছিল। ওরা ক্রিস্টানদের সহ্য করতে পারতো না। ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা চেষ্টার ঘটনার পর থেকেই ঊনার অনুসারীরা প্রবল অত্যাচারের সম্মুখীনটি হয় যেটা অব্যাহত থাকে পরবর্তী ৩০০ বছর পর্যন্ত। এরকম অত্যাচারের বহু উদাহরণ দেয়া যায়- একটা উল্লেখযোগ্য হচ্ছে Neronian persecution. ৬৪ ক্রিস্টাব্দে রোমে ছয়দিন ব্যাপী একটা আগুন লেগেছিলো, যেটার দোষ জনগণ সম্রাট নিরোকে দিয়েছিল। তখন সেটা থেকে বাঁচার জন্য ওরা উল্টা দোষ চাপিয়েছিলো ক্রিস্টানদের উপর। ব্যাস, শুরু হল ওদের উপর অমানবিক নির্যাতন।

যাই হোক এভাবে অত্যাচার নির্যাতনের মাঝেই ক্রিস্টান ধর্ম গ্রহণকারীর ক্রমবর্ধমান সংখ্যা রোমান শাসকদের জন্য বিশাল মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। সাম্রাজ্যের অবস্থা তখন এমনিতেই ভঙ্গুর, তার উপর ক্রিস্টানদেরকে দমন করতে অর্থ ও শক্তির ব্যয় সেটার অবস্থা আরো নাজুক করে দিচ্ছিল। এইসময়, ঘটে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। আমাদের সমসাময়িক সময়ে এটাকে সবচেয়ে প্রভাবশালী ঘটনা[43] বললে অত্যুক্তি হবে নাকি আমার জানা নেই। সেটা হচ্ছে- তৎকালীন রোমান সম্রাট কন্সটানটাইন ক্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন।

---

[41] an Alexandrian Jew

[42] Cephas (Peter- a disciple of jesus)

[43] অবশ্যই আমাদের কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্ম এবং মিশন সবচেয়ে বিশাল ঘটনা।

কেন? আল্লাহই ভালো জানেন। অধিকাংশের মত যে তিনি রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে এটা করেছিলেন, আধ্যাত্মিক কারণে নয়। কারণ সে মৃত্যু শয্যার আগে baptized হয় নাই। ব্যাপারটা এমন যে যেই কাজটা সবচেয়ে বেশী শক্তি আর অর্থ ক্ষেপণ করছে, সেটাকে সমূলে উৎপাটন করা, মানে শত্রুকে বন্ধু বানিয়ে ফেলা আর কী। উনি আসলে ধর্মীয় কোন্দলের কারণে বহুধা বিভক্ত রোমান সাম্রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ করতে চাচ্ছিলেন ক্রিস্টান ধর্মের ব্যানারে। ক্রিস্টান ধর্ম বেছে নেয়ার কারণ হচ্ছে আমাদের ভাষায় পলের প্রচারিত মতবাদ সুস্পষ্ট শিরক হলেও এটা তখনকার রোমান pagan ধর্মের তুলনায় monotheistic ছিল। মানে One god, god has one son ইত্যাদি, গ্রীক মিথোলোজি দ্বারা প্রভাবিত শত শত দেবতার তুলনায় এটা কম তো বটেই!

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে এই son of god এর কন্সেপ্টের ব্যাখ্যা নিয়েই তৈরি হয়েছিল বহু ফেরকা, যেটার কথা আমরা আগেই বলেছি। কিন্তু কন্সটানটাইন চাইছিলেন একটা কমন প্ল্যাটফর্ম। সেজন্য উনি তখনকার সমস্ত বিশপ, পোপ, ফাদার মানে যত ধরণের Authoritative figure আছে সবাইকে একত্র করে একটা সম্মেলনের মত ডাকলেন, যেটার উদ্দেশ্য ছিল সব পক্ষের যুক্তি তর্ক বিশ্লেষণ করে একটা উপসংহারে পৌঁছানো। এই সম্মেলনটাই পরিচিত Council of Nicaea নামে যা সংঘটিত হয়েছিলো ৩২৫ ক্রিস্টাব্দে এবং আজকের ক্রিস্টান ধর্মের ইতিহাসে একটা যুগান্তকারী ঘটনা। মনে আছে আমরা আগের একাধিক পর্বে এটার কথা উল্লেখ করেছিলাম?

যাই হোক, এই কাউন্সিলে মোটামুটি দুইটা বড় দল ছিলো। এক পক্ষ ছিলো ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের divinity র সমর্থক (মানে পলের মতবাদ), আরেক পক্ষ ছিলো বাইবেলের শিক্ষা অক্ষরে অক্ষরে পালন করার সমর্থক (ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীদের মতবাদ)। এই দ্বিতীয় পক্ষের সবচেয়ে জোরালো কণ্ঠ ছিল Arian. যখনই কেউ ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের divinity পক্ষে যুক্তি দেখাতো, সে বাইবেল থেকে কোনো না কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করে সেটাকে খণ্ডন করতো।

এখন যদি সত্যের কষ্টি পাথরে যাচাই করা হয় তাহলে Arian এর যুক্তি ছিলো অখণ্ডনীয়। কিন্তু এই জায়গায় এসে আমাদের একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট বুঝতে হবে। পলের প্রচার করা মতবাদ ছিলো রোমান pagan ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত এবং সেটার সাথে মিল ছিলো বলেই অইহুদীদের কাছে সেটা জনপ্রিয়তা পেয়েছিলো। এটা basic human psychology যে সে change averse. যখন সে একটা নতুন ধর্ম গ্রহণ করে, তখন নতুন ধর্ম ও পুরানো ধর্মের মাঝে মিল তাকে আকৃষ্ট করে, নতুন ধর্ম পালনে তার সুবিধা হয়। তাই আমাদের স্বীকার করতেই হবে

যে পল যদি ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রচার করা ধর্মের মাঝে mysticism না ঢুকাতো, তাহলে ক্রিস্টান ধর্মের প্রচার এভাবে বাড়তো না, ওরা রোমান সাম্রাজ্যের জন্য Threat হত না, এবং সবচাইতে বড় কথা যে এই threat minimize করার জন্য কন্সটানটাইন ক্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে ফেলতেন না। কন্সটানটাইন এই কাজ না করলে আজকে আমরা যেভাবে পশ্চিমা সভ্যতার dominant religion হিসেবে ক্রিস্টান ধর্মকে পাই সেভাবে পেতাম না। আর সেজন্যই কন্সটানটাইনের ডাকা Council of Nicaeaর ঝোঁক ছিলো mythicized version of Christianity, অ্যারিয়ানের শাণিত যুক্তি সেখানে ছিলো অনাহুত, unwelcomed.[44] আর সেজন্যই শেষ পর্যন্ত গায়ের জোরে তারা Divine Jesus কেই ক্রিস্টান ধর্মের একমাত্র গ্রহণযোগ্য মতবাদ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ওরা নিজেরাই স্বীকার করছে যে Arian controversy কে পিছে ফেলে Council of Nicaea তে পাশ হওয়া মতবাদের ভিত্তি ছিলো Non-biblical sources.

"It was, however, at the Council of Nicaea that the church was **constrained by circumstances** to introduce non-biblical categories into its authentic description of the Son's relation to the Father. The Arian controversy occasioned this determination.[45]

এই **constrained by circumstances** মানে কী যা তাদের বাধ্য করেছিলো Non-biblical source গ্রহণ করতো? আল্লাহই ভালো জানেন, তবে আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে Arianএর যুক্তির বিপরীতে বাইবেল থেকে কোনো পালটা যুক্তি প্রদর্শন করতে পারার ক্ষমতা।

এই যে son of God, Trinity, Original sin, Atonement ইত্যাদি যেসব কন্সেপ্টের কোনো ভিত্তি আমরা বাইবেলে পাই নি, সেগুলো সব ক্রিস্টান ধর্মের অংশ হয়েছিল Council of Nicaea র মাধ্যমে। দেখুন ওদের ইতিহাস কী বলছে-

The formal doctrines of the Trinity and divine sonship both sprang from the Council of Nicaea and were incorporated into the Nicene Creed—"A profession of faith agreed upon, although with some misgivings because

[44] এভাবেই রাজনীতি দ্বারা ধর্ম প্রভাবিত হয়েছিলো। তাই আজকে যখন পশ্চিমারা সেক্যুলারিজমের ধুঁয়া তুলে separation of church and state এর বাণী প্রচার করতে চায় এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থা ইসলামী জীবন ধারার সাথে ওতপ্রোতভাবে কেন জড়িত এটা নিয়ে ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায়, তখন ওদেরকে এই কাহিনীর কথা মনে করিয়ে দেয়া উচিৎ।

of its nonbiblical terminology, by the bishops at Nicaea I (325 CE) to defend the true faith against Arianism"[46]

[45] New Catholic Encyclopedia. Vol 13, p. 426. New Catholic Encyclopedia. Vol 13, p. 426.

[46] New Catholic Encyclopedia. Vol 10, p. 437.

শিকড়ের সন্ধানে-৬১

আমরা হয়তো বা আমাদের কমন সেন্স দিয়েই বুঝি যে Mystified version of Christianity মানে যেখানে son of God, Trinity এগুলো ধর্মের মূওল মতবাদ, সেটা খুবই প্যাঁচালো, এক কথায় দুর্বোধ্য। আমার মনে আছে যে IOU তে comparative Religion কোর্স করার সময় ডঃ বিলাল ফিলিপ্স ট্রিনিটির পক্ষে ওরা যেসব যুক্তি দেখায় সেগুলো কিভাবে খণ্ডন করতে হবে সেটা শিখাতেন। আমার কাছে যুক্তিগুলা এত দুর্বোধ্য লাগতো! একটুও convincing লাগতো না। এই অবস্থা কিন্তু শুধু আমার না, কোটি কোটি ক্রিস্টান এই দুর্বোধ্যতার ব্যাপারে কনফিউশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। যদি তাদের পোপ/ ফাদার এদের কাছে যায় তখন ওরা প্রথমে হয়তো একটু যুক্তি দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করে, কিন্তু তারপরই বলে যে It is a religious mystery, you just have to believe! ধর্ম মানে Blind faith এই চিন্তাটা নিঃসন্দেহে ক্রিস্টান ধর্মের এই যুক্তিহীণ বিশ্বাস থেকে এসেছে, ইসলামে এটার কথা কখনই বলা হয় নি।

যাই হোক, এসব কথা এখানে বলার কারণ হচ্ছে যে Council of Nicaea যে doctrine প্রতিষ্ঠিত করেছিল সেটা ফাইনাল করা হয়েছিল ৩৮১ ক্রিস্টাব্দের Council of Constantinople এর মাধ্যমে। কিন্তু এই কাজটা করতে ৫৬ বছর লাগলো কেন?
কারণ doctrine of Nicaea র কোনো বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি ছিল না। তাই ওরা এতদিন ধরে চলে আসা একত্ববাদী বিশ্বাসকে নির্মূল করতে হিমশিম খাচ্ছিলো। Council of Nicaea প্রতিষ্ঠার পেছনে কন্সটানটাইনের যে উদ্দেশ্য ছিলএকটা ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গঠন -, তাতে সে প্রায় সম্পূর্ণই ব্যর্থ হয়েছিল বলা যায়, কারণ সে তার ছেলেদের মাঝেই ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করতে পারে নাই। ঊনার ,মৃত্যুর পর Constantius রোমান সাম্রাজ্যের পূর্ব অর্ধেকের শাসক হন এবং Arianism তথা একত্ববাদিতাকে গ্রহণ করেন। অন্যদিকে পশ্চিম অর্ধেকের রাজ্যভার ছিল অপর পুত্র Constans যে স্বীকৃতি দিয়েছিল Nicene Creed। দুইজনের এই বিরোধপূর্ণ মতবাদের মীমাংসা করার জন্য ৩৪৩ ক্রিস্টাব্দে Council of Sardica ডাকা হয়েছিলো, যেটা ব্যর্থ হয়েছিল। Constans বেশী শক্তিশালী ছিলো, তাই সে ভাইয়ের আপত্তি উপেক্ষা করে "orthodox" Trinitarian bishops প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু মৃত্যু হয় আগে Constans এরই। ফলে Constantius ভাইয়ের পলিসি বদলিয়ে Arianism কে পুরা সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। তার পরের রোমান সম্রাট ছিলো Julian ৩৬১) খ্রিঃযে পৌত্তলিক রীতিনীতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা (চালায়। ঊনাকে সরিয়ে ক্ষমতায় আসেন সম্রাটJovian (৬৪ খ্রিঃ-৩৬৩) তাকে আবার সরিয়ে

ফেলে তার ছেলেরা। ঠিক কন্সটানটাইনের ছেলেদের মতই তার দুই ছেলেও পশ্চিম অর্ধেকে Nicene Creed এবং পূর্ব অর্ধেকে Arianism প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের পরে ক্ষমতায় আসেন Theodosius the Great(৮৩ খ্রিঃ-৩৭৫) । তিনি এসে সকল বিতর্কের ইতি ঘটিয়ে Nicene Creed কে নিশ্চিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ট্রিনিটিয়ান ক্রিস্টান ধর্মকে orthodox হিসেবে গ্রহণ করেন।[47]

অর্থ্যাৎ ৩২৫ ক্রিঃ Nicene Creed গ্রহণ করা হলেও এটা প্রতিষ্ঠিত করতে অনেক কাঠখড় পুড়াতে হয়েছে। বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তিহীণ Nicene Creed কে প্রতিষ্ঠিত করতে ওরা মূলত গায়ের জোর খাটাতে হয়েছিলো। Arian কে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। এছাড়া যত বিরোধিতাপূর্ণ গ্রুপ ছিলো [48]তাদের সবাইকে Dominant Trinitian চার্চের কর্তৃপক্ষ Heretic হিসেবে ঘোষণা করে এবং পুড়িয়ে হত্যা করে। এভাবে সব ধরণের dissenting voice কে নির্বিবাদে দমন করে একসময় মানে প্রায় চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে ট্রিনিটিয়ান মতবাদ ক্রিস্টানদের জীবনের সাথে একীভূত হয়।[49] তারপর অস্তিত্বের প্রয়োজনে ৪৫১ ক্রিস্টাব্দে Council of Chalcedon র মাধ্যমে যে ধর্মীয় বিশ্বাস স্থির করা হয় সেটা ছিল-: "One and the same Christ, Son, Lord, only-begotten, known in two natures, without confusion, without change, without division, without separation.[50]

---

[47] "It was during his [Theodosius'] reign that Christianity became the state religion, thus gaining a position of monopoly, while other religions and beliefs were denied the right to exist." [Ostrogorsky, George. 1969. History of the Byzantine State. (Translated from the German by Joan Hussey). New Brunswick: Rutgers University Press. p. 53

[48] আমরা হয়তো এখন The Corinthians, the Basilidians, the Paulicians, the Cathari and the Carpocratians এসব গ্রুপের নাম এখন আর জানি না, কিন্তু এরা শুরুর দিকের খুব dynamic Christian মতাদর্শ ছিলো যা ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে।

[49] The formulation "one God in three Persons" was

not solidly established, certainly not fully assimilated into Christian life and its profession of faith, prior to the end of the 4 th century. But it is precisely this formulation that has first claim to the title the Trinitarian dogma. Among the Apostolic Fathers, there had been nothing even remotely approaching such a mentality or perspective." New Catholic Encyclopedia. Vol 14, p. 299

[50] 2 Catholic Encyclopedia. CDRom; 1914 edition, under 'Council of Chalcedon

আমরা অনেকেই হয়তো সালমান বিন ফারসী, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিখ্যাত পারসিয়ান সাহাবীর ইসলাম গ্রহণের কাহিনী জানি। যদি না জেনে থাকি, এই অসাধারণ কাহিনীটি জেনে নেয়ার অনুরোধ থাকলো। যাদের কাহিনীটির পুংখানুপুংখ বর্ণনা মনে আছে, তাদের হয়তো এটাও মনে আছে যে উনি যেসব পোপের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন, তারা মূলত ছিলেন একেশ্বরবাদী, কিন্তু উনারা ছিলেন একেবারেই সংখ্যালঘু। কেন তারা সংখ্যালঘু ছিলেন সেটা নিশ্চয়ই আমরা এখন বুঝতে পারছি। একদম শেষ যে পোপ সালমান বিন ফারসীকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের জায়গায় যেতে বলেছিলেন, তিনি এমনটা এজন্যই বলেছিলেন যে একেশ্বরবাদী পোপ আর কেউ ছিলো, আর ওদের গ্রন্থ অনুসারে আরেকজন নবী আসার সময় হয়ে গিয়েছিলো!

গায়ের জোরে বিরোধী পক্ষকে দমন করার চার্চের এই যে কৌশল, সেটা ওদের একটা নিয়মিত কৌশল বলা যায়। ক্যাথোলিক চার্চের ১৫০০ বছরের শাসনামলে একেশ্বরবাদীদের পুড়িয়ে মারা একটা নিয়মিত ঘটনা ছিল বলা যায়। শুনলে গা শিউরে উঠবে যে এভাবে Trinitarian চার্চ প্রায় ১২ মিলিয়ন মানুষকে হত্যা করেছে! 'মধ্যযুগীয় বর্বরতা' যে টার্মটা আমরা ব্যবহার করি, সেটা আসলে এসেছে এখান থেকেই।[51]

আমরা হয়তোবা সূরা বুরুজের তাফসীর পড়েছি। অনেক মুফাসসির বলেন যে ওখানে যে কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে হত্যা করা হচ্ছে একেশ্বরবাদী ক্রিস্টানদের।

আবার এটাও কথিত আছে যে সূরা কাহফে বর্ণিত আসহাবুল কাহফের তরুণেরা আসলে ছিল একেশ্বরবাদী ক্রিস্টান, মানে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত অনুসারী।

---

[51] In his History of The Inquisition of The Middle Ages, Henry Charles Lea brings the full horror of the invaders' overzealousness into sharp focus: From infancy in arms to tottering age, not one was spared—seven thousand, it is said, were slaughtered in the Church of Mary Magdalen to which they had fled for asylum—and the total number of slain is set down by the legates at nearly twenty thousand....

Lea, Henry Charles. Vol. I, p. 154

যাই হোক ট্রিনিটিয়ান চার্চ এভাবে শুধু মানুষগুলোকে হত্যা করেছে তা না ওদের স্বপক্ষের সকল দলীল, রেকর্ড সবকিছু ধ্বংস করেছে। আর তাই তো ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিষ্যদের শিক্ষা প্রতিফলিত হয় এমন তেমন কোনো কিছুই আজ আর অবশিষ্ট নেই।

ওদের মতবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে ওরা আরো একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে। সেটা কী কেউ কি আন্দাজ করতে পারেন?

শিকড়ের সন্ধানে-৬২

আরো যে কাজটা ট্রিনিটিয়ান চার্চ করেছে সেটা হচ্ছে সাধারণ মানুষদের জন্য বাইবেল পড়া নিষিদ্ধ করে রেখেছিল। নিচে অপেশাদার মানুষদের জন্য বাইবেল পড়া নিষিদ্ধ করার বিভিন্ন অনুশাসনের মাঝে দুটি উল্লেখ করা হলঃ

The church council of Toulouse 1229 AD:

"Canon 14: We prohibit also that the laity should not be permitted to have the books of the old or new Testament; we most strictly forbid their having any translation of these books."[52]

"Canon 2: No one may possess the books of the old and new Testaments, and if anyone possesses them he must turn them over to the local bishop within eight days, so that they may be burned...." [53]

অফিসিয়াল কারণ হিসেবে ওরা কী বলতো? ঈশ্বরের বাণী মানুষের নৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য উন্মুক্ত । কিন্ত সাধারণ মানুষ যদি এটা পড়ে তাহলে এটা তাদের ভুলপথে নিয়ে যেতে পারে কারণ এটা বোঝার মত বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা সবার থাকে না।

কিন্তু আসলে কারণটা কী ছিলো? এই সিরিজটা পড়ার পর এতক্ষণে নিশ্চয়ই আমরা বুঝে গেছি যে আসল কারণটা ছিলো ট্রিনিটিয়ান চার্চের মতবাদের অসাড়তা, বাইবেলের সাথে সম্পর্কহীণতা! ২০১৩ সালে ডঃ বার্নার্ড স্টার "Jesus Uncensored- Restoring the Authentic Jew" নামে একটা ইন্টারেস্টিং বই লেখেন। বইতে তিনি লিখেছেন,

'সত্য হল যীশু একটি প্র্যাক্টিসিং ইহুদী পরিবারেই জন্মেছিলেন যারা ইহুদী ধর্মের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। তাওরাত এ উল্লেখ আছে যে, তাকে জন্মের অষ্টম দিন খৎনা করানো হয়। তিনি তার পুরো জীবনেই সম্পূর্ণভাবে ইহুদী ধর্ম, তাওরাত এবং ইহুদী রীতিনীতির প্রতি সমর্পিত ছিলেন। তিনি সিনাগগ (Synagogues) এ প্রার্থনা করতেন এবং ইহুদী ধর্মের অনুসারীদের দলে দলে তাওরাত শিক্ষা দিতেন। এসব কিছুই গসপেল গুলোতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে।"

---

[52] Heresy and Authority in Medieval Europe, Scholar Press, London, England

[53] D. Lortsch, Historie de la Bible en France (1910) p.14.

ডঃ স্টার তার বইতে আরো বলেছেন,

“Jew” শব্দটি নিউ টেস্টামেন্ট এ এসেছে ২০২ বার এবং গসপেলে এসেছে ৮২ বার যেখানে গসপেলে “Christian” শব্দটির কোনো উল্লেখ নেই এবং নিউ টেস্টামেন্টের পরবর্তী অংশে শুধুমাত্র তিনবার “Christian” শব্দটি এসেছে। এটা আমি যখন খ্রিস্টানদের জানালাম তারা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল।‘’

তার প্রশ্ন হচ্ছে যে কেন গসপেলে “Christian” এর অনুপস্থিতি যেটা যীশুর জীবন এবং কর্ম নিয়ে বলা? তিনি নিজেই বলছেন যে-কারণ যীশুর জীবদ্দশায় খ্রিস্ট ধর্মের কোনো উপস্থিতি ছিলনা।”

লেখক যীশুর ধর্ম সম্পর্কে বাইবেল থেকে নিচের পয়েন্টগুলো নিয়েছেনঃ

১। যীশু যাদের সাথে মিশতেন তারা সবাই ছিলেন ইহুদি। যীশু তাওরাত পড়তে ভালোবাসতেন এমনকি জেরুজালেমের উপাসনালয়গুলোতে নিয়মিত ধর্ম প্রচার করতেন। তিনি যদি ইহুদি না হতেন তাহলে এটা সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব ছিল। তারা তাকে Rabbi Yeshua বলে ডাকে ।

২। না যীশু, না ম্যারি , না যোসেফ কিংবা John the Baptist কিংবা কোনো শিষ্য, কখন ও খ্রিস্টিয়ানিটি নামে নতুন ধর্ম শুরু করেছিলেন ,না তারা নিজেদের অরিজিনাল ইহুদি ধর্ম থেকে আলাদা হয়ে নতুন কোনো ধর্ম শুরুর ইচ্ছে পোষণ করেছিলেন।

ডঃ স্টার এর উপরোউল্লিখিত বর্ণনা মতে, চার্চ এজন্যই সাধারণ মানুষজন থেকে বাইবেল কে দূরে রাখত যাতে করে তারা যীশুর সত্যিকারের ধর্ম না জেনে যায়, যেটা ছিল ইহুদীধর্ম।

তাছাড়াও তখনকার চার্চ গুলো চালিত হত বিশাল যাজকীয় এবং পার্থিব ক্ষমতা দিয়ে , এবং পরিণামে একদম মূল থেকেই এটি দূষিত হয়ে পড়েছিল। যারা এটি পরিচালনা করতেন তারা চাইতেন না সাধারণ মানুষ বাইবেল এর শিক্ষা এবং তাদের কৃতকর্মের তুলনা করে চার্চের ভুল দেখিয়ে দিক । চার্চের নেতারা ভেবেছিল যদি বাইবেল সবার হাতে হাতে পৌছে যায় তাহলে তাহলে সাধারণ মানুষ এর বিষয়বস্ত এবং অলংকরণ দেখে বুঝে যাবে এটি Mithraism থেকে ধার করা, এবং এটি যীশুর সত্যিকারর ধর্ম থেকে পুরাটাই বিচ্যুত।

আমরা কি হাসছি ওদের কাজকর্ম দেখে? এই জায়গায় এসে আমাদের চিন্তার অনেক খোরাক আছে। কারণ আমাদের অনেকের মাঝেই ধারণা আছে যে কুরআন হাদীস সাধারণ মানুষের জন্য না। কথাটা কী বাইবেল নিষিদ্ধ করার কারণের মত শোনায় না? এটা সত্যি যে অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী, সবাই আলিম হবে না, হওয়া সম্ভবও না।

তাহলে সমাধানটা কী?

আমার কাছে মনে হয় যে কতটুকু জ্ঞান অর্জন ফরয, সেই লেভেলটাকে আমরা অনেক নিচে নামিয়ে এনেছি। আমি যদি এখন কাউকে বলি যে ইসলামি স্টাডিজ এ আমার একটা ব্যাচেলর আছে IOU থেকে, যেখানে আমরা Usoon al fiqh, Usool at tafseer, Usool al hadith ইত্যাদি টপিকের উপরে কোর্স করেছি, মানুষ আপনাকে স্কলার হিসেবে বিবেচনা করা শুরু করে দিবে। এইখানেই সমস্যাটা। আমি খুব দৃঢ়, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে IOU তে আমাদেরকে যা পড়ানো হয়, সেটা ফরয মানে ব্যাসিক লেভেলের জ্ঞান। এখন মুসলিমদের অবস্থা এত করুণ হয়ে গেছে বলে এই জ্ঞানগুলো ব্যাচেলর লেভেলে পড়ানো হচ্ছে। এগুলো একদম ছোটবেলা থেকে আমাদের জেনে বড় হওয়া উচিৎ ছিলো।

একদম ছোট্ট একটা উদাহরণ দেই, এই শিকড়ের সন্ধানে লেখার সময়েই সুলাইমান আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে লেখার সময় আমি তাবিজ-কবজ, জ্বীনে বিশ্বাস এগুলো নিয়ে যা লিখেছি, আমি হলফ করে বলতে পারি যে এগুলা প্র্যাক্টিসিং মুসলিমদের একটা বিশাল মানে বিশাল অংশের সিস্টেমেটিক ভাবে জানা নেই। অথচ তাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় তাদের সূরা নাস মুখস্থ আছে নাকি, তারা সবাই বলবে তাদের সূরা নাস মুখস্থ আছে! কী অস্বাভাবিক কিন্তু ভয়াবহ রকমের বৈপরীত্ব!

অথচ চিন্তা করে দেখুন এটা কি একদম ছোট্টবেলায় শেখা আক্বীদা শিক্ষার সাথে জেনে নেয়ার কথা ছিলো না?

এরকম বহু উদাহরণ দেয়া যাবে। বহু!

কথা প্রসঙ্গে একটা জিনিস বলতে চাই, অনেক মানুষ পড়াশোনা করে, তবু ভুল জিনিসই শেখে।

কেন?

কারণ তারা ভুল জনের কাছে শেখে।

কিভাবে বুঝবো যে আমি কোনো ভুল মানুষের কাছে শিখছি কী না? কঠিন প্রশ্নের একটা সহজ উত্তর আছে!

আল্লাহ আমাদেরকে দিনের মাঝে ১৭বার একটা দুআ করা ফরয করে দিয়েছেন-ইহদিনাস সিরাত্বাল মুস্তাক্বীম।

এটা মনে হয় একমাত্র দুআ যেটা করা আল্লাহ আমাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন।

কেন আল্লাহ এটা প্রতিদিন এতবার করে পড়তে বলেছেন? কারণ হিদায়াত কোনো constant বিষয় নয়। একবার পাইলে সেটার উপর মৃত্যুবরণ করা একটা বিশাল চ্যালেঞ্জ।

তবে এক্ষেত্রে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে দুআ পড়াটা যেন স্রেফ একটা অভ্যাসে পরিণত না হয়। আশা করি মনে আছে যে একটা পর্বে আমরা ব্যাখ্যা করেছিলাম যে কখন জ্ঞান থাকা স্বত্বেও হৃদয় কঠিন হয়ে যায়----------ইবাদাতের নিয়ম কানুনগুলো যখন প্রাত্যহিক জীবনের স্রেফ অভ্যাসে পরিণত হয়, হৃদয়কে আর জীবন্ত করে না!

তবে আমাদের সবার মাঝে এই humility টা থাকা উচিৎ যে আমিও ভুল হতে পারি। সেজন্য আল্লাহর কাছে ফুরক্বান চেয়ে কান্নাকাটি করার বিকল্প নাই।

শিকড়ের সন্ধানে-৬৩

আমি ভুল মানুষের কাছে পড়ছি কী না সেটা বোঝার আরো একটা উপায় আছে-সেটা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির আবিষ্কার- আমাকে empower করছে নাকি অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে বলছে সেটা চেক করা। কোনো একটা বিশেষ টপিকে কথা এড়িয়ে যাচ্ছে নাকি খোলামেলা আলোচনা করছে। আমার কনফিউশনগুলোকে এড়িয়ে যাচ্ছে কী না.....

তবে আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি একটা কথা বলতে চাই। এটা আমি মালয়শিয়াতে পড়ার সময় আমাদের IIUM এর একজন শিক্ষক কথাটা বলেছিলেন। উনি বলেছিলেন যে একটা মানুষের পক্ষে কখনোই ইসলামের সব শাখার ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব না। তাই Islamic scholarship এর ক্ষেত্রেও আমাদের স্পেশালাইজেশন দরকার। কেউ যদি ইসলামের ক্রিমিন্যাল ল নিয়ে কথা বলে, তার উচিৎ দেশীয় আইন নিয়েও পড়াশোনা করা। কনভেনশন্যাল এবং ইসলামী পড়াশোনার মাঝে একটা কম্বিনেশন থাকা দরকার। এটার সবচেয়ে বড় উদাহরণ মনে হয় ইসলামী অর্থনীতির ফিল্ড। যেসব আলিমরা ইসলামী অর্থনীতির ব্যাপারে দিক নির্দেশনা দেন, তাদের অধিকাংশেরই প্রচলিত অর্থনীতির খুঁটিনাটি নিয়ে পড়াশোনা নেই। আমি নিজে যেহেতু এই ফিল্ড নিয়ে সামান্য পড়াশোনা করছি তাই এই সমস্যার ভয়াবহতাটা আমি খুব টের পাই।তাই আমার জীবনের একটা স্বপ্ন হচ্ছে- অর্থনীতিবিদ যারা প্রচলিত অর্থনীতি নিয়ে পড়েছেন, তাদের সাথে স্কলারদের একটা সেতুবন্ধন রচনা করা, এমন প্রতিষ্ঠান তৈরি করা যেখানে ২টা ফিল্ড একসাথে rigorously পড়ানো হবে। আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান কেন যেন বলে যে অনেক ফতওয়াই বদলে যেত যদি তারা প্রচলিত অর্থনীতির খুঁটিনাটি জানতেন, এবং আল্লাহই ভালো জানেন।

আমি আরো দেখেছি যে কিভাবে আমরা স্কলারদের idolization করি। ঊনারাও মানুষ, ঊনাদেরও কনফিউশন হতে পারে! আমাদের আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে একা, এটা যেন আমরা ভুলে না যাই।

যাই হোক, প্রসঙ্গে আসি, আমি এই যে ক্রিস্টান ধর্মের এই বিবর্তন নিয়ে পড়াশোনা করলাম, এটা করতে গিয়ে আমি একটা বিষয় লক্ষ্য করলাম, যেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হচ্ছে যে এই জ্ঞানটা- ধরেন আজকের ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের রূপটা এসেছে রোমান প্যাগান ধর্ম থেকে, বাইবেলে যদিও আছে ঊনার জন্ম হয়েছিল গ্রীষ্মে (কারণ পাকা খেঁজুর খেতে বলা হয়েছিল), তবুও ২৫ শে

ডিসেম্বর জন্মটা আসলে Horus এর সাথে মিলে যায়, সব উৎসব সৌর বছর হিসাব করে যদিও এমনিতে এগুলো হওয়ার কথা চান্দ্র মাস হিসেবে, নিউ টেস্টামেন্ট ভর্তি যে contradiction, কে লিখেছে কিছুই জানা যায় না, কোনো ভাবেই এগুলাকে ঐশী বাণী মনে করা যায় না ইত্যাদি.....এগুলা জেনে বহু মানুষ ধর্ম জিনিসটাকেই মানব রচিত প্রতিষ্ঠান ভাবা শুরু করে এবং নাস্তিক হয়ে যায়!

যারা এই লেখাটা মন দিয়ে পড়েছেন তারা দেখবেন যে ডঃ লরেন্স ব্রাউন একজন বাইবেল স্কলারের বইয়ের প্রচুর রেফারেন্স দিয়েছেন-Dr Bart D Ehrman.আমার একটা স্বভাব হচ্ছে যে আমি এরকম কারো অনেক কাজের নাম শুনলে তার নাম দিয়ে সার্চ দেই, জীবনী জানতে ইচ্ছা করে। এই কাজ ঊনার ক্ষেত্রেও করলাম। প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি করা, যোগ্যতার লেভেল নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যারা ইউনিভার্সিটি গুলোর র‍্যাংকিং নিয়ে খোঁজ খবর রাখেন...তো ঊনার বেশ কয়েকটা সাক্ষাৎকার শুনলাম। সেখানে ঊনি নিজের ধর্মীয় বিশ্বাসের বিবর্তনের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে প্রথমে ঊনি Hard core evangelic Christian ছিলেন, তারপর liberal Christian এবং এখন একজন Agnostic. যত পড়াশোনা করেছেন, তত ঊনি বুঝেছেন যে স্রষ্টার অস্তিত্বটাই আসলে প্রশ্নের সম্মুখীন। ঊনার একটা কথা খুব ভালো লেগেছে, ঊনি বলেছেন যে ঊনি যখন Hard core evangelic Christian ছিলেন তখন ঊনি বোঝার চেষ্টা করতেন যে How God became a man মানে God Incarnation এর কন্সেপ্টটা বোঝার চেষ্টা করতেন। ঊনার পড়াশোনা যত বাড়তে থাকলো, ঊনি বুঝলেন যে প্রসেসটা আসলে উলটা- মানে How a man became God হচ্ছে আসল ইতিহাস।

ইউটিউবে একটা খুব বিখ্যাত ভিডিও আছে Horus - The REAL Story Behind Jesus Christ নামে, যেটার শুরুতে একজন কমেডিয়ান আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারটা নিয়ে হাসাহাসি করছেন।

আমাদের দেশে এখন যেসব নাস্তিক্যবাদী ব্লগ তৈরি হয়েছে, তাদের সবগুলোতে আমি একটা কমন ট্রেণ্ড দেখতে পাই। প্রথম ধাপ হচ্ছে সকল ধর্মকে এক কাতারে ফেলা, তারপর ক্রিস্টান ধর্মের এইসব ইতিহাস তুলে ধরে ধর্ম জিনিসটাকেই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা। সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের একটা কথিত সংঘর্ষ তুলে ধরা- মধ্যযুগে চার্চ বিজ্ঞানীদের সাথে কী করেছে সেসব কাহিনী বলে এই কাজটা করা হয়। তারপর কুরআনেও এমন সংঘর্ষ তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করা।

কিন্তু আসলে কী ব্যাপারটা তাই? মুসলিমদের স্বর্ণ যুগে যত বিজ্ঞানী গবেষণা করেছেন, তারা তো সবসময় কুরআন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। কেউ কি এমন একটা উদাহরণ তুলে ধরতে পারবেন যে কোনো মুসলিম বিজ্ঞানীকে হত্যা করা হয়েছে কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক কিছু আবিষ্কার করার জন্য? যারা মধ্যযুগে ইউরোপের ইতিহাস পড়েছেন তারা ওদের রেনেসার কথা পড়েছেন, কিন্তু এই রেঁনেসাটা আসলো কোথা থেকে, কাদের থেকে? ইসলামে কি প্রশ্ন করা নিষেধ? আল্লাহ কি কুরআনে বারবার চিন্তা করতে বলেন নাই? Trinity র মত যুক্তি বুদ্ধিহীণ কন্সেপ্ট যে ধর্মের ভিত্তি তা যে মানুষকে চিন্তা করতে, যুক্তিবাদী হতে অনুৎসাহিত করবে এটাই কি স্বাভাবিক নয়?

সবচেয়ে কষ্টের বিষয় হচ্ছে এইসব ছাইপাঁশ পড়ে জন্মসূত্রে মুসলিমরা যখন ইসলাম নিয়ে সন্দিহান হয়। কবে আমরা মুসলিমরা একটু পড়াশোনা করা জাতি হবো?

ডঃ লরেন্স ব্রাউনের ইসলাম গ্রহণের কাহিনীর একটা অংশ পড়ে আমার খুব কষ্ট লেগেছিলো, ঊনি বলছিলেন যে Islam was the last religion that I considered to be true. I tried all others. কেন? আমার এখানে যত মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে, তারা সবাই নিজ উদ্যোগে তুলনামূলক ধর্ম ত্বত্ত নিয়ে পড়াশোনা করে, তারপর ইসলাম গ্রহণ করে। এমন আমি শুনি নি যে মুসলিম প্রতিবেশী, কলিগ, ক্লাসমেট ইত্যাদিদের দেখে ইসলামের প্রতি আগ্রহী হয়েছে। আমার জানায় ভুল থাকতে পারে কিন্তু আমি যত মানুষের ইসলাম গ্রহণের কাহিনী পড়েছি, সবগুলা এমনই ছিলো। অথচ আগে কি এমন ছিলো? সবসময় মুসলিমদের চরিত্র দেখে মুগ্ধ হয়ে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করতো।

এখন সেটা কি হয়? কেন হয় না?

কারণ সিম্পল- আমরা flag bearer হবার বদলে blind follower হয়ে গেছি। নাইলে এইসব পশ্চিমা দেশে মুসলিমের সংখ্যা কি কম? অবশ্য কারা মুসলিম বুঝবোই বা কিভাবে! দেখে চেনার তো উপায় নেই!

আমি খুব খুব ভয় পাই এটা চিন্তা করে যে আমার অমুসলিম প্রতিবেশী, কলিগ, ক্লাসমেটরা যদি কিয়ামতের দিনে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী হয় যে আমি ওকে ইসলামের ব্যাপারে জানাই নি? আমি কি পারবো সেই পরীক্ষায় পাশ করতে?

শিকড়ের সন্ধানে-৬৪

বলেছিলাম যে যারা সত্যান্বেষী তারা নিজেরা পড়াশোনা করেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে ইসলামই হচ্ছে সেই সত্য ধর্ম যা আল্লাহর কাছ থেকে আগত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে তারা নিউ টেস্টামেন্টের মাঝে এত কনফ্লিক্ট দেখেও কেন নাস্তিক হয়ে যায় না?

কারণটা আমার কাছে একটা মিরাক্যল মনে হয়। শিকড়ের সন্ধানের এই পুরা সিরিজটা ধরে আমি একটা জিনিস বোঝাতে চেয়েছি যে যত বিকৃতি আর পরিবর্তনই করার চেষ্টা করা হোক না কেন সাধিত হোক না কেন, তত টুকুই করা সম্ভব হয়েছে আল্লাহ যতটুকু allow করেছেন। আল্লাহ কতটুকু allow করেছেন? যতটুকু বিকৃতির পরও সত্যান্বেষীরা সত্য খুঁজে পাবে!

আমরা আমাদের শিকড়ের সন্ধানের প্রচেষ্টার একদম শেষের দিকে চলে এসেছি আলহামদুলিল্লাহ। এই পর্যায়ে এসে আমরা যে ব্যাপারটা নিয়ে আলোকপাত করবো, সেটা হচ্ছে যে কিভাবে আজকের বাইবেলও আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে ভবিষ্যৎ বাণী করেছে।

বাইবেল অনুসারে john the Baptist যখন baptism করা শুরু করলো তখন তৎ কালীন ইহুদীরা তাকে জিজ্ঞেস করলো যে কোন authorityতে সে এই কাজ করছে। তখন ওরা ওনাকে যে প্রশ্নগুলো করলো, সেটা থেকে বোঝা যায় যে ওরা তিনজন স্বত্তার জন্য অপেক্ষা করছিলো।

"And this is the record of John when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, 'Who are you?' And he confessed, and denied not; but confessed, 'I am not the Christ.' And they asked him, 'What then? Are you Elijah? And he said, 'I am not.' 'Are you that Prophet?' And he answered, 'No.'" (John, 1: 19-21).

যখন ঈসা আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, তিনিই সেই উল্লেখিত মাসীহ তখন ইহূদীরা তাকে ইলিয়াসের ব্যাপারে প্রশ্ন করল। কারণ তাদের একটা ভবিষ্যৎ বাণী ছিল এমন যে মাসীহ এর আগে নবী ইলিয়াস এর আগমন ঘটবে। ঈসা আলাইহিস সালাম তাদের এই ব্যাপারে নিশ্চিত করেছিলেন এভাবে,

And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come, and restore all things. But I say unto you, That Elias is come already (Matthew 17:11-12, KJV)

কিন্তু ইহুদীরা তো ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো কথা মানতেই রাজি ছিলো না..... তাই ওরা আবার John কে জিজ্ঞাসা করলো। এখন প্রশ্নের ধরণ থেকেই বোজা যাচ্ছে যে এরা আলাদা আলাদা স্বত্তা ছিলেন। John তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিল তিনজন ভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কেঃ খ্রিস্ট, ইলিয়াস এবং "সেই নবী"। John এর গসপেলের আগের কোনো অংশেও "সেই নবী" সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা নেই, অন্য আরো যে গসপেল আছে সেগুলোতেও এর উল্লেখ নেই। তাহলে "সেই নবী" বলতে এখানে কার কথা বলা হয়েছে? খ্রিস্টান ব্যাখাকারকগণ যুক্তি দিয়েছেন, "সেই নবী" বলতে যীশুখ্রিস্ট কে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এটাকে সমর্থন করে এমন কোনো প্রমাণ "John the Baptist" এর কথায় পাওয়া যায় না এবং যে গসপেল্গুলো রয়েছে তাতেও এর সম্পর্কিত কোনো প্রমাণ নেই।

বাইবেলের concordance[54] এর নোট নোট সেকশনে বলা হচ্ছে যে এই "সেই নবী" Deuteronomy[55] 18 তে যে Prophecy র কথা বলা হয়েছে, সেটা। আসুন সেই অংশটুকু দেখি যেখানে মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাচ্ছেন-

The Lord thy God will raise up unto thee a Prophet from the midst of thee, of thy brethren, like unto me; unto him ye shall hearken; According to all that thou desiredst of the Lord thy God in Horeb in the day of the assembly, saying, Let me not hear again the voice of the Lord my God, neither let me see this great fire any more, that I die not. And the Lord said unto me, They have well spoken that which they have spoken. "I will raise them up a Prophet from among their brethren, like unto thee, and will put my words in his mouth; and he shall speak unto them all that I shall command him." (Deuteronomy 18: 15-18)

[54] A concordance is an alphabetical list of the principal words used in a book or body of work, listing every instance of each word with its immediate context. Only works of special importance have had concordances prepared for them, such as the Bible, Qur'an etc

[55] Deuteronomoy হচ্ছে তাওরাত এবং খ্রিস্টান ওল্ড টেস্টামেন্ট এর পঞ্চম বই।

এখন এই অংশটা মন দিয়ে পড়লেই বোঝা যায় যে This Prophet like Moses ঈসা আলাইহি ওয়া সাল্লাম নন বরং আমাদের রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কেন?

কারণ অনেকগুলো।

১। ঊনি বলছেন of thy brethren, মানে বনী ইসরাঈল নয়, অন্য একটা জাতি, নাহলে বলা হত "তোমাদের মধ্যে" বা আমাদের মধ্যে।

২। মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বাভাবিক এবং প্রাকৃতিক নিয়মেই একজন নারী এবং পুরুষের মাধ্যমে জন্ম হয়েছে, কিন্তু ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে এক বিশেষ আশ্চর্য প্রক্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন।

৩। মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিয়ে করেছিলেন এবং সন্তান জন্ম দিয়েছিলেন, কিন্তু ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লা মের ব্যাপারে এমন কিছু জানা যায় না।

৪। মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উভয়েই তাদের লোকদের জন্য নতুন বিধি এবং আইন নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসেছিলেন মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ের বিধি-আইন কে সম্পূর্ণ করতে।

৫। মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উভয়েই স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন এবং তাদের দাফন করা হয়। ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তুলে নিয়েছেন। [যদি আমরা ক্রিস্টানদের মত গ্রহণ করি, তাও ঊনার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নাই মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মত]

৬। মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুজনেই তাদের জীবদ্দশায় মোটামুটিভাবে সবার কাছেই নবী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন, কিন্তু ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঊনার সময়ের খুব কম মানুষই নবী হিসেবে মেনে নিয়েছে।

৭। মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উভয়েই নবী হওয়ার পাশাপাশি শাসন করেছেন। কিন্তু ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলায় এমন কিছু ঘটেনি।

৮। মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উভয়েই হিজরত করেছিলেন

৯। ঊনারা দুজনেই মুনাফিক্কদের দ্বারা কষ্ট পেয়েছেন।

শিকড়ের সন্ধানে-৬৫

গত পর্বে উল্লেখিত মূসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাঝে মিলগুলো যখন তুলে ধরা হয় এবং brotheren এর যুক্তি তুলে ধরা হয় তখন তারা দাবী করে যে এখানে ইসরাইল তথা ইয়াকূব আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাইয়ের কথা বলা হয়েছে যার নাম ছিলো Esau। ভালো যুক্তি!

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশ লতিকা ঘাটলে দেখা যায় যে মারইয়াম ছিলেন ইমরানের মেয়ে যার পূর্ব পুরুষ ছিলেন হারুন আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর তিনি ছিলেন একজন Levite। Levites রা ছিলেন Levi এর বংশধর, যিনি ছিলেন ইয়াকূব আলাইহি ওয়াসাল্লামের ১২ জন ছেলের একজন। অর্থ্যাৎ ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিঃসন্দেহে একজন বনী ইসরাইল ছিলেন, Esau এর সাথে ঊনার কোনো সম্পর্ক ছিলো না।

তাই একমাত্র যুক্তি হচ্ছে যে brotheren বলতে ইসমাইল আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরদেরকেই বুঝানো হয়েছে।

তাছাড়া আরো সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। ইসমাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লামের ১২ জন ছেলে ছিলেন, যার মাঝে একজন ছিলেন Kedar। তার কথা Isaiah 42 তে উল্লেখিত ভবিষ্যৎ বাণীতে বলা আছে।

[Behold my servant, whom I uphold, my chosen, in whom my soul delights; I have put my Spirit upon him, he will bring forth justice to the nations.] (1)
[He will not fail or be discouraged till he has established justice in the earth; and the coastlands wait for his law.] (4)

[I am the Lord, I have called you in righteousness, I have taken you by the hand and kept you; I have given you as a covenant to the people, a light to the nations...] (6)

[Let the desert and its cities lift up their voice, the villages
that **Kedar** inhabits; let the inhabitants of Sela sing for joy, let them shout from the top of the mountains.] (11)

[The Lord goes forth like a mighty man, like a man of war he stirs up his fury; he cries out, he shouts aloud, he shows himself mighty against his foes.] (13) (Isaiah 42:1, 4, 6, 11, 13)
যে জায়গায় Kedar এর বংশধররা বসবাস করবে সেটার কথা উল্লেখ করার কথা থেকে বোঝা যায় যে নবী ঊনার বংশধরদের একজন হবেন। আমরা হয়তো বা জানি যে কুরাইশরা এই Kedar এরই বংশধর ছিলো।[56]

এভাবে আমরা দেখছি যে এই prophecy এবং আগের পর্বে উল্লেখিতটা দুইটাতে Justice Establish করার কথা আছে যেটা অবশ্যই রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যায়, ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কোনোভাবেই না।

তাছাড়াও ১৩ নং আয়াতে যে যুদ্ধ করা এবং জয়ের কথা এসেছে, সেটাও রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেই যায়, ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে না।
আরো বলা হচ্ছে যে তারা বাৎসরিকভাবে আল্লাহর গুণগান করবে যেমনটা মুসলিমরা করে থাকে হাজ্জের সময়ে-

“Sing unto the Lord a new song, and his praise from the end of the earth, ye that go down to the sea, and all that is therein; the isles, and the inhabitants thereof.
Let the wilderness and the cities thereof lift up their voice, the villages that **Kedar** doth inhabit: let the inhabitants of the rock sing, let them shout from the **top of the mountains**. Let them give glory unto the Lord, and declare his praise in the islands.” (Isaiah 42:10-12)

“For, behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people, but the Lord shall arise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. And the Gentiles shall come to thy light, and kings to the brightness of thy rising. Lift up thine eyes round about, and see: all they gather

[56] ইয়াসীর ক্বাদী ঊনার সীরাহর শুরুতে পুরা এক পর্ব ধরে রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশ লতিকা নিয়ে কথা বলেন। তখন শুনতে খুবই বিরক্ত লাগছিলো। মনে হচ্ছি এই বোরিং তথ্য জেনে কী হবে! এখন এই পর্ব লিখতে গিয়ে বুঝলাম যে আল্লাহর দুনিয়াতে কোনো জ্ঞানই ফেলনা না যদি ঠিকমত ব্যবহার করা যায়।

themselves together, they come to thee: thy sons shall come from far, and thy daughters shall be nursed at thy side. Then thou shalt see, and flow together, and thine heart shall fear, and be enlarged; because the abundance of the sea shall be converted unto thee, the forces of the Gentiles shall come unto thee. The multitude of camels shall cover thee, the dromedaries of Midian and Ephah; all they from Sheba shall come: they shall bring gold and incense; and they shall shew forth the praises of the Lord. All the flocks of **Kedar** shall be gathered together unto thee, the rams of Nebaioth shall minister unto thee: they shall come up with acceptance on mine altar, and I will glorify the house of my glory. Who are these that fly as a cloud, and as the doves to their windows?" (Isaiah 60:2-8)

এসব কিছুও যদি কারো জন্য যথেষ্ট না হয়, তাহলে নিচের অংশে বলা আছে যে সেই Prophet Mount Paran থেকে আসবে, যেখানে আসলে ইব্রাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবি হাজেরা ও শিশু পুত্র ইসমাঈলকে রেখে এসেছিলেন।

"And he said, the Lord came from Sinai, and rose up from Seir unto them; he shined forth from mount Paran, and he came with ten thousands of saints: from his right hand went a fiery law for them." (Deuteronomy 33:2)
Mount Paran এর পরিচয় আমরা ওদের গ্রন্থ থেকেই পাই-

"And Abraham rose up early in the morning, and took bread, and a bottle of water, and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and the child, and sent her away: and she departed, and wandered in the wilderness of Beersheba...And God was with the lad; and he grew, and dwelt in the wilderness, and became an archer. And he dwelt in the wilderness of Paran: and his mother took him a wife out of the land of Egypt." (Genesis 21:14, 20-21)

তবে একজন মুসলিমের কাছে যেটা সবচেয়ে চমকপ্রদ সেটা হচ্ছে যে বলা হচ্ছে যে সেই নবী হবেন Illiterate.

“And the book is delivered to him that is not learned, saying, ‘Read this, I pray thee’ and he saith, ‘I am not learned.’” (Isaiah 29:12)
এখানে যে ঘটনাটার কথা বলা হচ্ছে সেই কাহিনীটা কি আমাদের জানা? চেনা চেনা লাগে?

শিকড়ের সন্ধানে-৬৬

আমাদের যাদের রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী প্রথমবার নাযিল হওয়ার ঘটনাটা জানা আছে তারা সবাই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি যে আগের পর্বে উল্লেখিত ঘটনাটা নিঃসন্দেহে সেই কাহিনীই বর্ণনা করছে।

তাছাড়া ওদের গ্রন্থেই আছে যে আল্লাহ ইব্রাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লামের থেকে একাধিক জাতি উৎপন্ন করবেন-

Then Abram fell on his face; and God said to him, "Behold, my covenant is with you, and you shall be the father of a multitude of nations. No longer shall your name be Abram, but your name shall be Abraham; for I have made you the father of a multitude of nations. I will make you exceedingly fruitful; and I will make nations of you, and kings shall come forth from you." (Genesis 17:3-6)

যাই হোক, ভবিষ্যৎবাণীর এখানেই শেষ নেই। আরো আছে। ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঊনার লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন-

Jesus saith unto them, Did ye never read in the scriptures, The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner: this is the Lord's doing, and it is marvelous in our eyes? Therefore, say I unto you, The kingdom of God shall be taken from you, and given to a nation bringing forth the fruits thereof. And whosoever shall fall on this stone shall be broken: but on whomsoever it shall fall, it will grind him to powder. (Matthew 21:42-44, KJV)

এখন ক্রিস্টানদের কথা হচ্ছে যে এখানে rejected stone বলতে বুঝানো হয়েছে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেকে!

আমার কাছে না ওদের এই যুক্তি গুলো এত খোঁড়া লাগে কী বলবো। কেউ আয়াতটা একবার মন দিয়ে পড়লেই বুঝবে যে এখানে একটা জাতির কথা বলা হয়েছে- The Kingdom of God *will be taken from* you, and *given to a nation* producing the fruits of it, যেটা বনী

ইসরাইল হবে না, কারণ তাদের কাছ থেকে নিয়ে অন্যদের দেয়া হবে। এর চেয়ে দ্ব্যর্থহীণ ভাষা আর কী হতে পারে!
আরো আছে, ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম একেবারে সম্পূর্ণ রূপে প্রত্যাখ্যাত হন নাই যেভাবে ইসমাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম হয়েছিলেন। তাছাড়া ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বলছে "the rejected stone becoming the head of the corner" , ঊনি ভবিষ্যতের কথা বলছেন। তবে আমার কাছে যেটা সবচেয়ে আকর্ষণীয় লাগে এবং যেটার কথা আমি বিভিন্ন রিভার্ট মুসলিমদের সাক্ষাৎকারে শুনেছি সেটা হচ্ছে যে ওদের গসপেলেই আছে যে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিশন সম্পূর্ণ হয় নি। ঊনি ঊনার বিদায়ী সম্ভাবষণে শিষ্যদেরকে বলেছেন যে ঊনি আল্লাহর কাছে না যাওয়া পর্যন্ত আরেকজন আসবে না। আমরা একটু খেয়াল করে নিচের অংশটুকু পড়ি-

Nevertheless, I tell you the truth; It is expedient for you that I go away: for if I go not away, the **Comforter** will not come unto you; but if I depart, I will send him unto you. And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment (John 16:7-8)

এখানে যে শব্দটার অনুবাদ করা হয়েছে Comforter, সেটা একটা গ্রীক শব্দ- Paracletos or Perycletos. ওদের দাবী হচ্ছে যে এখানে holy spirit এর কথা বলা হয়েছে, যেটা ট্রিনিটির একটা অংশ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ট্রিনিটির অংশ যখন, তখন নিশ্চয়ই এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কন্সেপ্ট। তাহলে সেটা চারটা গসপেলের মাঝে শুধু John তেই স্থান পেল কেন! এই শব্দ বাইবেলে পাঁচবার এসেছে, প্রত্যেকটাই শুধু এখানেই। এত গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক বাকি ৩জন একবারের জন্য উল্লেখও করলেন না!
সত্য কথা হচ্ছে যে এই শব্দটার অনুবাদ Comforter করাটাই ঠিক না, এটার সঠিক অনুবাদ হচ্ছে “helper, defender, mediator, consoler.”[57] কিংবা “advocate, helper.”[58] এই অর্থের সাথে আগের অর্থের পার্থক্য কী? পরের অর্থগুলোতে একটা physical entity বুঝায়। এভাবে অনুবাদ করা হলে সেটাকে holy spirit হিসেবে চালিয়ে দেয়া কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু এখানে যে একজন নবীকে বোঝানো হচ্ছে, holy spirit কে না সেটার পক্ষে আমাদের যুক্তি কী?

[57] New Catholic Encyclopedia. Vol 10, p. 989.

[58] Kittel, Gerhard and Gerhard Friedrich. p. 782.

আমরা কি আমাদের পক্ষে আনতে চাচ্ছি ওদের বইকে? Intellectually কি আমরা honest থাকছি? আসলে উল্লেখিত অংশের পরের আয়াতগুলো পড়লেই বুঝা যায় যে এখানে God এর অংশের কথা বলা হচ্ছে না-

[I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak: and he will show you things to come. He shall glorify me: for he shall receive of mine, and shall shew it unto you.] (John 16:12-14)

for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak- এই অংশ পড়লেই বোঝা যায় যে আল্লাহ ঊনাকে কিছু শিখাবেন, ঊনি নিজে থেকে কিছু বলবেন না।

এই অংশটা পড়ে কারো কি কিছু মনে পড়ছে? কিছু চেনা চেনা লাগছে?

আমার মনে হচ্ছে সূরা নাজমের ৩ নং আয়াত যেখানে আল্লাহ রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে বলছেন-
Nor does he speak from [his own] inclination.

আরো বলা হচ্ছে যে ঊনি ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসা করবেন। আমাদের আগের পর্ব গুলো থেকে এটা নিশ্চয়ই পরিষ্কার যে ইহুদীরা যখন ঊনাকে ভণ্ড মাসীহ বলছিল আর ক্রিস্টানরা ঊনাকে আল্লাহর ছেলে বানিয়ে দিয়ে অসম্মানিত করছিলো তখন রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে ঊনার প্রকৃত সম্মান পুনরুদ্ধার করেন।

তাছাড়া বাইবেলের অন্যান্য যেসব অংশে Paracletos শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে সেখান থেকেও এটার অর্থ সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়া যায়।

And I will pray the Father, and He will give you another comforter [i.e., paraclete], that he may abide with you forever, even the Spirit

of truth, whom
the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him; but you kn ow him, for he dwells with you and will be in you."

এখানে Paracletos শব্দের আগে একটা বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে- allos. এই গ্রীক শব্দের অর্থ হচ্ছে "'the other,' বা another.
ওদের যুক্তি হিসেবে Paracletos মানে যদি Holy spirit হয় তাহলে কয়টা Holy spirit আছে?

এতগুলো ভবিষ্যৎ বাণীর পর কি আর কোনো সন্দেহ থাকতে পারে যে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের ব্যাপারে বলে গিয়েছিলেন?

শিকড়ের সন্ধানে-৬৭

আগের কয়েক পর্ব পড়ার পর নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে যে এইসব কিছুর শেষ কোথায়, পরিণতি কী.....! এটা নিয়ে কুরআন আমাদেরকে খুব সুন্দর একটা বিষয় জানাচ্ছে-

আর আহলে-কিতাবদের মধ্যে যত শ্রেণী রয়েছে তারা সবাই ঈমান আনবে ঈসার উপর তার মৃত্যুর পূর্বে। আর কেয়ামতের দিন তাদের জন্য সাক্ষীর উপর সাক্ষী উপস্থিত হবে। (৪:১৫৯)

অর্থ্যাৎ ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পূর্বে সবার ঊনার ব্যাপারে এইসব ভুল ধারণার অবসান ঘটবে। আমরা সবাই হয়তো বা জানি যে দুনিয়ার একদম শেষ সময়ে ঊনার আগমন ঘটবে [59]এবং ঊনিই দাজ্জালকে হত্যা করবেন। তার আগে দুনিয়াতে ইমাম মাহদী থাকবেন যিনি ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের পর ঊনাকে সালাতের ইমামতি করতে বলবেন, কিন্তু ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেটা প্রত্যাখ্যান করবেন এবং ইমাম মাহদীর ইমামতিতে আসরের সালাত আদায় করবেন।[60]

এটা থেকে কী বোঝা যায়? ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে একজন নবী হয়েও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন উম্মাতের নেতৃত্বে সালাত আদায় করবেন। এটা শেষ নবী হিসেবে আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ।

এগুলো আমরা কোথা থেকে জানতে পারি? সহীহ হাদীস থেকে। এ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস আমি উল্লেখ করছি।

"There is no prophet between me and him (Jesus), and he shall descend. He... will stay in the world for forty years; then he will die and the Muslims will offer the funeral Prayer for him." (Abu Dawood, Ahmed)

---

[59] "He (the son of Mary) shall be a known sign of the Hour; so have no doubt concerning it and follow Me." (Quran 43:61)

[60] ঘটনা প্রবাহের উপর বেশ ভালো একটা আর্টিকেল আছে এখানে- https://www.islamreligion.com/articles/365/return-of-jesus-part-3/

"The Hour will not come until you see ten signs: the smoke; the False Messiah; the Beast; the sun rising from the West; the descent of Jesus son of Mary; the Gog and Magog; and three tremors - one in the East, one in the West, and one in Arabia, at the end of which fire will burst forth from the direction of Aden and drive people to the place of their final assembly." (Ahmed)

তবে এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখা ভালো, এই শেষ সময়ের ঘটনাবলী বিশেষ করে দাজ্জাল সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ বাণী খুব বেশী মাতামাতি করাটা ব্যক্তিগতভাবে আমার অপছন্দ। লেবু বেশী কচলালে যেমন তিতা হয়ে যায়, আমার অবস্থা হয়েছে তেমন। ইসলামে আসার প্রথম দিকে আমি পবিত্র কুরআনে জেরুজালেম বইটা বা Arrival সিরিজটা নিয়ে অনেক excited ছিলাম। এধরণের রিসোর্সগুলোর ক্ষতিকর দিক বুঝতে আমার বেশ সময় লেগেছে। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সমস্যাটা হচ্ছে যে এগুলো মানুষকে unproductive করে দেয়। মনে হয় সব কিছু প্ল্যান করে সেট করা হয়ে গিয়েছে, দাজ্জাল এই আসলো বলে, [61]আমার যেন আর কিছুই করার নাই চেয়ে চেয়ে এগুলা দেখা ছাড়া। কিন্তু আমরা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা ভুলে যাই যে আমার হিসাব শুরু হবে আমার মৃত্যুর সাথে সাথেই আর সেটা আসতে পারে যে কোনো সময়েই। তাছাড়া আমাদেরকে দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য যেসব টিপস হাদীসে দেয়া হয়েছে সেগুলা সবই আধ্যাত্মিক, দাজ্জাল কবে আসবে সেটা predict করা আমাদের কাজ না। আমাদের সবার উচিৎ নিচের দুআটা মুখস্থ করে ফেলা।

Muslim narrated that Abu Hurayrah (□) said: "The Messenger of Allah (□) said: 'When any one of you says Tashahhud, let him seek refuge with Allah from four things, and say: "Allahumma inni a'oodhi bika min 'adhaab jahannam wa min 'adhaab al-qabri wa min fitnat il-mahyaa wa'lmamaat wa min sharri fitnat al-maseeh al-dajjaal (O Allah, I seek refuge with You from the torment of Hell, from the torment of the grave, from the trials of life and death, and from the evil of the fitnah of the Dajjaal)."'" (Narrated by Muslim, no. 924)

[61] এটার উপর খুব ভালো একটা রিসোর্স হচ্ছে- https://www.youtube.com/watch?v=1oCf7ae__kk

আর সূরা কাহফের ১ম এবং শেষ ১০ আয়াত মুখস্থ করে ফেলা, অর্থসহ।

"Whoever among you sees him (the Dajjaal), let
him recite against him the opening verses of Soorat al
Kahf." (Hadeeth 5228). Muslim (no. 1342) narrated from Abu'l- Dardaa' that the Prophet (s) said:
"Whoever memorizes ten aayaat from the beginning of Soorat al- Kahf will be pr otected from the Dajjaal" – i.e.,
from his fitnah. Muslim said: "Shu'bah said, 'from the
end of al- Kahf.' Hammaam said, 'from the beginning of al- Kahf.'"

আমাদের এই জীবনে করণীয় কী সেটা নিয়ে আমার মারাত্মক পছন্দের হাদীস হচ্ছে নিচেরটা-

Anas (May Allah be pleased with him) reported that the Prophet (peace and blessings be upon him) said, "If the Hour (the day of Resurrection) is about to be established and one of you was holding a palm shoot, let him take advantage of even one second before the Hour is established to plant it." (Reported by Ahmad and Al-Bukhan on the authority of Anas in Al Adab Al-Mufrad,)

সুবহানাল্লাহ! কী productive একটা জীবন দর্শন! যখন জানি যে একটু পরই কিয়ামত হবে, তখন আর গাছ লাগায়ে কী হবে, তাই না? কিন্তু না, আমরা ফলাফলের জন্য দায়িত্বশীল না, শুধুই চেষ্টার জন্য।

যাই হোক, এতো গেল দুনিয়ার পরিণতি, কিয়ামতের দিনে কী ঘটবে সেটার কথা তো আগের একটা পর্বে বলেছি.....আল্লাহ ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করবেন যে ঊনি কি মানুষকে ঊনার ইবাদাত করতে বলেছিলেন কী না.....

হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! তুমি কি লোকদেরকে বলে দিয়েছিলে যে, আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর? ঈসা বলবেন: আপনি পবিত্র! আমার জন্যে শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি যা বলার কোন অধিকার আমার নেই । যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই পরিজ্ঞাত; আপনি তো আমার মনের কথাও জানেন এবং আমি জানি না যা আপনার মনে আছে । নিশ্চয় আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত । আমি তো তাদেরকে কিছুই বলিনি, শুধু সে কথাই বলেছি যা আপনি বলতে আদেশ করেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহর

দাসত্ব অবলম্বন কর যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা। আমি তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। আপনি সর্ববিষয়ে পূর্ণ পরিজ্ঞাত। যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন, তবে তারা আপনার দাস এবং যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন, তবে আপনিই পরাক্রান্ত, মহাবিজ্ঞ। (৫:১১৬-১১৮)

এখন নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে যে ক্রিস্টানরা এটার কথা কিভাবে জানবে, তাই না? ওরা তো ভাবছে যে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওদেরকে কিয়ামতের দিন উদ্ধার করবেন। না, ওদের বইতেও এই কথা আছে!

"Not everyone who says to me, 'Lord, Lord,' shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, 'Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? Then I will tell them plainly, 'I never knew you. Away from me, you evildoers!' [Matthew 7:21-23]

তাইলে আমরা কী বুঝলাম? নিজেদের ধর্মগ্রন্থ পড়ার কোনো বিকল্প নাই, সেটা যেই ধর্মই হোক। ক্রিস্টানিটি নিয়ে আমাদের আলোচনা এখানেই শেষ!

শিকড়ের সন্ধানে-এক সূত্রে গাঁথা সব কিছু (শেষ পর্ব)

আমি এই সিরিজে মূল যে কয়েকটি বিষয় ফুটে তুলতে চেয়েছি সেটা হল-

১) ইহুদী ও ক্রিস্টানদের পরিচয়, ইসলামের সাথে এটার সম্পর্ক।

২) কুরআনের সুবিশাল অংশ যে এটা নিয়ে কথা বলে সেটা জানা এবং সেই অংশ গুলো বোঝা।

৩) ইসরাইল রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠার ধর্মীয় দাবী যে ভিত্তিহীণ সেটা বুঝানো।

আমরা এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি যে মুসলিম শুধু তাদেরকেই বলে না যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী, বরং সকল নবীর অনুসারীরাই মুসলিম অর্থ্যাৎ আত্মসমর্পিত ছিলো। মুসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী, কুরআন যাদের এখন বনী ইসরাঈল বলে সম্বোধন করছে তারা তখনকার মুসলিম ছিলো, তাদের মাঝে মুনাফিক্কও ছিলো। এই পরিচয় থেকে তাদের প্রথম ঐতিহাসিক পতন ঘটে ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাসীহ হিসেবে অস্বীকার করার পর। আল্লাহ ওদেরকে আবার সুযোগ দিয়েছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী হওয়ার মাধ্যমে, ওরা সেটাও প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের ইহুদী পরিচয়কেই বেছে নিয়েছিলো, যা ছিলো একটা বংশ পরিচয়। এটা ছিলো ওদের শেষ সুযোগ আল্লাহর chosen people এর মর্যাদা ধরে রাখার। ওরা আজো মাসীহের জন্য অপেক্ষা করছে সেটা আমরা বলেছি।

ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকৃত অনুসারীরা ছিলো তখনকার মুসলিম। পল কর্তৃক বিকৃতির পর সব ক্রিস্টানকে মুসলিম বলা যাবে না, যারা একেশ্বরবাদী ছিলো তারাই শুধু ওই নির্ধারিত সময়ের মুসলিম ছিলো।

তারপর সবশেষ আসলেন আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম.....ঊনি শেষ নবী। আল্লাহর এখনকার chosen people তাই মুসলিমরা। কিন্তু chosen for what? To establish Tawheed on this earth.

তাই আমাদের জন্যও আল্যার্মিং বিষয় হচ্ছে মুসলিম কোনো জন্মসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি নয়, এটা একটা দায়িত্ব, এটা হওয়ার ফলে আল্লাহর কাছে যেসব বিশেষ মর্যাদা প্রতিশ্রুত রয়েছে, সেটা অর্জন করে নিতে হয়। এটার দরজা সবার জন্য খোলা, তার জন্ম পরিচয় যাই হোক না কেন।

পিছনের কথাঃ

গত পর্বে বলেছিলাম যে আমাদের সবার যার যার ধর্ম গ্রন্থ পড়া দরকার। আমরা জন্মসূত্রে মুসলিমরা কুরআনের অনুবাদ পড়তে গিয়ে যেসব জটিলতার স্বীকার হই, সেই যাত্রাটা সহজ করারই এক ক্ষুদ্র প্রয়াস ছিলো এই সিরিজটা।

এখানে যা কিছু লিখেছি, সেটা সবার প্রথমে আমার নিজের কন্সেপ্ট ক্লিয়ার করার জন্য পড়েছিলাম। ২০১০-১১ সালের দিকে সম্ভবত এক দ্বীনী বোনকে আমি ঘটনাগুলোর এই ধারাবাহিকতাটা বুঝিয়েছিলাম। ঊনি তখন খুব appreciate করেছিলেন। ঊনি দ্বীন প্র্যাক্টিসের দিক থেকে আমার অনেক সিনিয়র ছিলেন, ঊনার এই উৎসাহ আমার জন্য কিছুটা বিস্ময়কর ছিলো। কারণ আমার ধারণা ছিলো এগুলা খুব সাধারণ জ্ঞান, প্র্যাক্টিসিংদের সবাই বুঝি জানে।

তারপর ২০১৩ সালে যখন মিশরে মুরসির সরকার উচ্ছেদ করা হলো, তখন হঠাৎ আমার মাথায় চিন্তা এলো যে এই ব্যাপারগুলোর সাথে কুরআনে বর্ণিত ইতিহাস যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেটা আমরা বুঝতে পারছি কী না। Chosen people হবার নাম করে প্যালেস্টাইনের অবৈধ দখলদার Zionist রা যে প্যালেস্টাইনের সীমানায় কোনো ইসলামপন্থী সরকার থাকতে দেবে না সেটা বুঝাতে একদম হঠাৎ করেই এই সিরিজটা লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। তখন আমি ইসলামিক ফিন্যান্সে মাস্টার্স করছি, মারাত্মক পড়ার প্রেশার। আমি এমন হুট করে অনেক কিছুই করা শুরু করি, কিন্তু শেষ আর করতে পারি না।

তারপর ২০১৪ সালে প্রথম আমেরিকাতে নেমে ডালাস এয়ারপোর্টে বসে অপেক্ষা করছিলাম connecting flight এর জন্য। তখন রোযার মাস ছিলো, গাজায় কী যেন একটা হামলা হচ্ছিল। এখানকার স্থানীয় পত্রিকায় ইসরাইলের এমন নির্লজ্জ তাবেদারী করা হচ্ছিল যে আমার বুকটা যেন ভেঙ্গে গিয়েছিলো। মনে হচ্ছিল এই দেশটাতে আমার থাকতে হবে আগামী কয়েকটা বছর!

আমি কী করতে পারি আমার ভাইদের জন্য! হাস্যকর শোনালেও তখন আমার মনে হয়েছিলো যে আমি এবার গিয়েই শিকড়ের সন্ধানে লিখে শেষ করবো..... দুনিয়াকে জানাবো যে ধর্মের নামে যে আগ্রাসন Zionistরা চালাচ্ছে সেটা কতটা ভিত্তিহীণ। এ ছিল অক্ষমের এক অতি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

এখানে আসার কিছুদিনের মাঝেই IOU তে ফুল টাইম জয়েন করি ফ্যাকাল্টি হিসেবে। সামর্থ্যের সবটুকু ঢেলে দিয়ে চেষ্টা করেছি ইসলামী অর্থনীতির উপর কিছু ইউনিক রিসোর্স তৈরি করতে, স্বাভাবিকভাবেই এই প্রোজেক্টের কাজটা ব্যাক সিটে পড়ে গিয়েছিলো।

পিএইচডি শুরু করার পর এটা আর কোনোদিন আলোর মুখ দেখতো নাকি সন্দেহ। একদিন হঠাৎ করেই মালয়শিয়ার এক আন্টি ফোন করে খুব অনুরোধ করতে থাকলেন এটা শেষ করার জন্য। আমি ঊনার অনুরোধের তোপের মুখে অসহায় অনুভব করছিলাম। সেমিস্টার চলাকালে আসলেই যে সম্ভব নয়! এত পড়তে হয় এটা লেখার জন্য!

কিন্তু ঊনার আন্তরিক অনুরোধ ফেলার মত ছিলো না......তাই এই পুরা রোযার মাসে দুআ আর সাথে লেখার কাজ চলতে থাকলো। অনলাইনে কিছু বোনদের মাঝে একটা ক্লাস নিলাম, যারা ধৈর্য্য ধরে আমার অপ্রস্তুত বকবক শুনলেন এই টপিকের উপর। ঊনাদের ক্লাস নিতে গিয়েই ঠিক করতে থাকলাম কিভাবে সাজাবো টপিকগুলো। ঊনাদের কাছে অসীম কৃতজ্ঞতা।

এই সিরিজ পড়ে ১০জন মানুষও যদি কুরআনের সাথে নিবড় সম্পর্ক গড়তে সমর্থ হন, কিছু মানুষও যদি মুসলিম আত্মপরিচয়ে গর্ববোধ করা শুরু করেন, ২টা মানুষও যদি আরবী শিখতে উদবুদ্ধ হন, আমার এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে ইনশাল্লাহ।

তবে সবচেয়ে বড় আশা আল্লাহ যেন এই সামান্য প্রচেষ্টাটুকু ক্ববুল করে নিন। যদি তার দরবারে গৃহীত না হয়, নিশ্চয়ই আমি অসহায় ও নিঃস্ব হয়ে পরিত্যক্ত হব।

৩৬ পর্ব লেখার পর মাঝখানে গ্যাপ পড়েছে দেড় বছরের মত সময়। আগের ছন্দ ফিরে এসেছে কী না সেটা বিচার করার দায়ভার পাঠকদের। আমি চেষ্টা করেছি যথেষ্ট পড়াশোনা করে এটা লিখতে। কিন্তু আমি যেহেতু মূলত সেকেণ্ডারী সোর্স ব্যবহার করেছি, তাই ভুল ভ্রান্তির অবকাশ রয়েছে শতভাগ। যে কোনো গঠনমূলক সমালোচনা আন্তরিকভাবে স্বাগতম।

===